# মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য

॥ অতীন্দ্র মজুমদার ॥

॥ নয়া প্রকাশ ঃ কলিকাতা ছয়

Maddhya Bharatia-Arya Bhasa O Sahitya

A Bengali treatise on Middle Indo-Aryan Languages & Literatures

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৭

## ॥ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ॥

এই বই লেখার পরিকল্পনা যখন মনের মধ্যে ছিল তখন আমার শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ রবীন্দ্র মজুমদার এবং অধ্যাপক-বন্ধু অবন্তী সান্যাল আমাকে তা কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করতে পরামর্শ দেন। বস্তুত এঁদের প্রেরণা এবং প্রকাশক-বন্ধু বারীন্দ্র মিত্রের তাড়না না থাকলে এত শীঘ্র এই বই প্রকাশিত হতে পারত না। আমার পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম. এ. ( বাংলা, দর্শন ও ইংরেজী ) বহু কষ্ট স্বীকার করে এই বইয়ের জন্য নানা গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। শিল্পী-বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী পরম যত্নে এর প্রচ্ছদপটটি এঁকে দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে আমার যা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ কোথায় ॥······

স্বাধীনতা দিবস। ১৯৬০ ॥

# ॥ আলোচ্য বিষয় ॥

॥ স্বর্গত পিতৃদেবের স্মরণে
মাতৃদেবীর চরণে নিবেদিত ॥

## ॥ পালি কথাটির উৎপত্তি ॥

কোন একটি ভাষা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করতে গেলে কিংবা তার পরিচয় পেতে হলে প্রথমে জানা দরকার, যে-ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, সেই ভাষার নামটি কোথা থেকে কি ভাবে এল। পালিভাষার 'পালি' নামটি কেন হল, প্রথমে সেই সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করে নিতে হবে ॥

'পালি'—এই কথাটি এক এক সময়ে এক এক রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পালি কথাটির অর্থ—যা পালন করে। 'পালেতিতি রক্ষতেতি পালি'—যা পালন করে বা রক্ষা করে, তা-ই পালি। সাধারণ ভাবে সকলে বিশ্বাস করেন, ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বাণী এই ভাষাতেই পালন এবং রক্ষা করা হয়েছে, তাই এর নাম পালি। পালি নামটি সম্বন্ধে আরেকটি বিশ্বাস এই যে, এই ভাষাতে বুদ্ধদেবের উপদেশের 'পাঠ' বা text সংরক্ষিত হয়েছে। এই ধারণার পিছনে এই যুক্তি—পাঠ থেকে পালি শব্দটি এসেছে। [ পাঠ>পাল>পালি ]। পাঠ অর্থে পালি শব্দটির উৎপত্তি—এই ধারণা যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত লোকের মনে কাজ করেছে, তার প্রমাণের অভাব নেই। এক জায়গায় বলা হয়েছে—'ইতি পি পালি' তার অর্থ, ইতি পি পাঠ—এটাও পাঠ, text। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, 'পালিমত্তম ইধানীতং নত্থি অত্থকথা ইধ।' সংস্কৃতে রূপান্তরিত করলে এই বাক্যটি দাঁড়াবে, পালিমাত্রং ইদং আনীতং, নহি অর্থকথা ইদং —তার অর্থ, কেবল মাত্র পালিই আনা হয়েছে বা text আনা হয়েছে, এখানে অর্থকথা নেই। অন্য আরেকটি জায়গায় পাচ্ছি—নেব পালিয়ং ণ অত্থ কথায়ং। সংস্কৃত—নৈব পালিয়ং, নৈব অর্থকথায়ং—পাঠেও নেই অর্থকথাতেও নেই। এই তিনটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, পালি কথাটি পাঠ বা text এই অর্থে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এর থেকেই, পরে যখন পালি শব্দটি পাঠ না বুঝিয়ে একটা ভাষার নাম বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন সেই নামকরণের পিছনে বোধ হয় এই যুক্তি কাজ করেছে—পালি হচ্ছে এমন একটা ভাষা, যাতে বুদ্ধদেবের উপদেশগুলির পাঠ বা text ধৃত আছে ॥

'পালি' নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে তৃতীয় মতটিও অনুধাবনযোগ্য। আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডে যে-ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি, সংস্কৃত 'পঙ্‌ক্তি' কথাটি যে-অর্থে আমরা ব্যবহার করি ( অর্থাৎ, শ্লোকের চরণ ), সেই অর্থ পালি কথাটিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনি সেই ভূমিকাতে বলেছেন, পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর লোক গল্প-কাহিনীর শ্লোক-অংশকে

'পালি' বলে থাকে। তবে, পঙ্‌ক্তি কিভাবে বদলিয়ে 'পালি' হল সে-সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক ইঙ্গিত আমরা সেখানে পাচ্ছি না। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রীও 'পালি' কথাটি পঙ্‌ক্তি থেকে এসেছে, এই সমর্থন করেন। কিন্তু সংস্কৃত পঙ্‌ক্তি থেকে পালি কথাটির বিবর্তন কি ভাবে হল তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর সেখানেও অনুপস্থিত॥

'পালি' কথাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে চতুর্থ একটি মতও প্রচলিত। কেউ কেউ বলেন, পল্লীবাসীদের ভাষা, এই অর্থে পালি কথাটি ব্যবহৃত। এর পিছনেও কোন সন্তোষজনক যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। কারণ পল্লী থেকে বিবর্তিত হয়ে 'পাড়া' কথাটি এসেছে মনে করাই অধিকতর সঙ্গত ( পল্লীগ্রাম>পাড়াগাঁ )। কারণ আমরা জানি, 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার বা 'ল' স্থানে 'র' ব্যবহার মাগধী প্রাকৃতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আচার্য লেভির মত, 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থ, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং পতঞ্জলি—সমস্ততেই এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং পল্লী থেকে পালি শব্দের আগম খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। বোধ হয়, বৌদ্ধবিদ্বেষী এবং পালিভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় এই ধরনের উক্তির মধ্যে দিয়ে পালিভাষা ও সাহিত্যকে জনসমাজে হেয় করার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছেন॥

'পালি' শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কটি মত আমরা পাচ্ছি। এতে কেবল এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, আজ পালিভাষা মৃত হলেও এক সময়ে এর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কম ছিল না, এই ভাষার শক্তিকে অবহেলা করার দুঃসাহসও কারো ছিল না। পালি যদি নেহাৎই একটা অপাংক্তেয় ভাষা হতো তবে তার নামের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাতেন না। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও মতবাদের শক্তিশালী বাহন হিসাবে পালির ব্যবহার একদিন ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবেই করা হয়েছিল। বৌদ্ধদের কাছে আজও পালি একটি পবিত্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পরবর্তী এক হাজার বৎসর ভারতে এর প্রচলন ছিল। এখনও বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মচর্চার প্রধান বাহন হিসাবে, ভারতে এবং সিংহলে এর পুথিগত ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে বোধ হয় এই রকম সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হবে, পালন কিংবা পাঠ ( text ) এই শব্দদুটির যে-কোন একটি থেকে পালি কথাটির উৎপত্তি হয়েছে॥

## ॥ পালিভাষার উৎপত্তিকাল ॥

আনুমানিক ১৫০০ অব্দের [ খৃষ্টপূর্ব ] কাছাকাছি সময় থেকে ভারতবর্ষে আর্যরা আসতে সুরু করেন এবং অনেকগুলি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে এবং পাঞ্জাবের পশ্চিমদিকে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করতে নিযুক্ত থাকেন। আস্তে আস্তে আর্যরা সমগ্র উত্তরভারতে নিজেদের বিস্তারিত করেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেই সময়ে ভারতে যাঁরা বাস করতেন, অর্থাৎ অনার্যদের, ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করে নিয়ে আর্যভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। আর্যরা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভারতবর্ষে এসেছিলেন —তাঁদের কথ্য ভাষার মধ্যে অল্পস্বল্প পার্থক্যও ছিল—কিন্তু তাঁদের সমস্ত ভাষার মধ্যে ছিল একটা মূলগত ঐক্য। তাঁদের আদি জীবিকা ছিল পশুপালন, ভারতবর্ষে আসার পর তাঁদের যাযাবর পশুপালক জীবন কৃষিজীবী হিসাবে স্থায়িত্ব পেল। আর্যদের সবচেয়ে বড় মূলধন ছিল তাঁদের শক্তিশালী ভাষা এবং সত্যিকার কাব্যময় দেববেদীর বন্দনাগীতিমূলক চমৎকার সাহিত্য। এই ভাষাই বৈদিক ভাষা; ঋগ্বেদের মধ্যে এই প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ সঙ্কলিত। ঋক্‌বেদের রচনার সময়ের প্রায় পাঁচশ বছর পরে আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টপূর্ব অব্দে, এই গাথাগুলি বা বৈদিক সূত্রগুলি সঙ্কলিত হয়॥

বৈদিক সাহিত্যের আনুমানিক রচনা কাল ১৫০০-৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। এই সাহিত্যের তিনটি ভাগ—বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, এবং উপনিষদ। বেদের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট উপনিষদ। বেদের অন্তর্গত যজ্ঞকার্যের বিবরণ, ও সেগুলির বিশ্লেষণ ছাড়াও ব্রাহ্মণে কিছু কিছু প্রাচীন উপাখ্যানের ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। উপনিষদে সে যুগের কবি-মনীষীদের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার সাহিত্যিক কবিত্বময় প্রকাশও অনুধাবনযোগ্য। ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ—দুটিই প্রধানতঃ গদ্যে লেখা॥

প্রত্ন ভারতীয়-আর্য (Old Indo-Aryan) ভাষার সাহিত্যিক রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন এইগুলি। এইগুলিতে প্রধানতঃ ধর্মসাহিত্যেরই পবিত্র প্রকাশ। এ ছাড়াও আরেকটি সাহিত্যিক ভাষা সেকালের শিষ্ট এবং শিক্ষিত লোকের ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য পেয়েছিল—পণ্ডিতেরা এরকম সিদ্ধান্ত করেছেন। এই ভাষাতে অবৈদিক এবং লোকায়ত কাহিনী উপাখ্যান রচিত হয়েছিল, কিন্তু এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই না। অনেক পরে রামায়ণ-মহাভারত প্রমুখ মহাকাব্যের মাধ্যমে, প্রাচীন

পুরাণের ভাষার মধ্যস্থতায় আমরা এই ভাষার পরিণত রূপটির সঙ্গে পরিচিত হই। পাণিনি এই শিষ্ট ভাষাকে ব্যাকরণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ভাষাই 'সংস্কৃত'॥

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আরেকটি মতও এই প্রসঙ্গে বলে নিই। কেউ কেউ বলেন, ভারতে আগত আর্যদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন ভারতের আদি অনার্যদের সঙ্গে প্রথমে বিরোধ বাধলেও কালক্রমে সে বিরোধ পারস্পরিক মিলনে পরিণত হল। আর্যদের ভাষায় বহু অনার্যশব্দ প্রবিষ্ট হল, এবং ইতর জনের মুখে আর্য অনার্য ভাষা ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে একটা মিশ্রভাষার উদ্ভব হল। সাধারণ লোকের মুখে মুখে এই মিশ্রভাষাই প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠল। পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণরা তখন এই মিশ্রভাষাকে সংস্কার করে তাকে একটা শিষ্ট মার্জিত রূপ দেন। সংস্কার করা সেই মিশ্রভাষাই নাকি সংস্কৃত, যা রাজকার্যে, রাজসভায়, সাহিত্যরচনায় ব্যবহৃত হতে থাকল—আর জনসাধারণের ভাষা বা প্রাকৃত জনের ভাষা হিসাবে থাকল সেই মিশ্র ভাষাটি, যাকে আমরা বলি প্রাকৃত। তবে এই মতটি কতদূর সত্য তার যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের অভাব আছে। অধিকাংশ ভাষাতত্ত্ববিদ প্রথম মতটির সমর্থন করেন॥

বৈদিক এবং সংস্কৃতকেই আমরা প্রত্ন ভারতীয়-আর্য ( O. I. A. ) ভাষা হিসাবে জানি। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, এই দুটি ভাষা মূলতঃ এক উৎসজাত হলেও এদের মধ্যে বহু মৌলিক এবং 'কালপরিণামগত পার্থক্য' আছে। বৈদিক ভাষারই সরলীকৃত রূপ সংস্কৃত এবং সংস্কৃতের সরলীকৃত রূপ প্রাকৃত। এই সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন—

"বৈদিক ভাষা ক্রমশঃ সরল হইয়া সংস্কৃতে পরিবর্তিত হইল, কিন্তু প্রত্ন ভারতীয় কাঠামো ঠিক রহিল। তাহার পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে, ভারতীয় আর্যভাষায় যে-পরিবর্তন দেখা দিল তাহাতে কাঠামো কতকটা বদলাইয়া গেল, ভারতীয়-আর্য প্রাচীন অবস্থা বা সংস্কৃত রূপ ছাড়িয়া মধ্য অবস্থায় বা প্রাকৃতে পরিণত হইল। 'প্রাকৃত' বা 'প্রাকৃত ভাষা' কথাটির আসল তাৎপর্য হইতেছে 'প্রকৃতির'-র অর্থাৎ জনগণের কথ্য ও বোধ্য ভাষা। যেমন, শিষ্ট সমাজের 'শুদ্ধ' ভাষা 'সংস্কৃত'।"

[ ভাষার ইতিবৃত্ত। ৫ম সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৭৯ ]

পণ্ডিতেরা তাই বলেন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কালক্রমে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—জনপদবাসীদের 'নিরুক্তি' বা দেশীয় ভাষা; আর 'ছান্দস্' বা সাহিত্যের ভাষা, যা ধৃত আছে বেদে, ব্রাহ্মণগুলিতে এবং উপনিষদে। জনসাধারণের মধ্যে

প্রচলিত এই নিরুক্তিই কি প্রাকৃতভাষার আদিমতম রূপ ? হয়ত তা-ই। কিন্তু একথা অস্বীকার করাও কঠিন যে, জনপদবাসীদের লোকায়ত ভাষাই কালক্রমে প্রাকৃতে পরিণত হয়েছে॥

পালি সাহিত্যের ভাষা, এবং তার উৎপত্তি প্রাচীনতম প্রাকৃত থেকে। পালি গড়ে উঠেছে ছান্দসের ধারায় বা সাহিত্যের ভাষার ধারায়, যে ধারাতে সংস্কৃত এবং সাহিত্যিক প্রাকৃত পরিণতি লাভ করেছে। সেই হিসাবে দেখলে বলতে পারা যায়, প্রত্ন ভারতীয়-আর্যভাষার গঠনে মোটামুটি চারটে স্তর—বৈদিক, সংস্কৃত, পালি এবং সাহিত্যিক প্রাকৃত। পালিভাষা মধ্যস্তরের আর্যভাষার ( Middle Indo-Aryan ) অন্তর্গত। ঠিক কোন্ সময়ে যে এর উৎপত্তি তা সঠিক বলা না গেলেও, এটুকু অনুমান করা যায়, খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৮০০ অব্দের মধ্য কোন একটা সময়ে পালিভাষার উৎপত্তি। বৈদিক আর্যভাষার সঙ্গে সংস্কৃত যে সম্বন্ধে আবদ্ধ, সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে পালির সেই একই ধরনের সম্বন্ধের সম্পর্ক॥

সন-তারিখের হিসাবে বৈদিক আর্য এবং সংস্কৃতের মাঝামাঝি সময়ে পালিভাষার স্থান। এতে বৈদিক আর্যভাষার কিছু কিছু বিশেষত্ব ধরা দিয়েছে বলেই নয়, বৈদিক আর্যভাষা থেকে সংস্কৃত এবং সাহিত্যিক প্রাকৃতের ক্রমপরিণতির নানা স্তরের বহু তথ্য এই পালিভাষার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। সেই জন্যই প্রাচীন বা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার চর্চায় পালিভাষার স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, মৈথিলী ইত্যাদি নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার ( Modern Indo-Aryan ) সঙ্গে পালির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ভারতের সীমার মধ্যেই শুধু নয়, বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রচারের প্রধানতম বাহন হিসাবে সিংহলী, বর্মী, শ্যামদেশীয় ভাষা প্রভৃতির ওপরেও পালিভাষার প্রভাব আছে। এ প্রসঙ্গে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে রাখার দরকার—নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির ওপর পালির প্রভাব বৈদিক আর্য বা সংস্কৃতের মধ্যে দিয়ে আসেনি, তা এসেছে সাহিত্যিক প্রাকৃত এবং তার অপভ্রংশের মধ্যে দিয়ে। এই ধারণার মূলে আছে সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে পালির ঘনিষ্ঠ যোগ॥

## ॥ পালিভাষার উৎপত্তি ॥

বৈদিক আর্যভাষার মাধ্যমে যে-সমস্ত সাহিত্যকীর্তি গ্রথিত, তা দেবদেবীর বন্দনামূলক গীতিসাহিত্য। তাই বৈদিক আর্যভাষাকে বলা হয় দেবভাষা। সেই অর্থে পালিভাষাকে বলা যেতে পারে তন্তিভাষা বা তন্ত্রভাষা—কারণ এই ভাষাতেই বৌদ্ধতন্ত্র প্রচারিত হয়েছে ॥

লোকশ্রুতি এই যে, বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত মাগধীভাষায় প্রচার করেছিলেন। হয়ত এই জন্যেই বৌদ্ধশাস্ত্র যে-ভাষায় সংরক্ষিত হয়েছিল, তাকে বলা হয় মাগধী নিরুক্তি। কিন্তু পালির মাধ্যমে যে-বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই ভাষার সঙ্গে মাগধী নিরুক্তির—অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম থেকে পঞ্চম শতাব্দী, এই পাঁচশ বছর ধরে সংস্কৃত নাটকে নিম্নস্তরের লোকের ভাষা হিসাবে যে-মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হয়েছে,—তার সঙ্গে পালির কোন মিল নেই। ধ্বনি, উচ্চারণ ও ভাষাতত্ত্বগত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পালি এবং এই মাগধী প্রাকৃত আলাদা ॥

সেই জন্যেই বহু ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পালির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, পশ্চিম-ভারতের কোন একটি ভাষা থেকে সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে পালির জন্ম। কারো কারো মতে পূর্বভারতের কোন একটি কথ্য ভাষা থেকে পালির উৎপত্তি। আর্যাবর্ত্ত বা মধ্যভারতের কোন একটি ভাষার থেকে পালির উদ্ভব—এরকম মতও কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। পালিভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রধান প্রধান মত আছে, শ্রেণীবদ্ধ করলে সেগুলি এরকম দাঁড়াবে :

॥ক॥ জার্মান পণ্ডিত Kuhn এবং Westerguard বলেন, উজ্জয়িনী ( অবন্তীর রাজধানী ) অঞ্চলের ভাষা থেকে পালির জন্ম। যুক্তি এই যে, এই ভাষার সঙ্গে মহারাজ অশোকের গির্ণার শিলালিপির ভাষার মিল আছে। লোকশ্রুতিতে মহারাজ অশোকের পুত্র বা মতান্তরে জামাতা মহেন্দ্রের বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে উজ্জয়িনী থেকে সিংহলে যাওয়ার কথা আমরা পাই। যদি উজ্জয়িনীর কথ্যভাষা থেকে পালির জন্ম আমরা মেনে নিই, তাহলে মহেন্দ্রের উজ্জয়িনী থেকে সিংহলে যাওয়া আমাদের সমর্থন করতে হয় ॥

॥খ॥ লোকশ্রুতির উপরোক্ত অংশটুকু এবং তার অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তের সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ না করে ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন, 'দক্ষিণ পশ্চিম ও প্রাচ্যমধ্যার ( সম্ভবত উজ্জয়িনী অঞ্চলে ) মিশ্রণে গড়া পালি পুরাপুরি

ধর্মসাহিত্যের ভাষা;' তিনি প্রাচ্যমধ্যার অর্থাৎ দিল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতের সঙ্গে পালির মিল দেখতে পেয়েছেন ভাষাতত্ত্বের বিচারে—যেমন 'র'কারের 'ল'কারে পরিণত হওয়ার প্রবণতায়, বিসর্গযুক্ত অকারান্ত পদ 'এ'কারে পরিবর্তিত হওয়ায়; আবার দক্ষিণ-পশ্চিমার মত পালিতে আত্মনেপদ দেখতে পাওয়া যায়।

॥গ॥ জার্মান পণ্ডিত Otto Franke বলেন, উজ্জয়িনীর কাছাকাছি অঞ্চলের কথ্য ভাষা থেকে পালির উৎপত্তি। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে বলেছেন, এই অঞ্চলের প্রাকৃতে রচিত শিলালিপির সঙ্গে পালির খুব ঘনিষ্ঠ মিল আছে।

॥ঘ॥ Sten Konowর মতে বিন্ধ্য অঞ্চলের ভাষা থেকেই পালির উৎপত্তি। তিনি বলেন, বিন্ধ্য অঞ্চলের কথিত ভাষা ছিল পৈশাচি প্রাকৃত। এই পৈশাচি প্রাকৃতের সঙ্গে পালির মিল দেখতে পেয়ে তিনি ঐ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

॥ঙ॥ পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন মনে করেন, পালি একটি মিশ্রভাষা, তক্ষশিলা অঞ্চলে তা বর্ধিত হয়েছিল। তাঁর মতের সমর্থনে জার্মান পণ্ডিত Windicheও বলেন মাগধীর ওপর ভিত্তি করে পালি পৈশাচি প্রাকৃতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁদের দুজনেরই মতে পালির উৎপত্তি কান্দাহার অঞ্চলে।

॥চ॥ Oldenburg এবং E. Muller মনে করেন, পালি হচ্ছে কলিঙ্গ অঞ্চলের ভাষা। লোকশ্রুতি অনুযায়ী অশোকের পুত্র বা মতান্তরে জামাতা মহেন্দ্রের সিংহলে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র নিয়ে যাওয়ার কাহিনী তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, মহেন্দ্রের সিংহলে যাওয়ার অনেক আগেই সেখানে পালিভাষার এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়েছিল। এই প্রচারের সমস্ত কৃতিত্ব কলিঙ্গ অঞ্চলের বন্দর থেকে সমুদ্রগামী বাণিজ্যতরীর বণিকদের। তাঁরা বাণিজ্যসূত্রে বহির্ভারতের নানা দ্বীপে উপদ্বীপে যাওয়ার সময় বাণিজ্যপণ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করেছিলেন। পালি যে কলিঙ্গ অঞ্চলের ভাষা, এই মতের সমর্থনে উক্ত জার্মান পণ্ডিতদ্বয় দেখিয়েছেন, কলিঙ্গ অঞ্চলের খণ্ডগিরি এবং উদয়গিরি পর্বতগুহায় প্রাপ্ত শিলালিপির ভাষার সঙ্গে পালিভাষার সাদৃশ্য আছে।

॥ছ॥ আচার্য সুনীতিকুমার মনে করেন, ধ্বনিতত্ত্ব (phonology) এবং রূপতত্ত্বের ( morphology ) বিচারে পালিভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। শৌরসেনী প্রাকৃতের চলন ছিল মধ্যভারতের মথুরা অঞ্চলে। আচার্য সুনীতিকুমার মনে করেন, মধ্যভারতের শৌরসেনী প্রাকৃত এবং মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবে কালক্রমে পালিভাষার উৎপত্তি।

উপরে কারা কারা পালিকে পশ্চিম অঞ্চলের ভাষা, পূর্ব অঞ্চলের ভাষা এবং মধ্যভারতীয় অঞ্চলের ভাষা মনে করেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। তবে, কিছু কিছু পণ্ডিতরা অন্যরকম মত পোষণ করলেও Geiger, Winternitz, Childers, Rhys Davids, Barua প্রভৃতি পণ্ডিতরা মনে করেন, মাগধী থেকেই পালির জন্মসূত্র খুঁজতে হবে। এই মাগধী, তাঁদের মতে, প্রাকৃত বৈয়াকরণরা যাকে মাগধী প্রাকৃত বলেন বা যে-মাগধী প্রাকৃত সংস্কৃত নাটকে বা গীতিকাব্যে ব্যবহৃত—সে মাগধী প্রাকৃত নয়। আসলে এই ভাষা ছিল মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র উত্তর ভারতের জনগণের সাধারণ জীবনে ব্যবহৃত lingua franca। এই পণ্ডিতদের মত এবং উপরে লিপিবদ্ধ মতগুলি কোনটিকেই সম্পূর্ণ সত্য বলে তাহলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, তবে সমস্ত মতগুলিই যে আংশিকভাবে সত্য তাতে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। এঁরা সবাই ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেই পালিভাষার জন্মসূত্র নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোন একটি ভাষার জন্মসূত্র নির্ণয় করতে গেলে কেবল ভাষাতত্ত্বকেই ত প্রধান অবলম্বন করলে চলবে না। ভাষা মানব-জীবনের অঙ্গ, সুতরাং জীবনের নানা দিকও এই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বিবেচনা করতে হবে সমাজের কথা, ইতিহাসের কথা, ভূগোলের কথা এবং পারিপার্শ্বিকের কথা॥

ভগবান বুদ্ধ ছিলেন কোশল রাজ্যের অধিবাসী, কিন্তু ধর্মপ্রচারসূত্রে সমগ্র উত্তর এবং মধ্যভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। বিচিত্র ভারতের বিবিধ সমাজ, ভাষা, আচার-আচরণ সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর জীবৎকালেই কপিলাবস্তু, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, কুশীনারা, রাজগৃহ, নালন্দা, অবন্তী—ইত্যাদি নানা বিখ্যাত জায়গায় বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও শাস্ত্র আলোচনার জন্য বহু বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বহু বৌদ্ধ শ্রমণ সেখানে বাস করতেন, বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা করতেন, ছাত্ররা শিক্ষা নিতে দূর দূরান্তর থেকে আসতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমবেত এই শ্রমণরা এবং ছাত্ররা প্রথম প্রথম নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাতেই কথাবার্তা বলতেন,—যাতায়াতের পথ সুগম ও নিরাপদ না হওয়ায় অন্য অঞ্চলের কথ্য ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। পরে যাতায়াতের কিছুটা সুবিধা হওয়ার ফলে এক বিহার থেকে অন্য বিহারে শ্রমণদের পারস্পরিক ভাব বিনিময় হওয়া সম্ভব হল। প্রতিটি বিহারে যে পাক্ষিক ধর্মালোচনা এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র আবৃত্তি করা হত তাতে শ্রমণদের এবং তাঁদের ছাত্রদের যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। তখনই বোধ হয় বিভিন্ন প্রান্তবাসী শ্রমণদের ধর্ম-আলোচনায় ও শিক্ষার সুবিধার জন্য একটা সর্বজনবোধ্য সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেন। বুদ্ধদেব তাঁর

জীবৎকালে নিজের নিজের অঞ্চলের ভাষায় ধর্মালোচনায় আপত্তি করেননি। কিন্তু গণতান্ত্রিক উপায়ে সুসংগঠিত বিহারগুলিতে ধর্মালোচনা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে একটি সাধারণ ভাষার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর প্রধান প্রধান বৌদ্ধবিহারগুলির ৫০০ শিষ্য যে-বৌদ্ধসঙ্গীতিতে সমবেত হন, সেখানে সুদীর্ঘ তিনমাস ধরে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের উপদেশাবলী এবং দর্শনের সূত্রগুলিকে এক একটি অধ্যায়ে সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যে শ্রমণদের পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য যে সাধারণ মিশ্র ভাষাটি শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেছে, সেই ভাষার দিকেই তখন সকলের নজর পড়ল এবং সেই ভাষাতেই ভগবান বুদ্ধের উপদেশগুলি 'রক্ষা করা', 'পালন করা'র দিকে বুদ্ধশিষ্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—এবং এই মিশ্রভাষারই নাম হয় পালি ॥

এই দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, বৌদ্ধ বিহারগুলিতেই পালিভাষার উৎপত্তি। কথ্য ভাষা আসে আগে, তারপর আসে সাহিত্যের ভাষা। এই সূত্র অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করার সঙ্গত কারণ আছে যে, তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত কথ্যভাষা মাগধী প্রাকৃতের উপর ভিত্তি করে সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে পালির উৎপত্তি। বুদ্ধদেব নাকি তাঁর উপদেশাবলী মাগধী প্রাকৃতের মাধ্যমেই প্রচার করেছিলেন, এরকম শোনা যায়। তাই শ্রমণরাও মাগধী প্রাকৃতকে বর্জন না করে তাকেই মূল হিসাবে নিয়ে পালিভাষা নামে একটি মিশ্রভাষায় সৃষ্টি করেন। মিশ্র, কারণ এতে ভারতে তৎকালীন প্রচলিত সব প্রধান প্রধান ভাষারই শব্দ-সম্ভার দেখতে পাওয়া যায়। সেটারও কারণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমণদের পারস্পরিক মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান। তাই পালি ঠিক প্রাচীন বা অর্ধ বা অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত মাগধী প্রাকৃত নয়,—বরং বলা নিরাপদ, ভারতের মধ্য অঞ্চলের প্রচলিত মাগধী, সংস্কৃত, শৌরসেনী, পৈশাচি প্রভৃতি সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণ হতে জাত একটা hybrid বা সঙ্কর ভাষা। এক জায়গায় এক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী অনেক লোক সমবেত হলে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক শিক্ষা নিতে আসেন, সেখানে একটা standard mixed ভাষায় সবাইকে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেটা না খাঁটি হিন্দী, না খাঁটি উর্দু। বৌদ্ধবিহারগুলিতে সমবেত শ্রমণদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই ব্যাপার ঘটেছিল ॥

## ॥ পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম ॥

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের যা-কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা তার প্রায় সমস্তই পালিভাষায় রচিত হয়। পালি-সাহিত্যের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে বৌদ্ধদর্শন ও শাস্ত্র। সেজন্য এই প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে বৌদ্ধদর্শনের এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহারের একটি মোটামুটি বিবরণ পাঠকের জানা থাকলে পালিসাহিত্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হতে পারে ॥

ভারতবর্ষের আর্যবংশীয়দের ইতিহাসকে যদি দুটি প্রধান ধর্মীয় ভাগে বিভক্ত করা যায় তবে সে দুটি হবে হিন্দু ও বৌদ্ধ। হিন্দুধর্ম ভারতে আর্যদের আগমনের সময় থেকেই সুরু বলা চলে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তার অনেক পর থেকে প্রচলিত ও প্রচারিত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নেপালের নিকটবর্তী কপিলাবস্তু নিবাসী ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব মনে করতেন, এই সংসার দুঃখময় এবং এই দুঃখ থেকে মানুষের কিসে পরিত্রাণ হবে এই অনুসন্ধানে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তারপর কিভাবে তিনি 'বুদ্ধ' হন তা সকলেরই জানা আছে ॥

বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি প্রয়াগের পূর্ব, বাংলাদেশের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ ও গণ্ডোয়ানার উত্তর—এই চার সীমার মধ্যবর্তী অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী, মগধ ইত্যাদি রাজ্যে নিজে থেকে নিজের ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তিনি পরম পুরুষার্থ অনুসন্ধান এবং সাধনাকাঙ্ক্ষী যে উদাসীন সম্প্রদায় গঠন করেন তাঁদের এবং অন্য লোকদের জন্য—দুই রকম আচার-আচরণ এবং ধর্মসাধনার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত উদাসীদের নাম 'ভিক্ষু'। তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করতেন। তাঁদের বাসগৃহের নাম ছিল 'বিহার', কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকে বাধ্যতামূলকভাবে বছরের মধ্যে কয়েক মাস বনবাস এবং গাছ-তলায় জীবনযাপন করতেন। তাঁরা নিজেদের হাতে-বোনা 'চীরপুঞ্জ' পরিধান করে তার আবরণ হিসাবে একটি পীতবর্ণ আলখাল্লা ব্যবহার করতেন। এঁরা দাড়ি কামাতেন, মাথা মুড়োতেন, স্ত্রীলোকের সংসর্গ, নৃত্যগীত ইত্যাদি সমস্ত রকম ইন্দ্রিয়-সুখপ্রদায়ক ব্যাপার থেকে নিজেদের দূরে রাখতেন। এঁরা সকলেই একাহারী। গ্রামে গ্রামে লোকের দরজায় দরজায় এঁরা ভিক্ষা সংগ্রহ করে দিনের আলো থাকতে থাকতেই এক জায়গায় সমবেত হয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতেন এবং প্রায় উপবিষ্ট

অবস্থাতেই রাতের বিশ্রাম ও নিদ্রা উপভোগ করতেন। সন্ন্যাসী হলেও এঁরা গৃহস্থের এবং সংসারের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতেন, তাঁদের উপদেশ দেওয়া ছাড়াও রোগে-ব্যাধিতে সেবা ও চিকিৎসা করা ছিল পরম কর্তব্য। দান, ধ্যান, শীল, তিতিক্ষা, বীর্য, প্রজ্ঞা,—এই কটি প্রধান বিষয়ের অনুষ্ঠান ছিল এঁদের প্রধান কর্তব্য। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অন্য দুটি নাম ছিল শ্রমণ ও শ্রাবক। বৌদ্ধগৃহীদের নাম ছিল উপাসক উপাসিকা॥

বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকের মুক্তির কথাও চিন্তা করেছিলেন, সেজন্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরাও যাতে ধর্মব্রত পালনের উদ্দেশ্যে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সংসার ত্যাগ করে বৌদ্ধ আচার-আচরণের মাধ্যমে মুক্তি পেতে পারেন তার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এঁদের বলা হত, ভিক্ষুণী বা শ্রমণা। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নান্‌দের সঙ্গে বৌদ্ধ শ্রমণাদের আচার-আচরণের প্রভূত মিল দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে এ রকম প্রমাণ আছে যে, বুদ্ধদেবের জীবন-কালেই শ্রমণাসম্প্রদায় গঠিত হয়। তবে শ্রমণাদের মর্যাদা শ্রমণদের চেয়ে কম ছিল। শ্রমণারাও শ্রমণদের মত আচার-আচরণ পালন করতেন। শ্রমণদের আদেশ পরামর্শ এবং নির্দেশ পালন করা শ্রমণাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। তাঁরা কোন সময়েই বৌদ্ধশ্রমণদের উপদেশদান, তাঁদের নিন্দা বা তাঁদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করতে পারতেন না। তাঁদের স্বাধীন চলা-ফেরাতেও বিধি-নিষেধ ছিল *॥

বুদ্ধদেব, আগেই বলা হয়েছে, গৃহী, বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য দুরকম ধর্ম-আচরণপদ্ধতি প্রচলন করেন এবং সত্য, অস্তেয়, অহিংসা ইত্যাদি স্বভাবসিদ্ধ ধর্মনীতির প্রাধান্য ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব বেদ মানতেন না, বর্ণবিভেদও মানতেন না; কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণবিচার প্রথা রহিত করেন এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তবে একথা ঠিক, হিন্দু ভারতের বর্ণাভিমানকে তিনি খর্ব করেছিলেন, ইতর ভদ্র, এমন কি অন্ত্যজবর্ণের লোক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের মত ভিক্ষু হতে পারতেন, কিন্তু দলের মধ্যে সব সময়েই খুব সূক্ষ্মস্তরের বর্ণভেদ প্রচলিত ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। তবে যেসব ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধবিহারে প্রবেশ করেছিলেন, বৌদ্ধশ্রমণ সমাজে তাঁদের আধিপত্য একেবারেই ছিল না॥

বুদ্ধদেব কোন লিখিত গ্রন্থ রেখে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চারটি

* দ্রষ্টব্য; Transactions of the Royal Asiatic Society Vol II, P. 491, 495,
Vol VIII P. 273, 277.
Asiatic Researches Vol. VII, P. 42.
Hardy's Eastern Monachism Page 6-165.

মহাসভা হয়। প্রায় ৪৮৩ খৃষ্টপূর্ব অব্দে রাজগৃহে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বৌদ্ধমহাসঙ্গীতি এবং সেখানেই বুদ্ধদেবের উপদেশ এবং অন্যান্য বাণী সংকলিত হয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র তৈরী হয়ে যায়। ঐ শাস্ত্রের তিন ভাগ—সুত্তপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধম্মপিটক—অথবা একত্রে তিপিটক (ত্রিপিটক)। এই ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে॥

বৌদ্ধশাস্ত্র ভোটভাষাতেও অনুবাদ করা হয়—এই অনুবাদের কালবিস্তৃতি খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত—প্রায় সাতশো বছর। ভোট-ভাষায় অনুবাদিত বৌদ্ধশাস্ত্রের নাম কহ্-গ্যুর এবং তন্ গ্যুর।[১] প্রথমটির মধ্যে ১০৮৩ খানি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট—সেগুলি কখনও ১০০, কখনও ১০২, কখনও ১০৮টি বড় বড় খণ্ডে ভাগ করে নিয়ে মুদ্রিত করা হয়। এ ছাড়া চীনাভাষা, মোঙ্গলভাষা, এবং অন্য অন্য ভাষাতেও মুদ্রিত হয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধরা বৌদ্ধশাস্ত্র পালি এবং সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করান এবং সেখান থেকে শ্যাম, কম্বোজ, ব্রহ্মদেশ, জাভা, বালি, সুমাত্রা, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধশাস্ত্র সেই সব দেশের ভাষায় অনুবাদিত হয়ে প্রচারিত হয়। 'মহাবংশ' গ্রন্থের সাক্ষ্য মানলে আমাদের স্বীকার করতে হবে, বুদ্ধদেবের নির্বাণের ৯৫৩ বৎসর পর থেকে ৯৭৫ বৎসর বৎসর পর্যন্ত [ ৪১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ ] বুদ্ধঘোষ সিংহলী ভাষায় বিরচিত অত্থকথা পালিতে অনুবাদ করেন; 'পিতকত্তয়ের' ( পিটকত্রয় ) ভাষা সংগ্রহ করেন এবং নানোদয়, অত্থশালিনী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই মহাবংশের রচয়িতা মহানাম ছিলেন সিংহলের রাজা ধাতুসেনের কাকা। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সেজন্যে মনে হয়, বুদ্ধঘোষের অনুবাদ এবং অন্যান্য গ্রন্থরচনা মহানামের রাজত্বকালেই হয়েছিল। যেহেতু মহানামের রাজত্বকালেই বুদ্ধঘোষের সমস্ত গ্রন্থাদি প্রণীত হয়, সেজন্য মহানামের সাক্ষ্য অধিকতর প্রমাণিক বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন॥[২]

প্রাচীনতম বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শ্রমণরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতেন না। তাঁদের মতে জড়পদার্থ নিত্য, ও সেই জড়পদার্থের শক্তিতেই সব কিছু সৃষ্ট হয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে প্রলয় ঘটলে ঐ জড়ের প্রভাবেই বা জড়ের অন্তর্ভুক্ত গুণের প্রভাবেই আবার সৃষ্টি হয়। পরে নেপালে বৌদ্ধদের একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়— তাঁরা একটি আদি-

১। ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ( ২য় খণ্ড ) উপক্রমণিকা, পৃষ্ঠা ২৭৩

—অক্ষয়কুমার দত্ত॥

২। Introduction to Buddhaghosa's Parables : Translated by Captain T. Rogers—Max Muller.pp X—XXIV

বুদ্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করে এসেছেন।[১] সেই আদিবুদ্ধ নিত্য, নিরাকার, জ্ঞানবান, দয়াবান ও ন্যায়বান—তিনি স্বতন্ত্ররূপ, তিনি স্বেচ্ছায় সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। এই সম্প্রদায়কে এক হিসাবে আস্তিক বলা চলে। এঁদেরও আবার দুই ভাগ। এক দল বলেন, প্রথমে একমাত্র এই আদিবুদ্ধই ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না। আর দ্বিতীয় দল বলেন, আদিবুদ্ধ ছিলেন, জড় পদার্থের অস্তিত্বও ছিল। সেই আদিবুদ্ধ নিজের ইচ্ছা অনুসারে আত্মস্বরূপ থেকে অন্য পাঁচটি বা সাতটি বুদ্ধ উৎপাদন করেন। এঁরা ধ্যানীবুদ্ধ। এই ধ্যানীবুদ্ধদের থেকে আরও পাঁচটি বা সাতটি বুদ্ধ উৎপন্ন হন—তাঁরা হলেন বোধিসত্ত্ব। এঁরা প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন॥

কিন্তু সিংহলের বৌদ্ধরা সর্বতোভাবে নাস্তিক। নেপাল, ভুটান ও চীনের বৌদ্ধরা আদিবুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং অন্যান্য দেবদেবী তো বটেই, হিন্দু শাস্ত্রেরও নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব ইত্যাদিও বিশ্বাস করেন। এঁরা বুদ্ধদেবের যে-জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেছেন তাতে বারবার এসবের উল্লেখ আছে। সিংহলের ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধরা এসব কিছুই মানেন না॥

বৌদ্ধরা কিন্তু হিন্দুদের মত আপন আপন কর্মঅনুযায়ী বারবার যোনিভ্রমণ ও স্বর্গনরক ভোগ বিশ্বাস করেন। দুই রকম অনুষ্ঠান অনুসারে এঁদের মধ্যে দুটি শাখার উৎপত্তি হয়েছে: হীনযান ও মহাযান। হীনযানীরা সাংসারিক কর্তব্য-অকর্তব্য অনুশীলন করে স্বর্গকামনায় সংযম, উপবাস ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে—আর মহাযানীরা নির্বাণ লাভ করার জন্য আত্মজ্ঞানের অনুশীলন ও ধ্যানযোগের অনুসরণ করেন। এঁদের 'ভাবনা' নামে একরকম শুভচিন্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সিংহল থেকে প্রকাশিত একখানি বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থে পাঁচ রকম ভাবনার কথা দেখতে পাওয়া যায়—মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ, উপেক্ষা। কি মানুষ, কি দেবতা—সবাই সুখী হোক, সকলেই রোগ শোক ও অসৎ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হোক, এমন কি নরকবাসীরাও সুখী হোক—এই ভাবনার নাম 'মৈত্রী' ভাবনা। দুঃখীর দুঃখ হরণ হোক, তাদের যথেষ্ট অন্নবস্ত্র লাভ হোক—এই ভাবনার নাম 'করুণা' ভাবনা। 'মুদিত' ভাবনা হচ্ছে—ভাগ্যবান ব্যক্তির সৌভাগ্যসম্পদ স্থায়ী হোক, প্রত্যেকেই আপন আপন কর্মানুযায়ী শুভ ফল লাভ করুক। 'অশুভ' ভাবনায় বলা হয়েছে, শরীর বিদ্যুৎলতার মত অস্থায়ী এবং মরীচিকার মত অসৎস্বরূপ ও মূত্র-পুরীষে পূর্ণ ঘৃণিত বস্তু। এই ভাবনা মহাযানীদের মতে নির্বাণ নগরীর দ্বারস্বরূপ। সমস্ত জীবই সমান, কেউই কোন প্রাণী অপেক্ষা

১। Asiatic Researches, Vol XVI P. 441
Buddhisme Indien I—Burnouf. P. 119.

অধিকতর প্রীতি বা ঘৃণার পাত্র নয়—এই ভাবনাই 'উপেক্ষা' ভাবনা। ভিক্ষুরা উষা বা সন্ধ্যায় নির্জনে বসে ভাবনা করবেন এমন বিধান আছে[১]॥

এই প্রসঙ্গে 'যান' কথাটির আলোচনাও প্রয়োজন। জীবাত্মার উত্তরোত্তর উৎকর্ষসাধনের সোপান পরম্পরার নাম 'যান'—চীনা ভাষায় 'চিঙ্গ'। চীন দেশের বৌদ্ধ সমাজে সচরাচর তিন রকম যান স্বীকৃত; শ্রাবক বা শ্রমণেরা প্রথম যান, প্রত্যেক বুদ্ধেরা দ্বিতীয় যানস্থ এবং বোধিসত্ত্বেরা তৃতীয় যানের অন্তর্গত। এঁরা এক এক রকমের যানের সাধনা দ্বারা উত্তরোত্তর ঐ পদ প্রাপ্ত হন। কেউ কেউ বলেন, যান পাঁচটি—মানুষেরা প্রথম যান, দেবতারা দ্বিতীয় যান, শ্রাবকেরা তৃতীয় যান, প্রত্যেক বুদ্ধেরা চতুর্থ যানস্থ এবং বোধিসত্ত্বেরা পঞ্চম যানস্থ। এঁদের মতে মানুষ এবং দেবতারা হীনযান; শ্রাবকেরা দ্বিতীয়, প্রত্যেক বুদ্ধেরা তৃতীয়, বোধিসত্ত্ব চতুর্থ এবং বুদ্ধেরা পঞ্চম বা মহাযানস্থ। হীনযানীরা মনে করেন, সংসার যন্ত্রণাময়; স্নেহ-মমতা ইত্যাদি এই যন্ত্রণার মূল। সেজন্যে সমস্ত দুঃখের মূল এই স্নেহ-মমতা ইত্যাদি ধ্বংস করাই নিতান্ত আবশ্যক। একমাত্র ধ্যান দ্বারাই ঐ সব বিনষ্ট হতে পারে। তা যদি করতে পারা যায় তবে নির্বাণরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করা যাবে। এই হচ্ছে হীনযান সাধকদের পরম লক্ষ্য। হীনযানরা মনে করেন, ধ্যানবলই প্রধান বল—স্বয়ং গৌতমবুদ্ধ নিজে এমন ধ্যানে সমারূঢ় ছিলেন যে, কি দেবতা কি মানুষ কেউ কখনও সেরকম ঘোরতর ধ্যান বা তপস্যায় নিবিষ্ট হতে পারেন নি। দেবতা ও মানুষেরা হীনযান সাধনা দ্বারা নরকবাস এবং অসুর দৈত্য ও ইতরজন্তুর যোনিপ্রাপ্তি সম্ভাবনা থেকে উত্তীর্ণ হন। শ্রাবক, বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বেরা নিজের নিজের পদোচিত বিশেষ বিশেষ সাধনা দ্বারা ত্রিলোক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। চরম অর্থাৎ মহাযান সাধনা দ্বারা জীবের আত্মা সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা বা বুদ্ধপদ লাভ করেন॥

দেহভঙ্গ ছাড়া সম্পূর্ণ নির্বাণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ইহলোকেও মানুষের একরকম নির্বাণ লাভের অধিকার আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা বলেন, গৌতম নিজে সেই নির্বাণ লাভ করেছিলেন। কেবল ধ্যানই এই অবস্থা লাভের একমাত্র উপায়। এই অবস্থায় রাগ দ্বেষ স্নেহ মায়া ইত্যাদি সমস্তই নষ্ট হয়; মনের সমস্ত ভাবই নষ্ট হয়ে যায়, মনের কোন রকম ভাব-জ্ঞানও থাকেনা, সমস্ত ভাবের অভাবজ্ঞানও থাকেনা। চর্যাপদের কবি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ এই অবস্থাকেই বলেছেন—

ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই
অইস সংবোহে কো পতিআই।

[ চর্যা : ২৯ ]

১। Eastern Monachism—Hardy, Page 243—252.

এইখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখার দরকার, হীনযানী এবং মহাযানী-দের যে মতবিরোধ সেটা কিন্তু বুদ্ধদেব প্রদত্ত কোন ধর্মোপদেশ নিয়ে নয়। কলহটা আসলে সেই উপদেশ পালন করে জীবনকে পরিপূর্ণ করার সাধনপন্থা নিয়ে। হীনযানীরা তাঁদের সাধনার মূল উদ্দেশ্য হিসাবে বিশ্বাস করতেন, নির্বাণ লাভের ওপর ; সেই নির্বাণ বুদ্ধনির্দেশিত পথেই আসবে—কিন্তু সেই পথটি হচ্ছে ধ্যান এবং অন্যান্য নৈতিক আচার-আচরণের অতি নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার পথ। সেখানে সাধককে সাধনা করতে হবে শূন্যতার— যে শূন্যতা পাওয়া যাবে অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে মিলিয়ে দেওয়ায়, বিলুপ্ত করায়॥

মহাযানীরা মনে করেন, হীনযানীদের নির্বাণ সাধনা বা অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে মিলিয়ে দেওয়ার শূন্যতার সাধনা জিনিসটা ঠিক নয়, এই উদ্দেশ্যটাও সত্য নয়। নির্বাণ লাভ করার সাধনার চেয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করার সাধনাটাই বড়। বুদ্ধত্বলাভ বলতে তাঁরা বুঝতেন বোধিচিত্তের অধিকারলাভ। তাঁদের কাছে এই বুদ্ধত্বলাভ হচ্ছে করুণা এবং শূন্যতার একটি সমন্বয়। তাঁরা ভাবতেন, হীনযানীদের নিষ্ঠাপূর্ণ আচারপরায়ণতাটা সঠিক ধর্ম সাধনা নয়, যেমন নয় ব্রাহ্মণদের আচারসর্বস্ব যাগযজ্ঞ মন্ত্রপাঠ বলিদান স্নান তর্পণ মোক্ষলাভের প্রকৃত উপায়। ধর্মসাধনাটাকে এই পর্যায়ে রাখলে শেষে সেটা একটা শুষ্ক আচারপরায়ণতায় পর্যবসিত হবে। তাকে করতে হবে ব্যক্তিগত উপলব্ধি সাধনা ও সিদ্ধির বস্তু। তাই সেখানে গণ্ডীবদ্ধ নৈষ্ঠিকতায় আবদ্ধ থাকলে চলবে না—সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মনোময় ব্যক্তিসাপেক্ষতার এবং বর্জন করতে হবে আচারনৈষ্ঠিকতাকে। তাই মহাযানী ধর্মসাধনায় সাধকের আছে নিয়মনিষ্ঠ বস্তুতান্ত্রিক কঠোর আচার-পরায়ণতা থেকে মুক্তি পাবার অবকাশ॥

এই মুক্তির অবকাশ আছে বলেই মহাযানী সাধনপদ্ধতিতে সমসাময়িক অবৌদ্ধ ধর্মের নানা ধারার অনুপ্রবেশ ঘটবার সুযোগ হল বেশি। বিশেষ করে বাংলাদেশে খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্মের নানারকম তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ছোঁওয়া এসে লাগল। চর্যাপদের সমসাময়িক কালে বা তার সামান্য কিছু আগে গুহ্য সাধনতত্ত্ব পূজা আচার ও নীতিপদ্ধতির প্রয়োগ দেখা গেল॥

এই যে তান্ত্রিক আচার-আচরণের এবং তার সঙ্গে মন্ত্র তন্ত্র গুহ্য সাধনতত্ত্বের অনুপ্রবেশ মহাযানী সাধনপন্থায় ঘটেছিল, তার একটা গূঢ় সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও তান্ত্রিকতা, রহস্যময় গূঢ়ার্থক গুহ্য মন্ত্র যন্ত্রধারণী বীজ মণ্ডল—এই সমস্ত অনুপ্রবিষ্ট হয় এই সময়ে। এর কারণ ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্ম উভয়েই এই সময়ে নিজেদের প্রভাবের সীমাকে একটু বাড়িয়ে আদিম কৌম সমাজের ওপর

সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা বিস্তার করতে চেয়েছিল। দুর্গম পর্বতের গুহায় এবং গহন অরণ্যের অন্তরালে যে-আদিম অধিবাসীরা বহু যুগ ধরে নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের বাইরে রেখে স্বকীয় সহজ স্বচ্ছ জীবনযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছিল তাদের নিজস্ব পূজা পদ্ধতি ধর্মাচরণ এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াক্রর্মে ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী পিশাচ মায়া মন্ত্র যন্ত্র গূঢ়ার্থক অক্ষর—এক কথায় অলৌকিক অতিপ্রাকৃত যাদুশক্তির ওপর বিশ্বাস ছিল প্রধান। এই অতিপ্রাকৃত যাদুশক্তিতে বিশ্বাসী আদিম কৌম সমাজকে নিজেদের প্রভাবের মধ্যে আনতে গিয়ে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা সহজ সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিতে আদিম কৌম সমাজের যাদুশক্তিতে বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। আর সেই কারণেই মন্ত্র তন্ত্রের অনুপ্রবেশ বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মে হয়ে থাকতে পারে। বৌদ্ধ আচার্য অসঙ্গ নাকি এইসব জিনিসকে মহাযানী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মেনে নিয়েছিলেন, এরকম কথা প্রচলিত আছে। আবার, আদিম কৌম সমাজের যারা স্বেচ্ছায় বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্যধর্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের জপ তপ ধ্যান ধারণা আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়া পদ্ধতি সব নিয়েই নতুন ধর্মে যোগ দিয়েছিলেন, এরকমও হতে পারে। পরে হয়ত আদিম কৌম সমাজের ধর্মবিশ্বাসগুলিকে সংস্কার ও শোধন করে নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা। এই সমস্ত কারণের কোন্‌টা অধিকতর ভাবে সম্ভব তা আর আজকে সঠিক ভাবে বলা যাবে না, কিন্তু এই ধরনের একটা সমন্বয় যে পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অষ্টম-নবম শতক বা তার কিছু আগে থেকে হয়েছিল সেটা জোর করে বলা যায়, কেবল কি করে এই তান্ত্রিক বিবর্তন ঘটেছিল সেটার সঠিক কারণ দেওয়া যাবে না॥

মহাযানী সাধনপদ্ধতিতে আদিম কৌমসমাজের বা অন্য কোন এখনও অনাবিষ্কৃত সূত্র থেকে আগত এই মন্ত্র তন্ত্র এবং নূতন ধ্যানকল্পনার প্রতিষ্ঠার ফলে মহাযানী ধর্মাচরণের মধ্যে নানা বিবর্তনের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিবর্তনের প্রথম ধাপ মন্ত্রযান—যার মূল প্রেরণা মন্ত্র এবং সেই মন্ত্র থেকে ধারণী ও বীজ। এই নূতন ধারণা যে-বৌদ্ধাচার্যরা প্রবর্তন করলেন তাঁদের বলা হতে লাগল মন্ত্রযানী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় প্রাচীন মহাযানী ধারণার মূল আশ্রয় শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদ যোগাচার মধ্যমিকবাদ ইত্যাদি কিছুই বুঝতেন না কিংবা বুঝলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁদের কাছে নূতনতর ধারণাটিই অধিকতর সহজ ও সত্য বলে হয়ত মনে হয়ে থাকবে।

এইভাবে আরেকটি শাখার সৃষ্টি হল যার নাম বজ্রযান।

বজ্রযানীরা মনে করতেন, নির্বাণের পর তিনটি অবস্থা—শূন্য, বিজ্ঞান, ও মহাসুখ।

শূন্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য নাগার্জুন বলেন, আমাদের সমস্ত দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, চারদিকের সংসার এবং সংসারের সমস্ত মোহ আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা—সবই শূন্য। এই শূন্যতার পরম জ্ঞানই হচ্ছে নির্বাণ। এই যে শূন্যতার পরমজ্ঞান, তাকে বলা হল নিরাত্মা এবং তিনি দেবীরূপে কল্পিতা বলে তাঁর নাম হল নৈরাত্মা দেবী। সাধকের বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মায় বিলীন হয়ে যায় তখন জন্ম নেয় মহাসুখ। নরনারীর দৈহিক মিলনের ফলে যে পরম আনন্দ, যে-এককেন্দ্রিক উপলব্ধিময় ধ্যান—তাকেই বজ্রযানীরা বলেন বোধিচিত্ত। সাধক যদি ইন্দ্রিয়শক্তিকে সম্পূর্ণ দমন করতে পারেন, তবে সেই বোধিচিত্ত হবে বজ্রের মত কঠিন এবং দৃঢ়। বোধিচিত্ত সেই বজ্রভাব পেলে তবেই বোধিজ্ঞানের উন্মেষ সম্ভব। চঞ্চল চিত্তকে সেই বজ্রভাবে নিয়ে যাবার যে-সাধনা তাকেই বলে বজ্রযান। বজ্রযানে নরনারীর দেহমিলনের কথা বলা হয়েছে, আবার ইন্দ্রিয়শক্তিকে দমনের কথাও বলা হচ্ছে—জিনিসটা তাই একটু গোলমেলে ঠেকতে পারে। সেই সংশয় দূর করার জন্য সিদ্ধাচার্যরা বলছেন, ইন্দ্রিয়কে দমন করতে গেলে আগে সেই ইন্দ্রিয়কে জাগাতে হবে; মৈথুন সেই জাগরণের উপায়। মৈথুনজাত আনন্দ বা সাধকের বোধিচিত্তকে স্থায়ী করা যাবে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে আর সেই মন্ত্র ও সাধনার শক্তিতে মৈথুনজাত আনন্দ থেকে বিভিন্ন দেবদেবী জন্ম নেবেন এবং সাধকের ধ্যানচক্ষুর সামনে এক একটি মণ্ডলে অধিষ্ঠিত হবেন। সাধক যদি এই মণ্ডলগুলি সম্যক্‌ ধ্যান করতে থাকেন, তবেই তাঁর বোধিচিত্ত স্থায়ী দৃঢ় এবং কঠিন হয়ে আস্তে আস্তে বোধিজ্ঞানে বিলীন হয়ে যাবে। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় দমিত হয়ে গেছে, সমস্ত কামনাবাসনা অন্তর্হিত হয়েছে এবং সাধক তখন পরমজ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য এই সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্য ও কঠিন। আর তার চেয়েও কঠিন যে-ভাষায় এবং যে-শব্দে এই সাধনপদ্ধতি বোঝানো হয়। গুরু ছাড়া আর কেউ তা বোঝাতে পারেন না, আবার গুরুর কাছে দীক্ষা না পেলে কোন শিষ্য তা বুঝতে পারেন না। গুরু এই সাধনপদ্ধতি বুঝিয়ে না দিলে কেউ তা অনুসরণ করতে পারে না—তাই বজ্রযানে গুরু ছাড়া কোন কিছুই করা যাবে না, গুরুকৃপা না থাকলে সেখানে সাধকের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব॥

বজ্রযানে আছে মন্ত্র গুরু দেবদেবী এবং তার ধ্যান। এই সাধনারই বিবর্তিত সূক্ষ্মতর স্তরের নাম সহজযান। বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তিরূপের ছড়াছড়ি, সুতরাং তার দেবায়তনও প্রশস্ত। মন্ত্র, মুদ্রা, পূজা, আচার, অনুষ্ঠানে বজ্রযানের সাধনমার্গ পরিকীর্ণ। সহজযানে যেমন দেবদেবীর স্বীকৃতি নেই, তেমনি নেই মন্ত্র মুদ্রা পূজা আচার অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি। সহজযানীরা বলেন, কাঠ মাটি বা পাথরের তৈরী

দেবদেবীর কাছে প্রণত হচ্ছ কেন ? বাহ্যানুষ্ঠানের কোন মূল্যই নেই। ব্রাহ্মণদের আচারসর্বস্বতা তাঁদের কাছে উপহাসের বস্তু তো ছিলই, এমনকি যেসব বৌদ্ধ মন্ত্র-জপ পূজার্চনা কৃচ্ছ্রসাধন প্রব্রজ্যা ইত্যাদি করতেন তাঁদেরও তাঁরা তামাশা ও নিন্দা করতে ছাড়তেন না। সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের ধ্যানধারণা ও মতবাদ দোহাকোষের অনেকগুলি দোহায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। যেমন—

কিন্তোহো দীবেঁ কিন্তোহো নিবেজ্জ
কিন্তোহো কিজ্জই মন্তই সেব্বঁ।
কিন্তোহো তিথ তপোবন জাই
মোকৃখ কি লব্‌ভই পানি হ্নাই॥

[ কী হবে তোর প্রদীপে, কী হবে তোর নৈবেদ্যে, কী হবে তোর মন্ত্রের সেবায়, কী হবে তোর তীর্থে আর তপোবনে গিয়ে ! জলে স্নান করলেই কি মোক্ষলাভ হয় ? ]

অথবা

এস জপহোমে মণ্ডল কম্মে
অনুদিন আচ্ছসি বাহিউ-ধম্মে।
তো বিণু তরুণী নিরন্তর ণেহে
বোধি কি লব্‌ভই প্রণ বি দেহে॥

[ এই জপ হোম মণ্ডল কর্ম নিয়ে সর্বদা বাহ্য ধর্মে লিপ্ত আছিস! তোর নিরন্তর স্নেহ ছাড়া, হে তরুণি, এই দেহে কি বোধিলাভ হয়! ]

সহজযানীরা বলেন, বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর স্বয়ং বুদ্ধদেবও জানতেন না, সাধারণ লোক তো দূরের কথা। বুদ্ধোঽপি ণ তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা কোথায়! সকলেই তো বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে—দেহাস্থিতং বুদ্ধত্বং; দেহহি বুদ্ধ বসন্তি ণ জানই। সহজিয়াদের মতে শূন্যতা হল প্রকৃতি আর করুণা হল পুরুষ। এই শূন্যতা ও করুণা অর্থাৎ নর ও নারীর মিলনে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটাই হচ্ছে 'মহাসুখ'। এই মহাসুখই হচ্ছে ধ্রুবসত্য; এই ধ্রুবসত্যের উপলব্ধি ঘটলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কামনা নষ্ট হয়ে যায়, সংসারের ভালো-মন্দের ধ্যানধারণা, আত্ম-পর ভেদবুদ্ধি সমস্ত সংস্কার বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থাই হচ্ছে 'সহজ' অবস্থা। এর জন্য মূর্তি লাগেনা, তন্ত্র লাগেনা, মন্ত্র লাগেনা; জপ তপ ধ্যান নৈবেদ্য দীপ ধূপ সমস্তই নিরর্থক; অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার ও শাস্ত্রজ্ঞান। সহজ

সাধকরা শূন্যতাবাদ বিজ্ঞানবাদ মধ্যমিকবাদ সমস্ত বর্জন করে ধরে রাখলেন একমাত্র দেহবাদ বা কায়াসাধন ॥

বজ্রযানেরই অন্য এক রকম সাধনপন্থার নাম কালচক্রযান। এই যানের সাধকরা মনে করেন, শূন্যতা এবং কালচক্র এক এবং অভিন্ন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অবিরাম প্রবহমান কালস্রোত চক্রাকারে ঘূর্ণমান। এই কালচক্র সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ; এই কালচক্রই আদিবুদ্ধ এবং সমস্ত বুদ্ধের জন্মদাতা। প্রজ্ঞা এবং কালচক্র একত্র মিলিত হয়ে এই জন্মদান কার্যটি সম্পন্ন করেন। কাল-চক্রযানীদের উদ্দেশ্য এবং সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে কালচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিরস্ত করা অর্থাৎ নিজেদেরকে সেই কালপ্রবাহের উর্ধ্বে উন্নীত করা। কিন্তু কালকে নিরস্ত করা যাবে কি ভাবে? কালের গতির লক্ষণ হচ্ছে একের পর এক কার্যের মালা; কার্যপরম্পরা অর্থাৎ গতির বিবর্তন দেখেই আমরা কালের ধারণায় উপনীত হই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কার্যপরম্পরা মূলত প্রাণক্রিয়ার পরাম্পরা, কাজেই প্রাণক্রিয়াকে নিরস্ত করতে পারলেই কালকে নিরস্ত করা যাবে। কালচক্রযানী বলেন, যোগসাধনার দ্বারা দেহের মধ্যেকার নাড়ী এবং নাড়ীকেন্দ্রগুলিকে আয়ত্ত করতে পারলেই, অর্থাৎ পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করতে পারলেই প্রাণক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করা যায় এবং তাতেই কাল নিরস্ত হয়। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করা দরকার, কালকে নিরস্ত করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন কালচক্রযানীদের সাধন-পদ্ধতিতে তিথি বার নক্ষত্র রাশি যোগ প্রভৃতির একটা বড় জায়গা থাকা স্বাভাবিক। সেজন্যই কালচক্রযানীদের মধ্যে জ্যোতিষ এবং গণিত বিদ্যার চর্চা ছিল বেশি। পণ্ডিতরা বলেন, তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে কালচক্রযানের উৎপত্তি ভারতের বাহিরে সম্ভল নামক কোন এক জায়গায়, পাল রাজাদের রাজত্ব কালের কোন এক সময়ে বাংলাদেশে আসে। কালচক্রযান সম্পর্কে কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন অভয়াকর গুপ্ত ॥

বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ইত্যাদি সমস্ত যানগুলির সকলেরই নির্ভর যোগ-সাধনার ওপর; এদের সকলেরই মূল প্রতিষ্ঠিত যোগাচার ও মধ্যমিক দর্শনের ভিত্তির ওপর। পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন, এই তিনটি যান একই ধ্যান-কল্পনা থেকে এসেছে এবং ব্যবহারিক সাধনার ক্ষেত্রে এই তিন যানের মধ্যে মূলত পার্থক্যও খুব বেশি নেই। এমনও হয়েছে, একই সিদ্ধাচার্য একাধিক যানের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করবার—এইসব বিভিন্ন যানের উৎপত্তি যেখানেই হোক না কেন, বাংলা দেশের মাটিতে এরা লালিত

পালিত। বিভিন্ন যানপন্থী বাঙালী সিদ্ধাচার্যরাই এই বিচিত্র গুহ্য সাধনার সাধন-পদ্ধতি একাধিক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন॥

যে-যোগের ওপর এই তিন যানের নির্ভর সেই যোগ হঠযোগ নামে পরিচিত এবং তা মানবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শরীর জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানবদেহের নাড়ীপ্রবাহ, তাদের উর্ধ্বমুখী গতি, বিভিন্ন নাড়ীর সংযোগকেন্দ্র, তাদের উৎপত্তি স্থল, নাড়ীচক্র প্রভৃতি সমস্তই এই শারীর জ্ঞানের অন্তর্গত। বৌদ্ধদের মতে ললনা, রসনা এবং অবধূতি—এই তিনটিই প্রধান নাড়িপ্রবাহ। এদের মধ্যে অবধূতির গতি উর্ধ্বমুখী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত। নাড়িপ্রবাহের গতিকে সাধক স্বেচ্ছায় চালনা করতে পারেন এবং সেই চালনার শক্তি অনুযায়ী সাধকের বোধিচিত্তের ধ্যানদৃষ্টি উন্মীলিত ও প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যোগসাধনার খুব বেশি পার্থক্য নেই। এই ললনা-রসনা-অবধূতি ব্রাহ্মণ্য যোগতন্ত্রে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না ছাড়া আর কিছুই নয়॥

বজ্রযান সাধনপদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল গুরু—বা সাধনপথনির্দেশক ও পরিচালক। গুরুরা সাধনপথের কোন্ মার্গে শিষ্যের স্বভাবগত প্রবণতা আছে সেটা গভীর ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তবে স্থির সিদ্ধান্তে আসতেন। এই বিচারপদ্ধতিকে বলা হয় 'কুলনির্ণয়' পদ্ধতি। ডোম্বী নটী রজকী চণ্ডালী ব্রাহ্মণী—এই পাঁচটি কুল প্রজ্ঞার পাঁচটি রূপ। ভৌতিক মানবদেহ আবার পাঁচটি স্কন্ধ—রূপ বেদনা সংজ্ঞা বিজ্ঞান সংস্কার—এদের সারোত্তম দ্বারা গঠিত। যে-সাধকের মধ্যে যে স্কন্ধটি বেশি শক্তিশালী বা সক্রিয় সেই অনুযায়ী তার কুল নির্ণয় হত এবং তাঁর সাধনপন্থাও সেই অনুসারে স্থিরীকৃত হত। গুরুই এসব ঠিক করে দিতেন বলে গুরু ছাড়া বজ্রযান সাধনা ছিল অচল॥

বজ্রযান সাধনায় দেবদেবীর স্থান ছিল অপরিহার্য। আগেই বলা হয়েছে, বজ্রযানে সাধক স্থিতনিষ্ঠ হলে তাঁর ধ্যানচক্ষুতে একটি দেবদেবী জন্ম নেন এবং তাঁদের নির্ধারিত মণ্ডলে আশ্রয় নেন। এই দেবদেবীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য হেবজ্র, বজ্রসত্ত্ব, হেরুক, মহামায়া, বজ্রযোগিনী, সিদ্ধবজ্রযোগিনী, বজ্রধর, বজ্রভৈরব, কুরুকুল্লা, হেবজ্রোদ্ভব ইত্যাদি। বাঙালী বৌদ্ধ ও সিদ্ধাচার্যরা এই সব দেবদেবীর স্তুতিগান করে অসংখ্য গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচনা করেছিলেন। তবে তাদের অধিকাংশই হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা আজও অপরিজ্ঞাত আছে—সামান্য কিছু মাত্র আমাদের হাতে এসেছে॥

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিল না থাকলেও ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম-

মত এবং জীবনদর্শন হিন্দুশাস্ত্রপ্রভাববর্জিত নয়। বুদ্ধদেব মানবজীবনের বিভিন্ন দুঃখ এবং তার থেকে মুক্তির পথই নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। জীবনের এই দুঃখ এবং যন্ত্রণার কথা আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের মুনিঋষিদের অগোচর ছিল না। উপনিষদে স্পষ্টই বলা হয়েছে এই পৃথিবীকে মায়াময় জেনে ব্রহ্মপদে প্রবেশ করতে পারলেই জীবনের যন্ত্রণা এবং দুঃখভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। অনিত্য জগৎ এবং অনিত্য জগৎ থেকে জাত মোহ এবং অবিদ্যাই আমাদের দুঃখভোগের কারণ এবং সেই মোহ অবিদ্যা মিথ্যাকে ধ্বংস করতে পারলে তবেই মোক্ষলাভ সম্ভব, সে কথা তাঁরা বলে গেছেন। এই মোক্ষের ধারণার সঙ্গে ভগবান বুদ্ধদেবের নির্বাণতত্ত্বের কোন অমিল নেই। অমিল হচ্ছে মোক্ষলাভ করার রাস্তা নিয়ে। জপ তপ পুজো আর্চা মন্ত্র বলিদান এইসব বাইরের আচার আচরণ দিয়ে কি মোক্ষলাভ করা যাবে, না কি যাগযজ্ঞ বাদ দিয়ে আত্ম-তত্ত্ব অবগত হলে মুক্তি পাওয়া যাবে, কিংবা শৃঙ্খলার সঙ্গে কাম অর্থ ইত্যাদি সম্ভোগ করলে মোক্ষ পাওয়া যাবে—এসব কথা হিন্দু দার্শনিকরা ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্বেই আলোচনা করে গেছেন। বুদ্ধদেব অবশ্য হিন্দু ধারণা—পরমাত্মা থেকে মায়ার যোগে জীবাত্মার এবং নানা রকম মোহের সৃষ্টি, আবার সেই মোহজাল ছিন্ন করতে পারলে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মুক্তি লাভ করতে পারে —এই বিষয়টি মানেন না। এর প্রধান কারণ, তিনি জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু মানবজীবনের দুঃখের প্রধান কারণ যে অবিদ্যা বা মোহ-—এর সঙ্গে তিনি একমত। বুদ্ধদেব বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই কর্মের দ্বারা গঠিত, কর্মসমষ্টিই রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধ অবলম্বন করে জন্মজন্মান্তরে রূপায়িত হয়ে উঠছে, আর এই কর্মের হেতু থেকেই প্রত্যয়ীভূত জগতের উদ্ভব। এই যে কর্মবশ্যতা, সেটাই অবিদ্যা এবং তার থেকেই আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখের সূত্রপাত ও বৃদ্ধি। তাই, মানুষ যদি অবিদ্যার বশীভূত না হয়, সে যদি জাগতিক, অতএব মিথ্যা কামনা বাসনা ত্যাগ করতে পারে তবেই সে দুঃখ নিরোধ করতে সক্ষম হবে এবং এই ভাবেই সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে॥

বৌদ্ধেরা হিন্দুদের মত মৃত্যুর পর নানারকম যোনিভ্রমণ স্বীকার করেন। যিনি ইহকালে যেমন শুভাশুভ কাজ করেন পরকালে তিনি সেরকম যোনিপ্রাপ্ত হন। কেবল পশু পাখি কীট ইত্যাদি নিকৃষ্ট জন্তু নয়, পাপের পরিণাম অনুসারে মৃৎপিণ্ড, ইত্যাদি জড়বস্তু হয়েও জন্মগ্রহণ করতে হয়। যদি কেউ এমন ঘোরতর পাপ করে

যে, এসব নিকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেও উচিতমত শাস্তি হল না—তাহলে তাকে নরকস্থ হতে হয়। বৌদ্ধমতে একশো ছত্রিশটি নরক বিদ্যমান আছে। যে যেমন পাপ কাজ করে তাকে সেই রকম নরকে যতদিন থাকা উচিত ততকাল থাকতে হয়। এই নরক ভোগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক কোটি বছরও হতে পারে। অবশ্য পুণ্যকাজেরও তেমনি পুরস্কার আছে। পুণ্যবান লোক হয় মর্তলোকে উত্তম জন্মগ্রহণ করে সুখ ভোগ করেন, কিংবা বিবিধ রকম স্বর্গলোকের কোনো-একটি স্বর্গে দেবযোনি প্রাপ্ত হয়ে সুখ সম্ভোগ করতে থাকেন। স্বর্গসুখ ভোগের ক্ষেত্রে সময়টি শতকোটি বছরও হতে পারে। বৌদ্ধদের মতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ এই পাপপুণ্য কর্ম অনুযায়ী অসংখ্য জন্মের সুখদুঃখ দুটোই ভোগ করেছেন। পশু পাখি হিসাবে জন্ম নিয়ে তিনি কেমন ভাবে জীবন যাপন করেছেন, জাতকে তার বিশদ উল্লেখ আছে॥

বৌদ্ধরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতেন না, কিন্তু কালক্রমে তাঁরাই পৌত্তলিক হয়ে গেছেন, বুদ্ধদেবকে ঈশ্বর হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর দন্ত-অস্থি-কেশ-পূজা, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, মূর্তিপ্রতিষ্ঠা সবই তাঁরা করেছেন, অবশ্য হিন্দুদের সঙ্গে এই বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে—বৌদ্ধদের ঋত্বিক বা পুরোহিত নেই, প্রত্যেক বৌদ্ধ আপনিই আপনার পুরোহিত ও নিজেই নিজের যজমান। খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমেই ফা-হিয়ান অজস্র বুদ্ধমূর্তি এবং তাঁদের অর্চনা দেখে গেছেন।[১] কেবল শাক্যবুদ্ধ নয়, এক এক মন্দিরে অন্য অন্য বৌদ্ধ দেবতার প্রতিমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত ও অর্চিত হতে থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে বুদ্ধগয়ায় তারা দেবী ও বাগীশ্বরী দেবী, বৈসালীতে ( বৈসার গ্রামে ) ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও বোধিসত্ত্ব, ত্রিশিরা বজ্রবরাহী, বাগীশ্বরী, কপত্যদেবী ইত্যাদি বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আজও দেখতে পাওয়া যায়।[২] সিংহলের মহারাজ বিহারে পঞ্চাশটির বেশি বুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সেই সঙ্গে নাথ, বিষ্ণু, সামনদেব, পত্তিনেদেবী এবং বলগম্বাহু ও কীর্ত্তিনিস্সংগ নামে দুজন রাজার প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। রাজা বলগম্বাহু খ্রীষ্ট জন্মের ছিয়াশী বছর আগে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] তবে অশিক্ষিত বৌদ্ধদের মধ্যে সাকার উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত হলেও চীনের বৌদ্ধরা প্রতিমা পূজা এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নের সাহায্যে বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রসাদ লাভ ইত্যাদি চলিত ধর্মানুষ্ঠানগুলি স্বীকার করেন না। চুহি নামে চীনদেশের একজন বৌদ্ধধর্ম প্রচারক স্পষ্টই লিখে গেছেন, বৌদ্ধেরা স্বর্গমর্ত ইত্যাদি এবং বাহ্যবস্তু ও

১। The Pilgrimage of Fa-Hian. Page 44-95.

২। Cunningham's Archaelogical Survey of India. Vol. 1. Page 11, 31-36, 58.

৩। Forbes Ceylon Almanac. Quoted in Hardy's Eastern Monachism. Page-20.

প্রত্যক্ষ ব্যাপারগুলি স্বীকার করেন না। তাঁরা নিজের নিজের আত্মাতেই অভিনিবেশ করেন ; পারলৌকিক সুখদুঃখ মনঃকল্পিত এবং দোষাবহ ॥[১]

অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধদেরও নানারকম উৎসব ছিল। প্রয়াগের ধর্ম-ক্ষেত্রের যে-উৎসব চীনা পর্যটক য়ুয়াং চুয়াং দেখে যান, সে উৎসবের বিবরণ অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে। সিংহলে এখনও বর্ষাকালে একটি বৌদ্ধ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেখানে পালিভাষায় লেখা বৌদ্ধধর্মানুশাসন এবং বুদ্ধজীবনী পঠিত হয়ে থাকে —সেই উৎসবের নাম বনপাঠ। ভিক্ষুরা আগে বনপাঠের সময় বনে বর্ষাকালের তিনমাসের জন্য একটি অস্থায়ী বাসস্থান তৈরী করে নিতেন। সেই তিনমাসের পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে মহাসমারোহে বনপাঠ হত। পাঠের সময় প্রচুর বাজনা, রাত্রিতে আলোকসজ্জা, বাজি পোড়ানো এবং মশাল জ্বালিয়ে নানারকম অগ্নিক্রীড়া হত। পাঠের সময়ে যেখানে যেখানে বুদ্ধের নাম উচ্চারিত হত, সকলে সেই সময়ে বুদ্ধদেবের জয়ধ্বনি করে উঠত।[২] সিংহলে আরেকটি উৎসবের নাম পারিত্ত, এটিও পালি শব্দ। সিংহলের বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন, মানব জাতির সমস্ত দুঃখ দৈত্যবিশেষের কোপ থেকে উৎপন্ন। সেই দৈত্যের ক্রোধশান্তির উদ্দেশ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতেও বনপাঠের মত বৌদ্ধশাস্ত্রপাঠ এবং বুদ্ধজীবনী আলোচনা হয়ে থাকে। বাঙালী বৈষ্ণবরা যেমন অষ্টপ্রহরী চব্বিশপ্রহরী নামকীর্তন অনুষ্ঠান করেন তেমনি সেখানেও একটানা সাতদিন ধরে বনপাঠ হয়ে থাকে। দুজন করে ভিক্ষু পর্যায়ক্রমে দুঘণ্টা হিসাবে একটানা সাতদিন এই বনপাঠ করে থাকেন। আগে এই উৎসব রাত্রিতে হত। সন্ধ্যা হলে শ্রোতারা পাঠক্ষেত্রে সমবেত হতেন, তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। তাঁরা প্রত্যেকে একটি করে নারকেলের মালা তেলে পূর্ণ করে আনেন, এবং উৎসবক্ষেত্রের চারদিকের প্রাচীরে সেই সমস্ত মালা রেখে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। ভুটানেও তিনটি প্রধান বৌদ্ধ উৎসব। একটি গ্রীষ্মকালের শুরুতে, দ্বিতীয়টি শরৎকালের প্রারম্ভে এবং তৃতীয়টি শীতকালের শেষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি শাক্যমুনির জন্মগ্রহণের স্মারক উৎসব। বুদ্ধদেব ছটি পাষণ্ডকে পরাভূত করেন—তারই স্মরণে তৃতীয় উৎসব। এই তৃতীয় উৎসবটি পনেরদিন ধরে চলে ,এবং সেইসময়ে নাচ, গান, ভোজন, আলোকসজ্জা ইত্যাদি চলতে থাকে।

১। Indian Antiquary. Dec. 1880. Page 316, 317.

২। Hardy's Eastern Monachism. Page—232—234.

বৌদ্ধধর্মের যে স্ব-স্বতন্ত্র রূপ ছিল, আজ আর ভারতবর্ষে তা নেই। থাকবার কথাও নয়, কারণ ভারতবর্ষ এমনই একটা দেশ যেখানে কোন ধর্মের পক্ষেই মিলন মিশ্রণ বাদ দিয়ে স্বতন্ত্ররূপে টিকে থাকা অসম্ভব। বৌদ্ধদের বহুকিছু হিন্দুরা গ্রহণ করেছেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব বিষ্ণুর এক অবতার হিসাবে হিন্দুদের দ্বারা স্বীকৃত।[১] ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বহুবিধ সাধনপদ্ধতি বৌদ্ধরা নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন হয়েছে সব চেয়ে বেশি। বজ্রযান মন্ত্রযান সহজযান কালচক্রযান পরে প্রবেশ করেছে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে নাথধর্মে, অবধূতমার্গীদের ধ্যান-ধারণায় ও আচার-আচরণে, কৌলমার্গীদের ধর্মে ও ধ্যানে এবং আজও কিছুটা বেঁচে আছে আউলবাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে। এদেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, নাথপন্থীরা বিলীন হন ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শৈবধর্মে, সহজিয়া সাধনপদ্ধতি প্রবেশ করেছে তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্মে, অবধূতমার্গীদের কিছু কিছু আচরণ বাংলার লোকায়ত সমাজের সন্ন্যাস-আচরণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়; কৌলমার্গীরা নিজেদের মিলিয়ে দিয়েছেন ব্রাহ্মণ্য শাক্ত ধর্মে।

তবে বাংলার কিছু স্থাননাম এবং লোকনামের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের কিঞ্চিৎ অবশেষ লুকিয়ে আছে। 'বুদ্ধ' চলিত বাংলায় হয়েছে 'বুদ্ধ্'—বোকা বা মূর্খ বোঝাতে। 'সংঘ' বাংলায় হয়েছে 'সাঙ্গাত্,' হিন্দিতে সংঘত—ঘনিষ্ঠ বন্ধু বোঝাতে। ধর্ম কথাটিরও নানা অর্থরূপান্তর ঘটেছে। বর্তমান বাংলার ধামরাই ( ঢাকা জেলা ), পাঁচথুপী ( মুর্শিদাবাদ জেলা ), বাজাসন, নবাসন, উয়ারী ( ঢাকা ) প্রভৃতি প্রাচীন স্থাননাম যথাক্রমে ধর্মরথ, পঞ্চস্তূপ বা পঞ্চস্তূপী, বজ্রাসন, নবাসন, উপকারিকা (অর্থ—সুসজ্জিত অস্থায়ী মণ্ডপ ) প্রভৃতি বৌদ্ধস্মৃতিবহ। এই প্রসঙ্গে 'বারোয়ারী' কথাটিও বিবেচ্য। ফার্সী 'বার' শব্দটির মানে দেশ, দেওয়াল, মণ্ডপ। প্রাচীনতম উয়ারী শব্দটি সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়েছে 'বারোয়ারী।' বৈষ্ণবদের ভেক্ কথাটি বিদ্রূপার্থে ব্যবহৃত হলেও মূলত বৌদ্ধ ভিক্ষু শব্দেরই বিকৃত রূপ। বাঙালীর পালিত, ধর, রক্ষিত, কর, গুঁই, দাম ইত্যাদি পদবীগুলিও বৌদ্ধ সূত্র থেকে এসেছে।[২]

বৌদ্ধ বজ্রযান মন্ত্রযান কালচক্রযান সহজযান ইত্যাদি বাংলাদেশের নাথযোগধর্ম, অবধূতমার্গ কাপালিকমার্গ ও আউলবাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কি ভাবে মিলে গেছে সে সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিম্নলিখিত মন্তব্য বিশেষ ভাবে বিবেচনাযোগ্য :

১। জয়দেব—গীতগোবিন্দ, দশাবতার স্তোত্র।

২। The Origin and Development of the Bengali Language : Introduction—Dr. Suniti Kumar Chatterjee.

The present day Tantric leaven in Bengal came to it via the Buddhist Kalacakrayana, the Vajrayana and the Sahajyana Schools of Tantrayan. One matter in which there has been a very subtle influence from Tantric Buddhism upon Bengal Brahmanism would seem to be this : the rather exaggerated importance of the *Guru* from whom Tantric initiation when he is invested with the sacred thread by the *Upanayana* rite···theoretically he does not require any other initiation. But, in practice all good Hindus in Bengal should have a *Guru* who will give him the *mantra*····· and the *guru* becomes almost as a god to him after his initiation. This mentality has become so thoroughly ingrained in the Bengali mind······ Now, the *guru* has always had an honoured place in Brahman Society ; but he was never an object of divine honours in Vedism. Whereas, as we see in Nepal where the Tantric Buddhism as in Bengal of the 10th—13th centuries still survives among the Newars, although the strong Saiva or Sakta cult of the Gurkhas has been profoundly modifying it, a Buddhist is known as a Gu-bhaju or a guru-worshipper and Brahmmanical Hindu as a De-bhaju or a Deva worshipper.[১]

১। Dr. S. K. Chatterjee—"Buddhist Survivals in Bengal," in B. B. Law Vol I : Page 75 ff.

## ।। পালি সাহিত্যের পরিচয় ।।

বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রকে বলা হয় 'তিপিটক', সংস্কৃতে বলে ত্রিপিটক। ত্রিপিটক কথাটির অর্থ—তিনভাঁজ-ওয়ালা পিটক বা বাক্স। এই নাম হওয়ার কারণ 'বিনয়পিটক', 'সুত্তপিটক' এবং 'অভিধম্মপিটক'—এই তিনটি পিটক নিয়ে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের মূল গঠিত। প্রায় ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দে, ভগবান বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর রাজগৃহে অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধমহাসঙ্গীতির পর এই তিনখানি ধর্মগ্রন্থের সঙ্কলন হয়। এর একশ বছর পরে বৈশালীতে হয় দ্বিতীয় বৌদ্ধমহাসঙ্গীতি। সেখানে এই সঙ্কলনগুলি পুনরায় সম্পাদিত হয়। তার কারণ হচ্ছে এই যে, এই একশ বছরের ভিতর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মমত এবং বৌদ্ধ আচরণবিধি নিয়ে বিভিন্ন মতামতের সৃষ্টি হয়। এই বিরোধ আসে বুদ্ধদেবের উপদেশের প্রামাণিকতা নিয়ে নয়, বিরোধ সৃষ্টি হয় তার অথকথা বা ভাষ্য বা টীকা নিয়ে । এই বিরোধ চলে অশোকের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ২৬৪ থেকে ২২৭ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দ পর্যন্ত। অশোক যে তৃতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেন সেখানে এই তিনখানি পিটকের সম্পাদনা এবং ভাষ্য অনেকটা সম্পূর্ণতা পায়। এই তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশনে থের তিস্স মোগ্গলিপুত্ত অভিধম্মপিটকখানি কথাবত্থুপ্পকরণ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করে শোনান। অভিযোগ উঠেছিল অভিধম্মে এই গ্রন্থখানিতে দুশ' বাহান্নটি ভুল ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। থের তিস্সের ব্যাখ্যা এবং আবৃত্তি সেই ভুলের অভিযোগকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করতে সাহায্য করে। এই সঙ্গীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানেই প্রথম বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী মহেন্দ্র থেরবাদের আকারে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের মূল কথাগুলি সিংহলে নিয়ে যান ॥

এই ধর্মশাস্ত্রগুলি প্রথম অবস্থায় লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না, কারণ তখনও পর্যন্ত সংস্কৃত লিপিই সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সেইজন্য বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি বৌদ্ধধর্মগুরুদের মুখে মুখে শিষ্য পরম্পরায় যুগ থেকে অন্য যুগে প্রচারিত হয়ে আসছিল। এক একটি বিহারের প্রধান ধর্মগুরুদের নিজেদের দেওয়া ভাষ্য বা টীকাও ছাত্রদের জানতে হত। গুরুমুখে যেমন শোনা হত, শিষ্যকে কঠোরভাবে তা স্মৃতিতে রক্ষা করতে হত, একটি শব্দেরও অদল বদল

করা চলত না। আর শ্লোকগুলি আবৃত্তি করার পূর্বে তাদের বলে নিতে হত 'এবং মে সুত্তম' আমি এই রকমই শুনেছি। বড় বড় সঙ্গীতিতে, ধর্মালোচনা-সভায়, আন্তঃ-বিহার বিতর্কের সময় এই আবৃত্তি শোনা হত, ভাষ্য বা অথকথা বিচার করা হত এবং তারপর সেই অথকথার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠেরও সরকারী ধর্মীয় অনুমোদন লাভ সম্ভব হত। বৌদ্ধধর্মাচার্যদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের অথ-কথা নিয়ে যে মতভেদ ছিল, তার একটি সুন্দর প্রমাণ পাই বুদ্ধশিষ্য পুরাণের জীবনের একটি ঘটনায়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধমহাসঙ্গীতি চলেছে, বুদ্ধশিষ্য পুরাণ সেখানে নিমন্ত্রিত। বৌদ্ধধর্মাচার্যরা সঙ্গীতির আলোচনায় অংশ নেবার জন্য পুরাণকে অনুরোধ করলেন। পুরাণ দেখলেন, বুদ্ধদেবের উপদেশের মর্মার্থ নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ। তখন তিনি এই বিতর্কে অংশ না নিয়ে বিনীতভাবে উত্তর করলেন, তিনি তাঁর ভগবান ও প্রভু বুদ্ধদেবের নিজের মুখে যা শুনেছেন তাতেই সন্তুষ্ট, বিতর্কের মধ্যে তিনি যেতে চান না। এই বিরোধ এখানেই শেষ হয় না। দ্বিতীয় সঙ্গীতির সময়েও থেরবাদী এবং মহাসাংঘিকদের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। পরেও তার জের চলেছিল॥

এই বিরোধ এক দিক দিয়ে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের মহা-উপকার করেছে। কারণ এই বিরোধের সূত্রেই ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর দুশ বছরের মধ্যেই বুদ্ধদেবের প্রদত্ত উপদেশগুলি সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয়ে যায়। তৃতীয় সঙ্গীতির সময়েই দেখা যাচ্ছে বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি ধম্মকথিকা, পেতকিন, সুত্তন্তিকা, পঞ্চ নেকায়িকা প্রভৃতি নামে ভাগ করা হয়ে গিয়েছে, এবং পালিভাষাতে সেগুলি অনেকটা গ্রথিত করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা ভারতীয় লিপিতে হয়নি। পালিভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে অনেক পরে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে, সিংহলী বর্ণমালায়, সিংহলের রাজা বত্তগামনির উদ্যোগে। সেই সময় পর্যন্ত পালি ভাষা ভারতবর্ষে আচার্য পরম্পরায় 'মুখপাঠবসেন' শিক্ষা দেওয়া হয়ে আসছিল। তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির পূর্বেই যে পালিভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল তার একটি প্রমাণ আছে মহারাজ অশোকের ভাব্রা শিলালিপিতে। তিনি তাঁর শিলালিপিতে যে সাতটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থকে অবশ্য পাঠ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে পাঁচটিই পালিভাষায় গ্রথিত। এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করবার। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে মহারাজ অশোকের দান যদিও অসামান্য, অবিস্মরণীয় ও অপরিমেয়, তবুও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলির কোথাও অশোকের নাম পাওয়া যায় না। এর থেকেও সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, আশোকের রাজত্বের পূর্বেই দুটি বৌদ্ধসঙ্গীতিতেই বুদ্ধদেবের উপদেশ বলে কথিত ধর্মীয় অনুশাসনগুলি

মোটামুটি সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করা হয়ে গিয়েছিল, অধ্যায় ভাগও সমাপ্ত হয়েছিল এবং সেজন্যই অশোকের নাম তার মধ্যে কোথাও প্রবিষ্ট করাবার উপায় ছিল না॥

ত্রিপিটকের সমস্ত কিছু বুদ্ধদেবের উপদেশ এবং ধর্মীয় অনুশাসন হলেও তার ব্যাখ্যা বা অর্থকথা এমন কি অধ্যায়বিভাগও-যে সমস্ত ধর্মাচার্যরা সম্পূর্ণভাবে একমত হয়ে মেনে নেননি, সে বিষয়ে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন R. O. Franke,[১] তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মগুরুরা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি ছাত্রদের কাছে আলোচনা করতেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র তখনও পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ধরনের হয়নি। বিভিন্ন বিহারের ধর্মগুরুরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারতেন না, সেই জন্যেই ধর্মগুরুদের মধ্যে ব্যাখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মুখে মুখে ধর্মোপদেশগুলি আবৃত্তি করার প্রথা কঠোরভাবে মেনে চলায় পাঠের মধ্যে কোন বিকৃতি আসতে পারেনি, উপদেশগুলি অবিকৃতভাবে চলে আসতে পেরেছিল। এই পাঠগুলি প্রথম থেকেই যাতে অবিকৃত এবং বিশুদ্ধ থাকে ধর্মাচার্যদের সেদিকে গোড়া থেকেই দৃষ্টি ছিল। আধুনিক কালের টেক্স্‌ট্‌ বুকের কাজ করত এই পাঠগুলি। প্রথমে উপদেশগুলির গুরুত্ব ছিল ধর্মশাস্ত্র হিসাবে, পরে তার ওপর দ্বিতীয় গুরুত্ব আরোপিত হল সেগুলি ছাত্রদের বা ভবিষ্যৎ ভিক্খুদের অবশ্য পাঠ্য পরীক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে। এই পাঠ্য উপদেশগুলি কিন্তু বিষয় এবং ক্রম অনুসারে সাজানো ছিল না। যেমন যেমন উপদেশগুলি সংগৃহীত হয়েছিল, তেমন তেমন সেগুলি গ্রথিত হয়েছে, এই ব্যাপারে কোনখানে কোন রকম পরম্পরা এই ধর্মগুরুরা মেনে চলেন নি॥

কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও একটি প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত থাকছে। এই যে উপদেশগুলি—সেগুলি কি সমস্তই বুদ্ধদেবের দেওয়া? অন্য কোন ধর্মগুরু কি নিজের কোন উপদেশ বুদ্ধদেবের নামে চালিয়ে দেননি? আশ্চর্যের বিষয় কোন ধর্মগুরুই কিন্তু বুদ্ধদেবের উপদেশগুলির প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন বা সন্দেহ তোলেননি, তাঁরা বিবাদ বিতর্ক করেছেন সেই উপদেশগুলির ব্যাখ্যা, ভাষ্য, অথকথা নিয়ে। পালি সাহিত্যের আদিস্তরে বুদ্ধদেবের উপদেশ—কিন্তু সেগুলি কতখানি প্রামাণিক তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। সুতরাং বুদ্ধের নামে প্রচলিত উপদেশগুলিকেই পালি সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় দেখিনে॥

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রকে তিনটে পিটকে এবং নানা 'অঙ্গে' ভাগ করা ছাড়াও দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধ সম্প্রদায় আরও কতকগুলি নতুন ভাগ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সুত্তপিটকের

১। Journal of the Pali Text Society, 1908, Page 9. ff.

প্রথম চারটি নিকায়কে পাঁচটি নিকায়ে ভাগ করেন। উত্তরভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে দক্ষিণভারতের বৌদ্ধদের খুব একটা ভাল সম্পর্ক ছিল না। তার আরও প্রমাণ পাই 'অঙ্গ' বিভাগে। উত্তরভারতের বৌদ্ধরা সুত্তপিটককে ভাগ করেছেন বারোটি 'অঙ্গে', দক্ষিণভারতের বৌদ্ধরা নয়টি ভাগের বেশি রাজি হননি। এই নয়টি অঙ্গের নাম—সুত্ত, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্ভূতধম্ম এবং বেদল্ল। সুত্ত অর্থ বুদ্ধের শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথন: পদ্যে গদ্যে মিশ্রিত শ্লোকগুলি 'গেয়', 'ব্যাকরণে'র অন্তর্গত অভিধম্ম এবং অন্যান্য পাঠ; 'গাথা'র মধ্যে কবিতাগুলি সঙ্কলিত; 'উদান', 'ইতিবুত্তক' এবং 'জাতক' খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত; অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলি গ্রথিত 'অব্ভূতধম্মে'; আর 'বেদল্ল' জিনিসটি যে কি নিয়ে, তা জানা যাচ্ছে না। এ ছাড়াও আছে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত চুরাশী হাজার ধম্মখণ্ড বা বক্তৃতা ( ভাষ্য ? ) । এই বিপুল ধর্মসাহিত্যসম্ভার পরবর্তী কালে নানাদেশ থেকে নানা সংস্করণে নানা বর্ণমালায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্যাম, সিংহল, রেঙ্গুন, ভারতবর্ষ, জার্মানী প্রভৃতি দেশ পালিভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বেশী উৎসাহ দেখিয়েছেন। তাতে পালিভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদাই সূচিত হয়॥

সুত্তপিটকের পর 'বিনয়পিটক'। বিনয়পিটকের মধ্যে বৌদ্ধ শ্রমণদের আচরণ-বিধি সঙ্কলিত। বিনয়পিটকের মূল ভাগ তিনটি—সুত্তবিভংগ, খন্দক এবং পরিবার। সুত্তবিভংগের দুটি শাখা—পারাজিয় এবং পাচিত্তিয়। খন্দকেরও দুটি ভাগ—মহাবগ্গ এবং চুল্লবগ্গ। বৌদ্ধ শ্রমণ কোন অপরাধ করলে বা পাপ করলে তার স্বীকার করা বাধ্যতামূলক। এই কন্ফেশনের দিনকে বলা হত উপস্থ দিবস। উপস্থ দিবসে বৌদ্ধ শ্রমণদের কি করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে পাতিমোক্খে। পাতিমোক্খের ভাষ্য হচ্ছে সুত্তবিভংগ। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী আচরণীয় নানারকম ধম্ম, যেমন, সংঘাদিদেসা, পারাজিকা, পাচিত্তিয়া, পাতিদেসনিয়া অনিয়তা—ইত্যাদি যা কিছু বৌদ্ধ শ্রমণদের অনুসরণ করতে হত, তাই নিয়ে সুত্তবিভংগ। প্রতিটি পালনীয় উপদেশের আগে একটি কাহিনীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। খন্দকের মধ্যে আলোচিত হয়েছে শ্রমণজীবনে কি কি জিনিস কঠোর-ভাবে পালন করতে হবে। 'পরিবার' অংশ অনেক পরে সিংহল থেকে প্রচারিত হয়েছে। এর উনিশটি ধারা—সবকটিই উপদেশ। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৩ অব্দের আগেই বৈশালীর সঙ্গীতিতে ঐ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ সংগৃহীত হয়ে যায়। রাজগৃহের সঙ্গীতিতে বিনয়পিটকের পরিশিষ্টাংশ লিপিবদ্ধ হয়। মহাসাঙ্ঘিক এবং অন্যান্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিবাদ যখন তীব্র হয়ে উঠে তখনই অভিধম্মগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। তারপরে পাটলিপুত্রের

মহাসঙ্গীতিতে সঙ্কলিত হয় কথাবথ্ু। কথবথ্ুর রচয়িতা মোগ্গলিপুত্ত থের তিস্স। বোধ হয় তিনিই অশোকের শিক্ষক উপগুপ্ত, যিনি পাটলিপুত্রের সঙ্গীতিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন ॥

বিনয়ের চেয়ে সুত্তপিটক অনেক বড় আর এতে অল্পবিস্তর অনেক অবান্তর কথা দেখতে পাওয়া যায়। সুত্তপিটকের ভাগ পাঁচটি, তাকে বলা হয় 'পঞ্চ নিকায়'। এই পঞ্চ নিকায় সম্বন্ধে উল্লেখ পাই চুল্লবগ্গে—তাই মনে হয় এই পঞ্চনিকায় অতি প্রাচীন। এই পঞ্চনিকায়ের নাম দীগ্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায়, অঙ্গুত্তর-নিকায়, খুদ্দনিকায়। দীগ্ঘ, মজ্ঝিম্, সংযুত্ত এবং অঙ্গুত্তর—এই চারটি নিকায়ের অন্য নাম আগম। খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত ধম্মপদ,উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবথ্ু, থেরগাথা, পেতবথ্ু, জাতক, নিদ্দেস, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক ইত্যাদি। বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ প্রথম সঙ্গীতিতে নাকি এই পঞ্চনিকায় পাঠ করেছিলেন। খুদ্দনিকায়ের সমস্ত রচনা খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৩ অব্দের আগে রচিত হয়নি। অনেকগুলি জাতক অনেক পরের রচনা। আবার কোন কোন জাতক অতি প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির আগেও অন্য আকারে প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের সময় থেকে জাতকগুলি ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত হয়। প্রথম চারটি নিকায় বা আগম এবং খুদ্দনিকায় যে-সময়েই লেখা হোক না কেন, ঐ সমস্ত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলি যে খ্রীষ্ট জন্মের তিনশ বছর আগেই রচিত হয়েছিল, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই ॥

অনেকে মনে করেন, যেহেতু চুল্লবগ্গে অভিধম্মপিটকের উল্লেখ নেই, সেহেতু অভিধম্মপিটক প্রথম বৌদ্ধমহাসঙ্গীতির পরে লিখিত হয়েছে। উত্তরভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যে সমস্ত গ্রন্থ, তাতে অভিধম্মের একটা পর্যায় 'মাতৃকা'। পাশ্চাত্য বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতরা বলেন, বৈশালী ও পাটলিপুত্রের মহাসঙ্গীতির মাঝামাঝি সময়ে অভিধম্মপিটকের সৃষ্টি। 'স্থবিরবাদসম্ভূত মহীশাসক ও মহাসর্বাস্তিবাদীদের বিনয়গ্রন্থে মতভেদ বা সেরকম পাঠান্তর দেখা না গেলেও মহাসাংঘিকরা বিনয় ও পঞ্চ নিকায়ের নাম ও পাঠ বদলিয়ে দিয়েছিলেন।' বিনয়পিটকের মধ্যেকার আলোচনাগুলির নতুন নামকরণ হয় বিনয়বথ্ু, পাতিমোক্খমসুত্ত, বিনয়বিভঙ্গ, বিনয়খুদ্দক ও বিনয়োত্তর। উত্তরদেশের লোকোত্তরবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় মহাবথ্ুকেও বিনয়পিটকের মূল গ্রন্থ বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু সেটা কতখানি সত্য বা যুক্তিসঙ্গত তা বলা যাবেনা। আবার চীনদেশের প্রবীণ আচার্যদের মতে মহাসাংঘিকদের 'মহাবথ্ু' গ্রন্থেই ধম্মগুপ্তসম্প্রদায়ের অভিনিক্কমণসুত্ত এবং সর্বাস্তিবাদীদের 'ললিতবিস্তর' বিধৃত হয়েছে ॥

চীন পরিব্রাজক য়ুয়াং চুয়াং বলেন মহাসাংঘিকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি পাচ-

ভাগে বিভক্ত ছিল—সেই ভাগগুলির নাম সুত্ত, বিনয়, অভিধম্ম, সংযুক্ত ও ধারণী (বিদ্যাধর পিটক)। অবদানগুলিতে সুত্তপিটকের কথা আছে। চীনদেশে সুত্তপিটকের যে-সমস্ত অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে সেগুলি সবই আগম, দীগ্‌ঘ, মজ্‌ঝিম, একোত্তরিক ও সংযুক্তাগম নামে পরিচিত। তারানাথ যে খুদ্দাগমের কথা বলেছেন সেটা কি খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত, না খুদ্দনিকায়ের ভাষ্যবিশেষ? আবার এখানে এটাও লক্ষ্য করবার, চীনে প্রাপ্ত ও চীনাভাষায় অনুবাদিত সুত্তগুলিতে এবং তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুত্তগুলিতে প্রাচীন মূল সুত্তগুলির সম্পূর্ণ অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছেনা। মহাপরিনিব্বাণসুত্ত এবং অন্যান্য কতকগুলি প্রাচীন সুত্ত, বৈপুল্লসুত্ত আকারে বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত আছে—সেইগুলিই এখন মহাযান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পূজিত ॥

অভিধম্মের অন্তর্গত সাতটি গ্রন্থ। সেগুলির নাম—বুদ্ধশিষ্য কাত্যায়নকৃত 'ঞানপট্‌ঠান (জ্ঞানপ্রস্থান); সারিপুত্ত বিরচিত 'ধম্মকন্ধ'; পূর্ণ-কৃত 'ধাতুকীয়'; মৌদ্‌গল্যায়ণ রচিত 'পঞ্‌ঞপ্তিশাস্ত্র', দেবক্ষেম কথিত 'বিজ্ঞানকায়', সারিপুত্ত কৃত 'সংগীতিপয্‌যায়' এবং বসুমিত্রের লেখা 'পকরণপাদ'। পালিতে এগুলি সব লেখা নয়, অনেকগুলি লেখা সংস্কৃতে। পরে সেগুলি পালিতে লিখিত হয় বা রূপান্তরিত হয়। চীনদেশে প্রাপ্ত অনুবাদে এই সাতখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। পালিতে লেখা বিভঙ্গ, কথাবত্থু এবং তিনখানি যমক গ্রন্থ বোধ হয় বিজ্ঞানকায়, সঙ্গীতি পর্যায় এবং প্রকরণপাদের উপসংহার। তবে বসুবন্ধুর লেখা 'অভিধম্মকোষ' ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ নয়, যদিও অভিধম্ম কথাটি সেখানে আছে ॥

বিনয়, সুত্ত এবং অভিধম্ম—এই তিনটি পিটক নিয়ে যে তিপিটক তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা গেল। তিপিটকের গুরুত্ব মহাযানসম্প্রদায়ের আরেকখানি ধর্মগ্রন্থ 'বৈপুল্লসুত্তে'ও দেখতে পাই। বৈপুল্লসুত্তের ভাষায় সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের মিশ্রণ আছে, কিন্তু এই মিশ্রণ বোধহয় পরে এসেছে। প্রাকৃত অপ্রচলিত হলে এবং সংস্কৃতের সুপ্রসার হলে পরে বৈপুল্লসুত্তের প্রাকৃত অংশগুলি সংস্কৃতে অনুবাদিত হয়। পণ্ডিতদের অনুমান মহারাজ কনিষ্কের উদ্যোগে মহাবোধিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে বা সামান্য পরে অনেকগুলি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদিত হয়। ললিতবিস্তরের বাক্যের Syntax পালিভাষার বাক্যের মত। মহাযানী বৌদ্ধরা নিজেদের অভিজাত ধর্মাচরক বলে মনে করলেও এবং classical সংস্কৃতের দিকে তাঁদের ঝোঁক থাকলেও হীনযানী সম্প্রদায়ের বা সব্বাস্তিবাদীদের সুলিখিত গ্রন্থকে নিজেদের বলে গ্রহণ করতে বাধেনি। চীনদেশের পণ্ডিতরা এই রকম মত প্রকাশ করেছেন। ১৪০ থেকে ১৭০

খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ 'সুখাবতীব্যূহ' চীনাভাষায় অনুবাদিত হয়। মহাযানমতের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনের জন্ম যদি কণিষ্কের রাজত্বকালে হয়ে থাকে তবে 'সুখাবতীব্যূহ' মহাযানী বৌদ্ধদের আদিমতম গ্রন্থ। মহাসাঙ্ঘিক এবং মহাযানীদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল বলে চীনাপরিব্রাজকরা উল্লেখ করেছেন। এই দুই সম্প্রদায়ই ধারণীশাস্ত্রের অনুগামী ছিলেন। ধারণীশাস্ত্র থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রের বিস্তৃতি এবং পরে বৌদ্ধতন্ত্রের বিকৃতি। তবে সে অনেক পরের ব্যাপার ॥

ধর্মশাস্ত্রীয় যুগকে আমরা কণিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মেনে নিতে পারি। অবশ্য ভগবান বুদ্ধের উপদেশের সঙ্কলন অনেক আগেই তিপিটকে সঙ্কলিত। তবে তার পরেও বৌদ্ধশ্রমণদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত এবং জ্ঞানী—তাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি ধর্মশাস্ত্রেরই অন্তর্গত। এই হিসাবেই এই স্তরটিকে কণিষ্ক পর্যন্ত প্রসারিত করা হচ্ছে। এর পরেও ঐ সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের পরিশিষ্ট হিসাবে আরও কতকগুলি প্রবাদমূলক, ইতিহাসআখ্যায়িকামূলক, ধর্মকথামূলক নানাগ্রন্থ পালিভাষায় লেখা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনাগতবংস, কম্মবংস, দীপবংস, সদ্ধম্মসংগহ, মহাবোধিবংস, পজ্জমধু, থেরীগাথা, কথাবত্থু, দিব্যাবদান, ভদ্দকপ্পাবদান, অবদানসতক, জাতকমালা, বোধিচর্যাবতার, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ইত্যাদি ॥

পালিভাষার ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং রূপান্তর হয়েছে বহুদিন ধরে—খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আঠার শত বৎসরের বিস্তৃতিতে। এই সুদীর্ঘ সময়ে মোটামুটি পাঁচটি করে যদি পালিভাষার ক্রমবিকাশকে ভাগ করি তবে তার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যকেও এই ভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে ॥

প্রথম স্তরটি বুদ্ধদেবের জীবৎকালে। সাহিত্য রচনা মূলতঃ কবিতায়—তাই একে বলা যেতে পারে গাথাস্তর। এই কবিতা বা গাথাগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় সমৃদ্ধ বাগ্ধারা (idiom), বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী এবং প্রয়োগের প্রাচীনত্ব—যা বৈদিক রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সুত্তনিপাত, থের-থেরী গাথা প্রভৃতি-এই সময়ের বিশিষ্ট রচনা ॥ দ্বিতীয় স্তরের উল্লেখযোগ্য রচনা উদান, ইতিবুত্তক, কিছু কথোপকথন, কিছু কিছু সুত্ত। এদের রচনাকাল প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির সময়ে। এই স্তরের ভাষা সহজ, সরল এবং আগের স্তরের তুলনায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংস্কৃত। তবে এই স্তরে প্রকাশভঙ্গীর গতানুগতিকতা বজায় ছিল ॥

তৃতীয় স্তরের সুরু দ্বিতীয় বৌদ্ধমহাসঙ্গীতির পর থেকে। এই স্তরে গদ্য এবং কবিতা দুটিরই সমৃদ্ধ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীতে ব্যঞ্জনা, সৌকর্য ও মাধুর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই স্তরে ধর্মনির্দেশগুলি কবিতায় রচিত হয়েছে,

সেগুলি প্রায়ই বর্ণনামূলক বা narrative। বুদ্ধবংস, চর্যাপিটক, অবদান—এই স্তরের রচনা।

চতুর্থ স্তরের সুরু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে। ঝোঁক বেশী গদ্য রচনার দিকে, ভাষায় অলঙ্কারের বাহুল্য এবং সংস্কৃতের প্রভাব অন্যতম বিশেষত্ব। প্রধান সাহিত্য-কীর্তি 'মিলিন্দ পঞ্হো'॥

পঞ্চম স্তরটির আরম্ভ বোধহয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। ভাষ্য, অথকথা, ঘটনাপঞ্জীর সংকলন, সারগ্রন্থ এই স্তরের সাহিত্যকীর্তি। ভাষ্যগুলির কিছু প্রকাশ দক্ষিণভারতের কাঞ্চীভরম থেকে, কিছু সিংহল ও রেঙ্গুন থেকে। সরল সহজ রচনাভঙ্গী এই স্তরের সাহিত্য রচনায় সুস্পষ্ট॥

পালিভাষার রচিত সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ অসংখ্য। অনেক এখন পাওয়াই যায় না। তিব্বতে, নেপালে, চীনে, শ্যামে, ব্রহ্মে, সিংহলে নানা জায়গায় এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশ রক্ষিত আছে। জর্মন পণ্ডিতদের চেষ্টায় কিছু কিছুর ইংরেজি অনুবাদও হয়েছে। এই সমস্ত অনুবাদগুলি অনুসরণ করলেও দেখা যাবে, পালিতে রচিত সাহিত্যে বাস্তবধর্মিতা, চমৎকার শব্দযোজনা, প্রকাশভঙ্গীর নিরলঙ্কার আভিজাত্য—এই তিন মহৎ গুণের সম্মিলন হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষাবর্গের অনেকগুলিকে, বিশেষ করে বাংলাকে, নানাদিক দিয়ে পালিভাষা ও সাহিত্য প্রভাবান্বিত করেছে॥*

[ * বিভিন্ন স্তরের পালিভাষা ও সাহিত্যকীর্তির নিদর্শন পরিশিষ্ট অংশে দ্রষ্টব্য ]

## ॥ জাতকের প্রসঙ্গে ॥

পালিভাষায় রচিত সাহিত্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে জাতকগুলির একটি বিশেষ স্থান আছে। ভগবান বুদ্ধদেবের অতীত জন্মবৃত্তান্তের কাহিনীগুলিই জাতকগুলির মধ্যে বিবৃত। পূর্বেই বলা হয়েছে, বৌদ্ধধর্মে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন, কেবল এক জন্মের 'সুকৃতির ফলে' কেউ গৌতম বুদ্ধের মতন 'অপারবিভূতিসম্পন্ন সম্যক-সম্বুদ্ধ' হতে পারেন না। যিনি বুদ্ধ হবেন, তাঁকে বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ 'বুদ্ধাঙ্কুরবেশে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহপূর্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করিতে হয়।' শেষে তিনি পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ করে 'অভিসম্বুদ্ধ' হন। অভিসম্বুদ্ধ হলে তাঁর 'পূর্বনিবাসজ্ঞান' জন্মায় অর্থাৎ তিনি নিজের এবং পরের অতীত জন্মবৃত্তান্তগুলি যেন নিজের নখদর্পণে দেখতে পান। এই অলৌকিক ক্ষমতা পূর্বনিবাসজ্ঞানী বুদ্ধদেবেরও জন্মেছিল। তিনি শিষ্যদের অধিকার ভেদ বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধর্ম-উপদেশ দিতেন এবং অনেক সময় 'ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন' উপদেশমূলক অতীত কথা শুনিয়ে তাঁদেরকে নির্বাণের পথনির্দেশ করতেন। এই কাহিনীগুলিই বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের নব অঙ্গের এক অঙ্গ এবং সুত্তপিটকের খুদ্দক নিকায়ের একটি শাখা হিসাবে পরিগণিত ॥

জাতকগুলির সংখ্যা যে ঠিক কত, তা নিয়ে মতভেদ আছে। অধ্যাপক কাউসবোল পালিভাষায় লেখা 'জাতকত্থবণ্ণনা' নামে যে-সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তাতে জাতকের সংখ্যা মোট ৫৪৭টি। জাতকত্থবণ্ণনাতে যে-জাতকগুলি সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায়, একই জাতক আলাদা আলাদা নামে, কোথাও বা একই নামে কথিত হয়েছে। সুতরাং বোঝা যায়, প্রকৃত জাতকের সংখ্যা, তার মানে যেসব গল্পে বোধিসত্ত্বের এক এক জন্মের কথা আছে, সেগুলি হিসাব করলে জাতকের সংখ্যা নিশ্চয় ৫৪৭টির কম হবে। সেজন্যেই ঈশানচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, জাতকত্থবণ্ণনার জাতকগুলিকে সমগ্র জাতক বলা চলে না। কারণ সেখানে 'মহাগোবিন্দজাতক' ইত্যাদি "দু-একটি জাতকের নাম আছে, কিন্তু তাহাদের আখ্যায়িকাগুলি ইহার মধ্যে স্থান পায় নাই। সুত্তপিটকের এবং শ্যাম ও তিব্বতে কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতক প্রচলিত আছে।" তিনি আরও বলেছেন, "ফলতঃ জাতক নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। যিনি যখন সুবিধা

পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন কোন আখ্যানকে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া এবং বোধিসত্ত্বকে তাঁহার নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতকের নামে চালাইয়া দিয়াছেন ॥”

পালিভাষার ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অধ্যাপক অটো ফ্রাঙ্কের মতে পালি এক সময় সমগ্র উত্তরভারত এবং সিংহলে জনসাধারণের সাধারণ ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল। তবে প্রথম বৌদ্ধমহাসঙ্গীতির আগে পালি ভাষায় যে কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের অসংখ্য শিষ্য-প্রশিষ্যের যত্নে পালিভাষায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শনের নানা গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, উত্তরে কপিলাবাস্তু ও শ্রাবস্তী থেকে দক্ষিণে রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া, পশ্চিমে সাঙ্কাশ্যা থেকে পূর্বে অঙ্গ ও বৈশালী—এই বিশাল ভূখণ্ডে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তখন তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল আপামর সাধারণকে মুক্তির পথ দেখানো। সাধারণ লোকের মধ্যে যখন তিনি ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত ছিলেন তখন একথা বিশ্বাস করবার সঙ্গত কারণ আছে যে, তিনি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষাতেই নিজের মতবাদ প্রচার করেছিলেন। আর তাঁর শিষ্যরাও যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে তাঁর সেই উপদেশগুলি গ্রথিত করে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। অতএব পালিভাষা যে উল্লিখিত সমস্ত অঞ্চলে জনসাধারণের প্রধান ভাষা ছিল একথা মনে করবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। বৈষ্ণবদের চেষ্টায় এবং যত্নে হিন্দি এবং বাংলা ভাষার যে উন্নতি হয়েছে, বৌদ্ধদের চেষ্টায় পালিভাষারও সেইরকম উন্নতি হয়েছিল। সেজন্যেই তিপিটক, বিসুদ্ধিমগ্‌গ, দীপবংস, মহাবংস, মিলিন্দপঞ্‌হো প্রভৃতি মহামুল্যবান গ্রন্থগুলি রচিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল ॥

দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধদের মতে, খ্রীষ্টের জন্মের ২৪১ বছর আগে মৌর্যসম্রাট অশোকের পুত্র থের মহেন্দ্র ( মতান্তরে অশোকের জামাতা ; আবার উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থে অশোকের ভাই ) যখন ধর্মপ্রচারের জন্য সিংহলে যান তখন তিনি পালিভাষায় লেখা তৎকালীন সমগ্র বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র এবং তাদের অর্থকথা সঙ্গে নিয়ে যান এবং সিংহলী ভাষায় তার অনুবাদ করান। শেষে কি কারণে জানা যায়না, সেখানে মূল পালি অর্থকথাগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ সিংহলে গিয়ে মূল অর্থকথার সিংহলী অনুবাদ থেকে পালিভাষায় পুনরনুবাদ করেন। সেই পালি মূল থেকে আবার যখন পরে সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করা হয় তখন দেখা যায়, আগের সিংহলী অনুবাদ এবং পরের অর্থাৎ প্রায় ছশ’ বছর পরে কৃত নতুন অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এতে

বোঝা যায়, বুদ্ধদেবের উপদেশগুলিকে যথাযথ এবং অবিকৃত রাখতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কী পরিমাণ নিষ্ঠা ছিল॥

অনেক পণ্ডিতের মত—জাতকগুলির রচয়িতা বুদ্ধঘোষ, কিন্তু এ সম্পর্কেও স্থিরভাবে কিছু বলা যাবে না, কারণ জাতকগুলি প্রসঙ্গে রেবত, সিংহলী পণ্ডিত সঙ্ঘপালি, অর্থদর্শী, বুদ্ধমিত্র, বুদ্ধঘোষ ইত্যাদি বহু নাম পাওয়া যাচ্ছে। তবে এটুকু বলা যেতে পারে, বুদ্ধঘোষের সময়ের আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগেই জাতকগুলির প্রচার ও প্রসার হয়েছিল, সুতরাং জাতকরচয়িতা হিসাবে বুদ্ধঘোষের নামের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া বোধহয় অবান্তর ও যুক্তিহীন। তবে শেষ পর্যন্ত সিংহলেই পালিভাষা বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং সেই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বুদ্ধঘোষের দান কিছু কম নয়; হয়ত সেই কারণেই জাতকত্থবণ্ণনার রচয়িতা হিসাবে বুদ্ধঘোষের প্রসিদ্ধি। আমাদের বাংলা দেশের বহু সাধারণ লোকের মধ্যে যেমন বিশ্বাস, কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস মহাভারত ও রামায়ণের মূলরচয়িতা॥

প্রত্যেকটি জাতকের তিনটি করে ভাগ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম অংশকে বলে 'প্রত্যুৎপন্নবস্তু'—বুদ্ধদের কোন্ প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বজন্মের কথা বলেছেন; দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে মূলকাহিনী বা প্রকৃত জাতক। একে বলে 'অতীতবস্তু'। আর সব শেষ অংশটি 'সমাবধান' বা অতীত জীবনের কাহিনীর সঙ্গে বর্তমানে যাদের কাছে জাতক বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে অভেদ দেখানো। প্রথম ভাগ বা পূর্বজন্মের reference থেকে বোঝা যায়, বৌদ্ধরা জন্মান্তরবাদের সমর্থক। এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে বৌদ্ধরা বলেন যে, তাঁদের মতে যদিও জীবেরা রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞানের দ্বারা সংগঠিত পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি এবং মৃত্যু হলেই সে স্কন্ধগুলি বিনষ্ট হয়, তবুও মানুষের কর্ম থাকে, সেই কর্মই নতুন স্কন্ধ উৎপন্ন করে, অন্যলোকে নতুন জীবন সৃষ্টি করে। তবে কর্মও চিরস্থায়ী নয়—নানা 'সংসার' বা জন্মলাভ করার পর, অনেক সাধনা ও ধ্যানধারণার পর জীবের এমন একটা অবস্থা আসে—যেটাকে পূর্ণতা বলা যেতে পারে—যখন তার আর জন্ম হয় না;—সে তখন নির্বাণ লাভ করে। এই নির্বাণই নিত্য। বহু জন্মের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে চোলাই হয়ে হয়ে জীব নির্বাণ পায়। অবশ্য তার জীবনে সুকৃতি যত বেশি হবে, জন্মান্তরলাভও তত কমে আসবে। এই কর্ম-ভাবটির সঙ্গে হিন্দু দার্শনিকদের 'আত্মা'র মিল আছে। বুদ্ধদেবকে অবতার হিসাবে হিন্দুদের গ্রহণ করা এবং বৌদ্ধদর্শনের কিছু কিছু নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করার সুযোগ এইভাবেই এসেছে॥

জাতকের দ্বিতীয় অংশটি বা 'অতীতবস্তু' গদ্যে-পদ্যে রচিত, পদ্য অংশটিই 'গাথা'।

পদ্য অংশগুলিই প্রমাণ করে জাতকের প্রাচীনত্ব, কারণ প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শনগুলি গদ্যাকারেই নিবদ্ধ। শুধু তাই নয়, গাথা অংশের ভাষাও খুব প্রাচীন, কোন কোন অংশে বোঝাই মুশকিল। এতে অনুমান করা যেতে পারে, জাতকের আখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হবার অনেক আগেই তাদের মূল অংশ সচরাচর গাথা-আকারেই লোকের মুখে মুখে চলে আসছিল। গাথা শুনে লোকে হয় সমস্ত গল্পটি, কিংবা তার সার উপদেশটি বুঝে নিত। কোন কোন জাতকের গাথায় এবং তৎসংলগ্ন গদ্যাংশে ভাষার ও ভাবের কোন প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায় না। গদ্যাংশতে গাথার কথাগুলিই যেন আবার বলা হয়েছে মনে হয়। এর থেকেও প্রমাণ হয়, গাথাগুলি গদ্যে লিপিবদ্ধ আখ্যানগুলির অনেক আগের রচনা। আখ্যায়িকাকার গাথাগুলি সন্নিবেশ করার সময় এগুলির দ্বারা যে পুনরুক্তি দোষ হতে পারে, সেটা খেয়াল করেন নি। আরও জানা যায়, জাতকগুলি একজনের রচনা নয়। ভাষাগত এবং কবিত্বগত পার্থক্যের দ্বারা বুঝতে পারা যায়—জাতকগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। কোন কোন গল্পে বৌদ্ধভাব নিতান্ত কৃত্রিম বলেও মনে হয়; তাতে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা ইত্যাদি রূপে সমস্ত ঘটনাটি দেখছেন মাত্র, নিজে কোন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন॥

জাতক যে প্রাচীন তা বোঝা গেলেও, তা কতদিনের প্রাচীন, কত পুরোনো?

জাতকের মূল বস্তুই হচ্ছে কাহিনী। তারপর ধর্মোপদেশ। পৃথিবীর যাঁরা মহত্তম ধর্মগুরু তাঁরা তাদের অসাধারণ সত্যদৃষ্টির ফলে জানতেন, গল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ সহজাত। মানব সভ্যতার পরিণত স্তরে, অর্থাৎ মানুষ যখন আর অরণ্যচারী পশু নয়, মৃগয়াজীবী ও অরণ্যবাসী, তখন থেকেই বনের নানা পশুদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করে এদের নিয়েই মানবধর্মের প্রথম পাঠ সাধুতা, প্রভুত্ব-পরায়ণতা, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, বন্ধুবাৎসল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সরস গল্প রচনা করার দিকে প্রবণতা প্রাচীন মানবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুলির চরিত্র বদলও লক্ষ্য করা গেল—বাঘ সিংহ শেয়াল হরিণ মহিষ প্রভৃতি প্রকৃত প্রাণী; ভূত প্রেত প্রভৃতি কল্পিত প্রাণী, পেট জিভ হাত পা মাথা প্রভৃতি শরীরের অংশ, বাসনপত্র কাঠ কাপড় ইত্যাদি নির্জীব বস্তু গল্পের মুখ্য চরিত্রেই শুধু নয়, সেই চরিত্রগুলি এক একটা বিশেষ প্রবৃত্তি মনোভাব বা আচরণের প্রতীকে রূপান্তরিত হল। শুধু তাই নয়, পশুদেরকে প্রধান চরিত্র করে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতির বিভিন্ন সমস্যাকে

জনসাধারণের সামনে আনা হল, উপদেষ্টা বা গল্পরচয়িতা সেগুলির সমাধান করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পৃথিবীর সব দেশেই এই ধরনের অসংখ্য কাহিনী আছে। ঘোড়া এবং মানুষের গল্প, একপর্ণজাতক, মিত্রলাভ প্রভৃতি গল্প রাজনীতিমূলক; পিঙ্গলার গল্প অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায় দর্শন তর্কশাস্ত্রমূলক; উদর এবং হাত পা মাথার ঝগড়া, কাঁসার বাসন আর মাটির বাসন, ভিক্ষার ঝুলি আর টাকার থলি,—এই সব কত গল্প কতরকমভাবে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত। গল্পগুলির মধ্যে দেশ ও রীতিগত সামান্য সামান্য পার্থক্য আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য এক—জনসাধারণকে মানবজীবন, সমাজ ও আচরণবিধি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া॥

জাতকও এই উদ্দেশ্যে রচিত। এবং জাতকের চরিত্র, পরিবেশ, কাহিনীর উপাদান সমস্তই tale পর্যায়ের গল্প—যে tale প্রাচীনযুগে মানুষ দিনের শেষে বন থেকে শিকার সেরে রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে গোষ্ঠীর প্রবীণতম সদস্যের মুখ থেকে শুনত। তবে জাতকের গল্পগুলি যে-আকারে বৌদ্ধরা সঙ্কলন করেছেন, সেগুলি অত প্রাচীন নিশ্চয়ই নয়। তবে অনেকগুলি গল্প যে বুদ্ধদেবেরও জন্মের বহু পূর্বে সৃষ্ট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উদরের ঝগড়ার গল্পের উল্লেখ পাই ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ে, প্রথম খণ্ডে, ৬ষ্ঠ থেকে ১৫শ মন্ত্রে। এই ধরনের গল্প খ্রীষ্ট-জন্মের ১২।১৩শ বছর আগে মিশরে দেখতে পাচ্ছি, পারস্য দেশেও এই রকম গল্প প্রচলিত ছিল ভারতের গল্পের অনেক আগে। মহাভারতের শান্তি পর্বে 'সাগর ও নদী সংবাদের' সঙ্গে রসাল ও স্বর্ণলতিকার গল্পের একাত্মতা আছে। বুদ্ধদেব এই গল্পগুলি এবং আরো বহু গ্রাম্যগাথা ও কাহিনীকে নিজের ধর্মোপদেশের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর শিষ্যরাও এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরাও গাথাগুলিকে বর্ণনাত্মক গদ্যের সঙ্গে ইচ্ছামত সাজিয়ে নিয়ে মনোহর গল্পের সৃষ্টি করতেন। বস্তুত, গল্পের সাহায্য না নিয়ে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করে অভিধর্ম ব্যাখ্যা করতে গেলে তাঁরা কখনই এত সাফল্য অর্জন করতে পারতেন না। একথা যীশুখ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আরো আধুনিক কালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও উপদেশ দেবার সময়ে গল্পের সাহায্য নেবার ব্যাপারে একই রকম পদ্ধতি ব্যবহার করতেন॥

তবে জাতকের অধিকাংশ গল্পে যে ব্রহ্মদত্ত রাজার নাম পাচ্ছি—তিনি কে?

অনেকের অনুমান, বুদ্ধদেবের জন্মের প্রায় একশ বছর আগে বারাণসীতে সত্যি সত্যিই ঐ নামে এক রাজা ছিলেন। তবে একথা বলাই বোধ হয় নিরাপদ,—আরব্য-উপন্যাসে যেমন সব সময়েই গল্প আরম্ভ হয়েছে হারুণ-উর-রসীদের নাম দিয়ে, পাশ্চাত্য

গল্পকারেরা যেমন once upon a time বলে মামুলীভাবে গল্প সুরু করেছেন, জাতককারও তেমনি ব্রহ্মদত্তের নাম দিয়ে গল্প আরম্ভ করেছেন। সুত্তপিটকের দীগ্‌ঘনিকায়, মজ্‌ঝিমনিকায় ও সংযুত্তনিকায়ের সমস্ত জাতকগুলিই বুদ্ধদেবের জন্মের একশ বছর পরেই সঙ্কলিত হয়েছিল। অনেকগুলি জাতক বুদ্ধদেবের নিজের এবং কিছু তাঁর শিষ্যদের লেখা। সেই হিসাবে বিচার করলে ঠিক যে-আকারে জাতকগুলি আমরা পালিভাষায় দেখতে পাই সেগুলির রচনাকাল বুদ্ধদেবের জন্মের ৫০ বৎসর থেকে ১০০ বছরের মধ্যে বললেই সম্ভবত জাতকের রচনাকাল সম্বন্ধে সুবিচার করা হয়॥

পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের গল্পগুলির তুলনায় জাতকের গল্পগুলি অনেক বেশি বাস্তব, অনেক বেশি objective এবং বাস্তব জীবনের কথা সেখানে বেশি বলা হয়েছে। হিন্দুধর্ম জীবন সম্বন্ধে উদাসীন এবং নির্লিপ্ত; ঋষির তপোবন এবং সেই শান্তরসাস্পদ আশ্রমের গণ্ডীর বাইরে সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা লাভ হিংসা মাৎসর্য কুটিলতা ঈর্ষার আলোছায়ায় স্পন্দিত যে জীবন, বিবিধ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে যে জীবন উদ্বেল—তার সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে উদাসীন ও নিরাসক্ত মুনি ঋষিদের এবং তাঁর আশ্রমবাসী শিষ্যদের কোন গভীর সম্পর্ক ছিল না। আর হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের তুলনায় অনেক প্রাচীনও। কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণরা লোকালয়ের বাইরে বিহার ও মঠে জীবনযাপন করলেও এবং সংসার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য পোষণ করলেও, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রতিদিনই গ্রামে বা নগরে ভিক্ষা করতে যেতেন, গৃহীদের সুখ দুঃখের পরিচয় পেতেন, এবং এইভাবে গৃহস্থজীবনের ছোট বড় নানা সমস্যার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল। সাধারণ জীবনের সঙ্গে এই নৈকট্যবোধই তাঁদের গল্পে অলক্ষ্যে সেই সময়কার সামাজিক রীতিনীতি, উচ্চ মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর সামাজিক মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি, তাদের জীবিকা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও নিজেদের নানা দোষ, ভণ্ডামি, ধর্মাচরণে শৈথিল্য এসবের কথাও তাঁরা বলতে ভোলেননি। তাঁদের নিজেদের ঝগড়া, পরস্পরের নামে কলঙ্কআরোপ, পরস্পরকে ঠকানো, সঞ্চয়প্রবৃত্তি, লোভ, নির্বুদ্ধিতা—সব কিছুর এমন জ্বলন্ত বাস্তব বর্ণনা জাতকে আছে যা অন্য কোন সমসাময়িক সাহিত্যে পাই না। আশ্রমজীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের জাতকে বিষয় নির্বাচনে, বর্ণনার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে চিরপ্রচলিত কাহিনীগত উপস্থাপন রীতিকে অতিক্রম করার প্রবল চেষ্টায়, বৌদ্ধ জাতকগুলি একক ও অনন্য॥

জাতকের গল্পগুলির বিশেষত্ব অন্যদিকেও সুস্পষ্ট। পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ বা

ঈশপের গল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপদেশ দেওয়াটাই প্রধান, জাতকে ঠিক তা নয়। জাতকে গল্প বলাটাই প্রধান, ধর্মোপদেশ আপনিই তার মধ্যে এসে গিয়েছে, কোথাও জোর করে আরোপিত নয়। বৌদ্ধজাতকে অনেক অতিপ্রাকৃত ঘটনা আছে সত্যি—সেই সময়ে এই অতিপ্রাকৃত বা অতিরঞ্জনের ঝোঁক বর্জন করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত গল্পে বা ঈশপের গল্পে—কোথাও পশুচরিত্রের বাস্তবতা নেই, সেইজন্য অতিপ্রাকৃত সেখানে স্বাভাবিক নয়। বৌদ্ধজাতকে পশুচরিত্রবিশিষ্ট গল্পে পশুদের মধ্যে স্বাভাবিক এমন দু'একটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে যার দ্বারাই গল্পগুলির নিজস্ব বিশেষত্ব আসতে পেরেছে। টিট্টিভ পাখী সমুদ্রের ঢেউ থেকে ডিম রক্ষা করার সম্বন্ধে যে-সমস্ত উচ্চশ্রেণীর নীতিকথা, রাজনৈতিক বুদ্ধির কথা বলছে তা মূল্যবান, কিন্তু টিট্টিভের পাখীসুলভ বিশেষত্ব সেখানে কোথায়? বেশ একজন পণ্ডিত রাজনীতিবিদ্ টিট্টিভ সেজে সেখানে যেন উপদেশ দিচ্ছেন। বৌদ্ধজাতকে এই দোষ নেই বলে সেগুলি বেশি বাস্তব অতএব বেশি উপভোগ্য ॥

সাধারণ মানুষ—সূত্রধর, শুঁড়ী, নাপিত, চর্মকার, শ্রেষ্ঠী, বণিক, তক্ষণশিল্পী, স্বর্ণকার, পাচক, পশুপালক ইত্যাদি নানা জীবিকার মানুষ ত বটেই—স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও সেখানে মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। বুদ্ধদেবকে কোথাও সেখানে অতি-রঞ্জনের প্রলেপে বিশেষত্ব দেওয়া হয়নি। তিনি কখনও রাজকুলজাত, কখনও বা অতি নীচকুলোদ্ভব, এমন কি একটি জাতকে তিনি চোরের সর্দার! ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা মাত্রই যে অস্বাভাবিক আদর্শচরিত্র অতিপ্রাকৃত একটি সত্তা—সংস্কৃত সাহিত্যের এই আদর্শ বৌদ্ধজাতক রচয়িতারা মেনে নেননি। তবুও সব অবস্থাতেই বুদ্ধদেবের অলৌকিক মাহাত্ম্য দেখাতেও তাঁরা ভোলেননি। সেই দেবচরিত্র বর্ণনাতেও তাঁরা কোথাও বাস্তব গণ্ডী অতিক্রম করেননি, সংযম হারাননি, পরিমিতিবোধকে বিস্মৃত হননি। সহজ সরল নিরলঙ্কার ভাষায় জাতকের কাহিনীতে যে-প্রসাদগুণ প্রকাশিত, সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনীতে তা নেই বললেও চলে ॥

বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের উপদেশই শুধু নয়, জাতকের অনেক কাহিনীতে বিশেষ করে প্রত্যুৎপন্নবস্তু অংশে, সেই সময়কার রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাঠক পেতে পারবেন। কাহিনী অবশ্যই মানুষের কল্পনার পরিণাম, কিন্তু কাহিনীর পিছনে একটা বাস্তব না থাকলে কাহিনীকারের কল্পনা মুক্তি পায় না। একথা অবশ্য সত্য, কথাকার তাঁর বর্ণনার গুণে এবং কল্পনার ব্যাপ্তিতে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন, কিন্তু কোন সময়েই তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাইরে যেতে পারেন না। নানাপ্রসঙ্গে তাঁর লেখার মধ্যে সমসাময়িক সমাজ ও মানুষ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা

ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবেই। জাতক যে-সময়ে রচিত তখন পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি, গড়ে উঠবার কথাও নয়, কারণ তখন পাশ্চাত্য দেশগুলি সবেমাত্র সভ্যতার আলোক দেখতে পেয়েছে। সেজন্যেই জাতক বা রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে আমরা যে-সমাজের চিত্র দেখতে পাই, তা খাঁটি ভারতীয় সমাজের চিত্র ॥

জাতক পাঠে আমরা দেখতে পাই, তখনকার দিনের সমাজেও ধনী ও দরিদ্রের বিরাট পার্থক্য ছিল। ধনীরা সাততলা প্রাসাদে বাস করতেন, বণিকেরা সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে দ্বীপে দ্বীপান্তরে বাণিজ্য করতে যেতেন। জলপথে pilot বা জল-নিয়ামক এবং স্থলপথে guide বা স্থলনিয়ামক পথনির্দেশ করে দিতেন। মহানগরীর লোকজন চাঁদা তুলে অনাথাশ্রম চালাতেন, গরীব ছাত্ররা ধর্মান্তে বাসিক হয়ে গুরুগৃহে পাঠ গ্রহণ করত। পাঠশালার ছেলেরা কাঠের তক্তায় লিখত, অঙ্ক কষত। তখন সমগ্র ভারতে তক্ষশিলাই ছিল বিদ্যাচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ; কাশী, মগধ, বৈশালী থেকে ছাত্ররা সেখানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যেত। তক্ষশিলায় শল্য চিকিৎসার উন্নত শিক্ষাপ্রণালী জানবার জন্যে ছাত্ররা সেখানে যেত এবং অনেকে দক্ষ শল্যচিকিৎসক হত। তখনকার ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথা ছিল, ধনীরা স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে দাস কিনতে পারতেন। তখন রাজাই ছিলেন দেশের প্রাচীন শাসনকর্তা, তবে জনপদগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। রাজা অত্যাচারী হলে প্রজারা থেকে থেকে বিদ্রোহ করত এবং এমনও হয়েছে, প্রজারা রাজাকে হত্যা করে অন্য কোন রাজাকে রাজার প্রাপ্য রাজস্ব দিয়েছে। রাজার বিরুদ্ধে রাজপুত্রদের বিদ্রোহ মুঘলযুগের ইতিহাসকেই কলঙ্কিত করেনি, জাতকের সময়েই এমন ঘটনা বহু ঘটেছে। স্বভাবতই রাজাকে নিজের পুত্র, ভাই, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন—সকলের সম্বন্ধেই সাবধান থাকতে হত ॥

পারিবারিক জীবনে তখন কন্যারা যৌবনকালে পাত্রস্থ হতেন ; বাল্যবিবাহ তখনকার দিনে প্রচলিত ছিলনা। ক্ষত্রিয়দের পিসতুতো বোনকে বিয়ে করতে কোন বাধা ছিলনা। মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচলন ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, তখনকার দিনে সম্ভ্রান্তবংশের বিধবারা পুনর্বার স্বামী-গ্রহণ করতে পারতেন ; এমন কি স্বামীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তাঁদের স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ সমাজে বিধিসম্মত ছিল। এখনকার মত তখনও স্বপ্নবিচার হ'ত, দুঃস্বপ্ন দেখলে লোকে ভূতবলি পিশাচবলি শান্তিস্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে অভিশাপমুক্ত হবার চেষ্টা করত। লোকে টাকা দিয়ে অন্যের পুণ্যাংশ কিনতে পারত। যাঁরা প্রব্রজ্যা নিতেন তাঁরা

কামিনীকাঞ্চন পরিহার করতেন। কোন কোন জাতকে এই জন্যে রমণীকুলকে ঘোর অবিশ্বাসী পাপিনী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যাতে ভিক্ষুদের মনে রমণী সম্বন্ধে প্রবল বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায়, তখনকার উৎপলবর্ণা, বিশাখা, আম্রপালী প্রভৃতি রমণীরা ধর্মচর্যায় পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না॥

সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসেরও বহু তথ্য জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু থেকে জানতে পারা যায়। প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশলের রাজা বিম্বিসারকে কন্যা দান করেছিলেন এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্বাহের জন্য যৌতুক হিসাবে কাশী দান করেন। অজাতশত্রুর পিতা বিম্বিসার বধ, তাঁর সঙ্গে পিতার শ্যালক প্রসেনজিতের যুদ্ধ, শেষে অজাতশত্রুকে কন্যাদান করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি; বিরূঢ়কের নিজ পিতা প্রসেনজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁকে নির্বাসনদান, বিরূঢ়কের কপিলবস্তু ধ্বংস ও শাক্যকুল নির্মূলীকরণ; অজাতশত্রুর অনুতাপ ও বৌদ্ধধর্মগ্রহণ—এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ জাতকের কাহিনীগুলির মধ্যে লুক্কায়িত। জাতকপাঠে জানা যায়, তখন চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী—এই ছয়টি নগর সমগ্র আর্যাবর্তে প্রধান ছিল। বারাণসীর কৌশেয়বস্ত্র (বেনারসী শাড়ি) তখনও সর্বত্র সমাদৃত ছিল, বৈশালী নগরও সমৃদ্ধিশালী ছিল: সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন লিচ্ছবিরা। লিচ্ছবিজাতির ইতিহাস প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যেরই ইতিহাস। এই সব ঐতিহাসিক তথ্যের সূত্র হিসাবে জাতকের মূল্য আছে বলেই ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট্ স্মিথ জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার বলে অভিহিত করেছেন॥

বৌদ্ধ শিল্পকলাকেও জাতক নানাভাবে উদ্দীপিত করেছে। গ্রীকশিল্পে যেমন হোমার হেসিয়ডের প্রভাব, হিন্দু শিল্পে যেমন ব্যাস বাল্মীকির অবদান, তেমনি বৌদ্ধশিল্পেও জাতকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দীপনা। যবদ্বীপের বরোবুদুর, ভারতের সাঁচী, সারনাথ, ভারুট ইত্যাদি জায়গার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও প্রাচীন বৌদ্ধভাস্কর্যের যে-অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় তার পটভূমিকায় আছে জাতকের কাহিনী। সাঁচীতে অসদিসজাতক, মহাকপিজাতক, সামজাতক, বেস্‌সন্তরজাতকের কাহিনীর প্রস্তররূপ; ভারুটে মখাদেবজাতক, নিগ্রোধমিগ, কুরঙ্গমিগ, দসরথ—ইত্যাদি উনিশটি জাতকের কাহিনীর বহু দৃশ্য শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ দেখা যায়। সারনাথে আছে খন্তিবাদিজাতকের ছবি॥

জাতকে আরও আমরা দেখি, বৌদ্ধরা তখন সমস্ত রকম কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যখনই তাঁরা সুযোগ পেয়েছেন তখনই ফলিত জ্যোতিষ, শকুন-

বিদ্যা, হাতদেখা, কররকোষ্ঠিবিচার এ সমস্তকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। এর প্রমাণ আছে মঙ্গলজাতক ও নক্‌খত্তজাতকের গাথাগুলিতে। বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শনের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের মনকে নানাবিধ ভ্রম ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা, শাস্ত্রের চেয়ে যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করা। সেজন্যেই মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর Materialist Philosophy in India গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মকে এত উচ্চাসন দিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন, এই সব কারণেই বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে নানাদিকে এত উন্নতি হয়েছিল॥

পালিভাষা বাংলা ভাষাকেও নানাদিকে প্রভাবিত করেছে। সেজন্যে ভাষাতাত্ত্বিকের কাছেও পালিভাষার, তথা সেই ভাষায় রচিত জাতকের, বিশেষ গুরুত্ব আছে। পরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এখানে শুধু এইটুকুই বলি, যেসব শব্দের সংস্কৃত থেকে উৎপত্তি হয়ে বিকৃতিপ্রাপ্ত রূপ পাওয়ার জন্যে মূলনির্ণয় করা কঠিন হয়েছে, সেসব শব্দের উৎপত্তিসূত্র পালিভাষার সাহায্যে জানা যায়। যেমন ধরা যাক, 'নর্দামা' শব্দটি। অনেকের ধারনা—শব্দটি বিদেশী, ফার্সী থেকে এসেছে। কিন্তু জাতক পাঠে দেখা যায়, শব্দটির মূল সংস্কৃত। কুক্কুরজাতকে আছে, রাজভৃত্যেরা বলছে "দেব, নিদ্ধমনমুখেন সুনখা পবিসিত্বা রথস্স চম্মং খাদিংসু"—মহারাজ, কুকুরেরা নর্দামার মুখ দিয়ে ঢুকে রথের চামড়া খেয়ে নিয়েছে। তখন বোঝা যায়, নিদ্ধমন থেকে নর্দামা এসেছে। নিদ্ধমন শব্দটি বহু প্রাচীন, মূলে সংস্কৃত 'ধ্মা' ধাতু; সুশ্রুতে আছে নিধ্মাপন—অর্থ ফুৎকার দ্বারা নিষ্কাশন। পরে অর্থবিস্তৃতি হয়ে জলনিষ্কাশক প্রণালী। চোখের ব্যারাম 'ছানি' সংস্কৃত ছদ্‌ থেকে আসেনি, এসেছে পালি 'সানী' শব্দ থেকে, অর্থ—পর্দা। ক্ষেত নিড়ান, ফসল কাটা, ফসল মলা—এসবের উৎপত্তি পালি নিড্ডা, লা ও মদ্দ থেকে (সকুণ জাতক—নিড্ডয়িত্বা, লায়িত্বা, মদ্দিত্বা)। অন্যত্রও বহু বাংলা শব্দের উৎপত্তি যে সংস্কৃত থেকে পালির মাধ্যমে—তার বিবরণ দিয়েছি॥

বর্তমানে ব্যবহৃত অনেক শব্দেরও পালি প্রতিরূপ পাওয়া যায়। যেমন, জলনিয়ামক (Pilot); মঙ্গলেস্টক (foundation stone); উপরাজ (Viceroy); ঔপরাজ্য (Viceroyalty); পরিনায়ক (Crownprince); ভুজিস্স (Manumitted Slave); সংবহুল (Plebescite); বৈদ্যশালা (hospital); শল্যকর্তা (Surgeon); পুস্সপগুল (nosegay); গুড়যন্ত্র (Sugar mill); ফলকাসন (bench); সচ্চকার (earnest money, বায়না); প্রাতরাশ (breakfast); সায়মাস (Supper) ইত্যাদি॥

বিদেশের বহু সাহিত্যে জাতকের প্রভাব আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক

দার্শনিক পীথাগোরাস ভারতবর্ষে আসেন দর্শন ও জ্যামিতি শিখতে, ঐ সময় দয়ায়ুস পাঞ্জাবের কিছুটা অধিকার করেন, তারও আগে সাইরাসের রাজত্বকালে পারস্য রাজসভায় হিন্দু ও গ্রীকদের যাতায়াত ছিল। সেই সূত্রে জাতকের কিছু গল্প গ্রীক-দেশে যায়। ডিমোক্রিটাস এবং প্লেটোর যথাক্রমে 'কুকুর ও তার প্রতিবিম্ব' এবং 'সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভ' গল্পগুলি জাতকসূত্রে সেখানে গিয়েছিল, একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে, কারণ প্রথম গল্পটির মিল আছে 'চুল্লধনুগ্‌গহ' জাতকের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়টির 'সীহচম্ম' জাতকের সঙ্গে। পরে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর গ্রীক-ভারতীয় মেলামেশা অনেক ব্যাপক হয়—সেই সূত্রে জাতকের অনেক গল্প গ্রীক দেশে প্রচলিত হয়। বৌদ্ধধর্মপ্রচারকদের চেষ্টায় পৃথিবীর বহু জায়গায় বৌদ্ধজাতক ধর্ম-প্রচারের ছলে ব্যবহৃত হয়। ইহুদীদের মধ্যে ব্যবহৃত গল্পে এর প্রমাণ আছে। বাইবেলের সলোমনের বিচারপদ্ধতির কাহিনীর সঙ্গে জাতকের মহাউম্মগ্‌গ কাহিনীর মিল লক্ষণীয়। পণ্ডিত গেইডোজ্‌ দেখিয়েছেন, রোমে এই গল্পটি ভারতীয়সূত্রে এসেছে। মথির সুসমাচারে দেখি প্রভু যীশু অল্প খাদ্যে একবার বহুলোকের ক্ষুধা দূর করেছিলেন—'ইল্লীস' জাতকে গৌতম বুদ্ধও তাই করেছিলেন দেখতে পাই। 'মিত্তবিন্দক' জাতকে মিত্রবিন্দ ছিলেন ভ্রমণবিলাসী। অনেকে মনে করেন, মিত্র-বিন্দই সিন্দবাদের আদিপুরুষ, অন্ততঃ ইটালীয় পণ্ডিত কম্পারেত্তি তাই দেখিয়ে-ছিলেন। মুসলমানদের অভ্যুদয়ের আগে মধ্যপ্রাচ্যে বৌদ্ধজাতকের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই সূত্রে নিগ্রোদের মধ্যেও জাতকের গল্প-রূপ বদলিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ ক্যারোলিনার নিগ্রোদের মধ্যে প্রচলিত রিমাস কাকার গল্পগুলির একটির সঙ্গে পঞ্চাবুধজাতকের মিল আছে। রিচার্ডের ক্রুসেড্‌ থেকে ফিরে আসার পর বিদ্রোহী ভূস্বামীদের তিরস্কার করার গল্পের সঙ্গে 'সচ্চংকির' জাতকের মিল লক্ষণীয়। চসারের Pardoner's tale বেদব্‌ভ জাতকের পাশ্চাত্য রূপান্তর। গ্রীমের গল্পগুলিতেও অধুনাকালে দধিবাহন জাতকের বহু গল্প সংকলিত আছে॥

## ॥ পালিভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ॥

পালিভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি, এই পর্যায়ে এবার তাই আলোচনা করা হবে।

পালি বর্ণমালায় ৪১টি বর্ণ। তার মধ্যে 'সরবন্ন' ৮টি—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও। 'ব্যঞ্জনবন্ন' ৩১টি—ক, খ, গ, ঘ, ঙ ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; ত, থ, দ, ধ, ন ; প, ফ, ব, ভ, ম ; য, র, ল, ব, স ; হ, ল্‌হ, ং ॥ পালিতে ঋ, ৯, ঐ, ঔ নাই। শ, ষ, স তিনটে নাই—আছে কেবল স।

ব্যঞ্জনবন্নগুলি পালিতে ক, চ, ট, ত, প—এই পাঁচটি বগ্‌গে (বর্গে) বিভক্ত। য, র, ল অর্ধস্বরবর্ণ। স শিশধ্বনি-জাত, হ শ্বাসজাত। সংস্কৃতের নিয়ম অনুযায়ী বগ্‌গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অঘোস, বাকিগুলি ঘোস ॥

অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ—কণ্ঠজা। ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ—এগুলি তালুজা (তালব্য)। উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম—ওট্‌ঠজা। ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স—এগুলি দন্তজা। আর ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র—মুদ্‌ধজা ॥

পালিতে যুক্তাক্ষর নেই বললেই চলে, কেবল য-ফলা আর র-ফলার প্রয়োগ কোথাও কোথাও দেখতে পাই ॥

পালি লিপি (script) বলে কিছু নেই। বাংলাদেশে বাংলা বা রোমান লিপিতে, সিংহলে সিংহলী লিপিতে (সিংহলের রাজা বত্তগামিনীর সময়ে এই লিপির উদ্ভাবন হয়।), ব্রহ্মদেশে শ্যামদেশে, কাম্বোডিয়ায় সেই সেই দেশের লিপিতে পালিভাষা লিখিত হয়। অশোকের শিলালিপি—যেগুলি পালিভাষায়—সেগুলির লিপি ব্রাহ্মী ॥

সাম্প্রতিক কালে ভারতে পালিভাষার জন্য তিনটে লিপি ব্যবহৃত হয়—দেবনাগরী, বাংলা, রোমান। পাশ্চাত্যদেশে সবসময়ই রোমানলিপি ॥

**পালিভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন ঃ**

| | | সংস্কৃত | পালি |
|---|---|---|---|
| অ-ধ্বনি পরিবর্তিত ঃ | আ-তে | অলিন্দ | আলিন্দ |
| | ই-তে | কস্ম | কিস্‌স |
| | উ-তে | অসূয়া | উস্সূয়া |
| | এ-তে | অত্র | এথ |
| | ও-তে | অন্তর | ওন্তো |

| | সংস্কৃত | পালি |
|---|---|---|
| আ-ধ্বনি পরিবর্তিত | অ-তে মাংস | মংস |
| | ই-তে শাল্মলী | সিম্বলী |
| | উ-তে পারগা | পরাগু |
| | এ-তে পারাবত | পারেবত |
| ই-ধ্বনি পরিবর্তিত | এ-তে পুষ্করিণী | পোক্‌খরে |
| | উ-তে শিশু | সুসু |
| | এ-তে দ্বি | দ্বে |
| | মহিষী | মহেসী |
| ঈ-ধ্বনি পরিবর্তিত : | অ-তে কৌশীদ্য | কোসজ্জ |
| | আ-তে তিরশ্চীন | তিরচ্ছান |
| | ই-তে অলীক | অলিক |
| | উ-তে নিষ্ঠীবতি | নিথ্‌ভতি |
| | এ-তে ভীষ্ম | ভেস্‌স |
| উ-ধ্বনি পরিবর্তিত | অ-তে স্ফুরতি | ফরতি |
| | আ-তে বাহু | বাহা |
| | ও-তে পুরাণ | পোরাণ |
| ঊ-ধ্বনি পরিবর্তিত : | ই-তে ভূয়স্‌ | ভিয্‌যো |
| | ও-তে জাম্বুনদ | জাম্বোনদ |
| এ-ধ্বনি পরিবর্তিত : | অ-তে ম্লেচ্ছ | |
| | আ-তে কেয়ূর | কায়ুর |
| | ই-তে প্রশেবক | পসিব্বক |
| | ও-তে দ্বেষ | দোস |
| ও-ধ্বনি পরিবর্তিত : | উ-তে জ্যোৎস্না | জুন্‌হা (ডোসিনা) |

ঋ-ধ্বনি পরিবর্তিত : অ, এ, উ, ই-তে

হৃদয়>হদয় গৃহ>গেহ

মৃদু>মুদু মৃগ>মিগ

ঌ-ধ্বনি পরিবর্তিত : উ-তে কৢপ্ত>কুত্ত

ঐ-ধ্বনি পরিবর্তিত : ই, এ-তে ঐশ্বর্য>ইস্‌সরিয়

মৈত্রী>মেত্তী

ঔ-ধ্বনি পরিবর্তিত : উ, ও-তে ঔৎসুক্য>উস্‌সুক্‌ক

মৌন>মোন

## ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন

ক পরিবর্তিত খ, গ ॥ শুনক>সুনখ। মূক>মূগ।

গ ,, ক ॥ ভৃঙ্গার>ভিঙ্কার।

চ ,, ট ॥ চিকিৎসা>টিকিচ্ছা।

জ ,, চ, ড, য় ॥ প্রাজন>পাচন। জ্যোৎস্না>ডোসিনা।
নিজ>নিয়।

ট ,, ল ॥ স্ফটিক>ফলিক।

ড ,, দ ॥ ডিণ্ডিম>দিন্দিম।

ত ,, ট, দ ॥ প্রতিমা>পটিমা। উতাহু>উদাহু।

থ ,, ঠ ॥ শিথিল>সঠিল ॥

দ ,, জ, ট, ধ, র, ল, য় ॥ দম্পতি>জম্পতি। কুসীদ>কুসিট।
ককুদ > ককুধ। একাদশ>একারস।
উদার> উলার। খাদিত>খায়িত।

ধ ,, থ, ল ॥ উপধ্যেয়>উপথেয়। গোধিকা>গোলিকা।

ন ,, র ॥ নৈরঞ্জনা>নেরঞ্জরা।

প ,, ফ, ভ ॥ পরুষ >ফরুস। পূপ>পূভ।

ব ,, প, ভ ॥ লাব>লাপু। বস>ভুস ॥

ভ ,, হ ॥ প্রভূত>পহুত ॥

য় ,, ব, ভ, ল, ব ( wa ) ব জরায়ু>জলাবু ॥
সময়ু>সরভূ। যষ্টি>লট্‌ঠি।
কাষায়>কাসাব ( কাসাwa ) ॥

র ,, দ, ল। পুরন্দর>পুরিনদদ। রোম>লোম।

ল ,, ন, র ॥ লাঙ্গল>নঙ্গল। কিল>কির।

ব (wa) ব, ম, য় ॥ করল>কবল। দ্রাবিল>দামিল
দাব>দায় ( বন, forest ) ॥

হ ,, ধ ॥ ইহ>ইধ ॥

যে দুটি স-ধ্বনি ( শ, ষ ) পালিতে পাওয়া যাচ্ছেনা, সেগুলি আসলে পরিবর্তিত হয়েছে যথাক্রমে 'শ' 'চ'-তে, এবং 'ষ' 'স'-তে। যেমন, শব>চব। পাষাণ>পাসাণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'শ', 'ষ'-র কাজ স দিয়েই চালানো হয় ॥

পালিতে ন, ণ দুটোই আছে।

## ॥ পালির সঙ্গে অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধ ॥

**পালির সঙ্গে বৈদিকের সম্বন্ধ :**

পদান্ত হসন্ত বর্ণ বা বিসর্গের ব্যবহার পালিতে নেই। গুণবান> গুণবা। নরঃ > নর। দুঃখ>দুক্‌খ ॥

সংযুক্ত বর্ণের পূর্বেকার দীর্ঘস্বর পালিতে হ্রস্ব। তার্কিক > তক্‌কিক। পরাক্রম> পরক্‌কম ॥

সংস্কৃতের মত পালিতে দ্বিবচন নেই। একের বেশি হলেই বহুবচন ॥

পালিতে সমীকরণের ব্যাপক ব্যবহার। সমুদ্র>সমুদ্দ। দ্যুতি>জুতি ॥

পালি শব্দরূপে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৃতীয়া ( করণ ) ও পঞ্চমী ( অপাদান ) এবং চতুর্থী ( সম্প্রদান, নিমিত্ত ) ও ষষ্ঠীর ( সম্বন্ধপদ ) রূপ একই রকম ॥

আত্মনেপদী ধাতুরূপের চাইতে পরস্মৈপদী ধাতুরূপের প্রচলন পালিতে বেশি ॥

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিশদ আলোচনা ব্যাকরণ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ॥

বৈদিকের তালব্য ল ধ্বনি পালিতে আছে, কিন্তু সংস্কৃতে নাই।

বৈদিকের মত পালিতে ক্লীব লিঙ্গের বহুবচনে 'আ' যোগ হয়, সংস্কৃতের মত নি নয়। যেমন, বৈদিক ফলা>সং. ফলানি>পালি ফলা।

বৈদিক অসমাপিকা 'তুম্' প্রত্যয় পালিতে তুম্, তবে, তয়ে, তুয়ে র আকারে সংরক্ষিত। যেমন, √দা+তুম্=দাতুম। √দা+তবে=দাতবে। √খাদ্+তয়ে =খাদিতয়ে। √গিণ্+তুয়ে=গণেতুয়ে ( গণনা করে )।

বৈদিকের শব্দরূপের করণ এবং অপাদানের বহুবচনের 'এহি' এবং 'এভি' পালিতেও আছে। যেমন বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি।

বৈদিকের শব্দরূপে কর্তৃকারকের বহুবচনে হয় 'আসি' এবং 'আসে' প্রত্যয় যোগ। পালিতেও তাই। যেমন—ধম্মাসে, ধম্মাসি।

এগুলি ছাড়াও ছোটখাট অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে বৈদিকের সঙ্গে পালির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হওয়াতেই অনেকে বোধ হয় সিদ্ধান্ত করেন, বৈদিক থেকেই পালির জন্ম।

**পালির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ :**

পালির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ বৈদিকের তুলনায় কম। সংস্কৃত বর্ণমালার মত পালি বর্ণমালা উন্নত নয়। পালিতে সংস্কৃত বর্ণমালার ঋ, ঌ, ঐ, ঔ, শ, ষ, ক্ষ, :, এবং অনেকগুলি যুক্তাক্ষর অন্তর্হিত।

সংস্কৃতে তিনটে বচন—একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। পালিতে এক এবং বহুবচন।

সংস্কৃতের ব্যঞ্জনান্ত যুক্তাক্ষর পালিতে নেই। ব্যঞ্জনশব্দও পালিতে স্বরান্ত করে উচ্চারিত হয়। পদান্তে ং পালিতে আছে।

সংস্কৃতে স্বরান্ত, ব্যঞ্জনান্ত, যৌগিক স্বরধ্বনি ( ঐ, ঔ ) আছে। পালিতে কেবল স্বরান্ত ধ্বনি।

সংস্কৃতের ধাতুরূপের সমস্ত কাল (tense) ও ভাব (mood) পালিতে নেই।

## পালি ও মাগধী প্রাকৃতের সম্বন্ধ ঃ

প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা সূত্রেই দেখতে পাওয়া যাবে, পালির সঙ্গে মাগধী-প্রাকৃতের বিশেষ অমিল আছে। তাই মাগধীপ্রাকৃত যে পালিভাষার মূল এটা অনুমান করা সঙ্গত হবে না।

সংস্কৃত শব্দরূপে কর্তৃকারকের একবচনের বিসর্গ মাগধীপ্রাকৃতে হয় 'এ', কিন্তু পালিতে হয় 'অ'। যেমন : সং. নর>প্রা. নরে<পালি নর।

সংস্কৃত শিশ্‌ধ্বনি ( sibilant ) শ, ষ, স-র মধ্যে মাগধীপ্রাকৃতে আছে কেবল 'শ'। 'স'-ই একমাত্র পালিতে। 'শ' এবং 'ষ' পালিতে কখনও 'চ' কখনও 'স'। সং শব>ম. প্রা. শব>পালি চব।

সংস্কৃত এবং বৈদিকের 'র' পালিতে 'ল'। মাগধীপ্রাকৃতেও তাই। দুর্লভ>দুল্লভ। তরুণ>তলুন।

সংস্কৃত 'জ্ঞ' পালিতে এবং মাগধীপ্রাকৃতে ঞঞ্। 'ণ্য'ও এই দুটি ভাষায় ঞ্ঞ। প্রজ্ঞা>পঞ্ঞা। পুণ্য>পুঞ্ঞ। সংস্কৃত মহাপ্রাণ বর্ণের পালিতে এবং মাগধীপ্রাকৃতে লোপ বা আগম দুটোই দেখা যায়: কথিকা>কতিকা। কিল>খিল। মাগধীপ্রাকৃতে 'দ' 'ধ' দুটোই আছে। পালিতেও তাই। 'চ্ছ' মাগধীপ্রাকৃতে শ্চ। পালিতে চ্ছ।

## পৈশাচি প্রাকৃতের সঙ্গে পালির সম্বন্ধ ঃ

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের জনসাধারণের কথ্যভাষার নাম ছিল পৈশাচি প্রাকৃত। কান্দাহার ( গান্ধার ), তক্ষশিলা প্রভৃতি অঞ্চলে বুদ্ধদেবের কর্মকেন্দ্র ছিল, বৌদ্ধমতের প্রসার এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চাও এই সব দিকে ছিল ব্যাপক। কাজেই পালির ওপর পৈশাচি প্রাকৃতের কিছু প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়॥

পৈশাচি প্রাকৃতে স্বরমধ্যাগত বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ সেই বর্গেরই প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ ক-বর্গের গ (তৃতীয় বর্ণ), 'ঘ' (চতুর্থ বর্ণ), যথাক্রমে 'ক'

এবং 'খ'তে পরিবর্তিত হয়। পালিভাষায় কোন কোন শব্দে এই বিশেষত্ব রক্ষিত আছে। যেমন, সং. গগন>পৈ. প্রা. গকণ>পালি গকণ। সং মেঘ>পৈ. প্রা. মেখ > পালি মেখ। সংস্কৃত গাথা > পৈ. প্রা. গাধা > পালি গাধা॥ সং. রাজা >পৈ. প্রা. রাচা >পালি রাচা। পৈশাচি প্রাকৃতে 'ণ' ন-তে পরিবর্তিত। কোন কোন ক্ষেত্রে পালিতেও তাই। তরুণ>তলুন॥

**পালি ভাষার সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ ঃ**

অন্য সবদিক বাদ দিয়ে, কেবল ভাষাতত্ত্বের দিকটাই যদি আলোচনা করা যায়, দেখা যাবে—বাংলার সঙ্গে পালির সম্বন্ধ বেশ ঘনিষ্ঠ। মধ্য ভারতীয়-আর্য যুগে ( Middle Indo-Aryan Period ) পালির উৎপত্তি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন—সেই সময় থেকে প্রায় ১৮০০ বছর পালি ভারতের নানা প্রধান প্রধান জায়গায় প্রচারিত, আলোচিত এবং চর্চিত হওয়ার ফলে ঐ সব অঞ্চলের স্থানীয় কথ্য-ভাষার ওপর পালির প্রভাব অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। হিন্দী, বাংলা ইত্যাদি আধুনিক ভাষাগুলির ওপরে পালির প্রভাবের কারণ এগুলির Source language-এর ওপর পালির প্রভাব ছিল। এই কারণে বাংলা ও হিন্দী ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নির্ণয়ে পালিভাষার অধ্যয়ন এবং জ্ঞান ছাড়া চলে না। ধ্বনি, শব্দ, বাগ্‌ধারা ( Idiom ) এবং বহু শব্দগুচ্ছ ( Phrase ) পালির থেকে বাংলায় এসেছে, কখনও সোজাসুজি, কখনও বা বৈদিকের বা সংস্কৃতের মাধ্যমে। সেই বিশেষত্বগুলি এই ধরনের :

বৈদিকের ঢ় এবং ড়—সংস্কৃতে অনুপস্থিত, কিন্তু পালিতে আছে। সেইসূত্রে ধ্বনি দুটি বাংলাতে এসেছে॥

কোন কোন শব্দ সোজা পালি থেকে বাংলায় এসেছে। যেমন :

| পালি | বাংলা |
|---|---|
| অম্ব | আম |
| কম্‌মার | কামার |
| কহং | কাহাঁ ( হিন্দী ) |
| ছ | ছ বা ছয় |
| ভত্ত | ভাত |
| ভারস | ভার |
| হেট্‌ঠা | হেট বা হেঁট। |

| পালি | বাংলা |
|---|---|
| কুল্ল | কুলা |
| চঙ্গোটক | চাঙ্গারী |
| গৃথ | ঘুঁটে |
| জ্জ্জক | জুজু |
| তট্টক | টাট |
| বড্ঢন | ( ভাত ) বাড়া |

এই শব্দগুলি বৈদিক থেকে পালির মধ্যে দিয়ে বাংলায় এসেছে :

| বৈদিক | পালি | বাংলা |
|---|---|---|
| কর্ম | কম্ম | কাম, কম্ম |
| মৎস্য | মচ্ছ | মাছ |
| বৃদ্ধ | বুড্ঢ | বুড়ো, বুড্ঢা ( হিন্দী ) |
| হস্ত | হত্থ | হাত |
| হস্তী | হত্থী | হাতী |
| সত্য | সচ্চ | সাঁচ ( হিন্দী ) |
| সপ্ত | সত্ত | সাত |
| অষ্ট | অট্ঠ | আট |
| পঞ্চদশ | পন্নরস | পনর, পনের |
| চতুর্দশ | চোদ্দস | চৌদ্দ |
| বিংশতি | বীস | বিশ |

সংস্কৃত থেকে পালির মধ্যে দিয়ে বাংলায় এসেছে :—

| সংস্কৃত | পালি | বাংলা |
|---|---|---|
| অর্ধ-তৃতীয় | অড্ঢতিঅ | আড়াই |
| অলাবু | লাবু ( লাপু ) | লাউ |
| উদ্ধান, উদধ্মান | উদ্ধান | উনান |
| ক্ষাম | ঝাম | ঝামা |
| সাটক | সাটক | শাড়ি |
| শাল্মল | সিম্বল | শিমুল |
| স্নান | নহান | নাওয়া |

| সংস্কৃত | পালি | বাংলা |
|---|---|---|
| স্থবিকা | থবিকা | থলি |
| ভস্ত্রা | ভস্তা | বস্তা |
| প্রোতিকা | পিলোতিকা | পল্‌তে |
| দুহিতা | ধীতা | ঝি |

পালি বাগ্‌ধারা ( Idiom )-র বাংলা অনুকৃত :

| | |
|---|---|
| কণ্ণং দত্বা | কান দেওয়া |
| কালে কালে | কালে কালে |
| সো হংতি বা হুংতি বা ণ কিঞ্চি বদেসি | সে হ্যাঁ-ও করেনি, হুঁ-ও করেনি |
| পদে পদে | পদে পদে |
| (গমণায়) কম্মং নত্থি | গিয়ে কাম নেই, কাজ নেই |
| খণে খণে | ক্ষণে ক্ষণে |

পালি শব্দগুচ্ছের ( Phrase ) প্রভাব :

| | |
|---|---|
| পিট্‌ঠিতো পিট্‌ঠিতো | পিছনে পিছনে |
| একতো হুত্বা | এক হয়ে |
| কিন্তি কত্বা | কি করে |

পালি ব্যাকরণের শেষাংশে এই বাগ্‌ধারা ও শব্দগুচ্ছের আরো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

## ॥ পালিভাষায় সন্ধি ॥

পালি বৈয়াকরণরা পালিভাষায় দুরকম সন্ধির কথা বলেছেন—(১) অক্ষরসন্ধি [ Euphonic Combinaion of letters বা বর্ণের মিলন ] ও (২) পদসন্ধি [ Euphonic Combination of Words বা পদের মিলন ] ॥

W. Geiger বলেছেন, সংস্কৃতের পদসন্ধির তুলনায় বা সাদৃশ্যবিচারে পালি পদসন্ধি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। পালিতে পদসন্ধি প্রথম শব্দের শেষ অক্ষর এবং পরবর্তী শব্দের প্রথম অক্ষরের মিলনে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংস্কৃতের রীতি অনুসরণ করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার পদসন্ধির নিয়ম সংস্কৃতের সঙ্গে মিলবেই না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পালিতে পক্ক এবং ওদন এই শব্দদুটি সন্ধি হয়ে হবে পক্কোদন। এখানে সংস্কৃতের নিয়মই অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু এব এবং ইতি সন্ধি হয়ে হল এবাতি—এখানে সংস্কৃতের সঙ্গে মিলছে না। সেই-জন্যেই পালিতে পদসন্ধির গঠনে দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী ধারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—একটি স্বাধীন বা নিয়মহীন ধারা, অন্যটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ ধারা। E. Muller বলেছেন, পালিতে পদসন্ধি বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু সংস্কৃতে পদসন্ধি বাধ্যতামূলক। সংস্কৃতে কোথাও দেব ঈশ দেখতে পাওয়া যাবে না, সব সময়ে তা দেবেশ। কিন্তু পালিতে তা না করলেও কোন ক্ষতি নেই। পালিতে পদসন্ধি একমাত্র কবিতাতেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়, গদ্যে কম। যেমন ধনিয় সুত্তের দশ নং শ্লোকে দেখছি—

> নত্থি বসা নত্থি ধেনুপা
> গোধরণিয়ো পবেণিয়ো পি নত্থি
> উসভোপি গবম্পতীধ নত্থি
> অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব ॥

এই একটি শ্লোকেই নত্থি ( ন+অত্থি ), উসভোপি ( উসভ+অপি ) গবম্পতীধ ( গবম্পতি+ইধ )—ইত্যাদি তিনটি সন্ধিবদ্ধ পদ পাচ্ছি কিন্তু,

> রাজা আহ: ভন্তে নাগসেন, তুম্হে ভনথ 'কিং তি ইমং দুক্খং নিরুজ্ঝেয় অঞ্ঞঞ্ চ দুক্খং ন উপজ্জেয়্যতি ?'

এই বাক্যটিতে কিং তি ইমং, অঞ্ঞঞ্ চ ইত্যাদির সন্ধিবদ্ধ হওয়ার সুযোগ থাকলেও গদ্যে ছাড়া-ছাড়া ভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছে, সন্ধি করা হয়নি। আবার

কবিতাতেও যে সব সময় পদসন্ধি করতেই হবে এমন কোন বাঁধাধরা নির্দেশ নেই। সেখানে পদসন্ধি ছন্দের নির্দেশে পরিচালিত; আর গদ্যে যেখানে পদসন্ধির প্রয়োগ, তা সাধারণ ও স্বাভাবিক ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মের দ্বারা শাসিত ॥

পালির পদসন্ধি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন জার্মান পণ্ডিত Windisch। তাঁর মতে পালির পদসন্ধি সংস্কৃতের তুলনায় প্রাচীন এবং সেই কারণেই অধিকতর সরল ও স্বাভাবিক। E. Windisch-এর কথা মেনে নিলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, পালির পদসন্ধির নিয়মগুলি সাধারণ ধরনের এবং জটিলতাবর্জিত, কারণ ব্যাকরণের জটিলতা যা কিছু সব সংস্কৃতেই বেশি। আর এমনিও দেখতে পাচ্ছি, পালির পদসন্ধির নিয়মগুলি কোন ক্ষেত্রেই সার্বিক এবং একই নিয়মের অধীন নয়। পালিতে নিপাতনসিদ্ধ সন্ধির প্রাচুর্যই লক্ষণীয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, পালিভাষায় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণের প্রভাব আছে এবং আরো সিদ্ধান্ত করতে পারা যায়, যে সময় পালিভাষা গঠিত হয়েছে তখন সন্ধির সমস্ত নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ বা ব্যাখ্যাত হয়নি ॥

**পালিতে পদসন্ধি তিন রকম :**

(ক) **সরসন্ধি** —( স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলন )। এখানে প্রথম শব্দের শেষ স্বরবর্ণের সঙ্গে দ্বিতীয় শব্দের প্রথম স্বরবর্ণের সন্ধি হয়।

(খ) **বমিস্সক সন্ধি**—( স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জন বর্ণের মিলন )। বমিস্স কথাটির অর্থ বিমিশ্র। এক্ষেত্রে স্বরবর্ণান্ত প্রথম শব্দের সঙ্গে ব্যঞ্জনারম্ভ দ্বিতীয় শব্দের সন্ধি।

(গ) **নিগ্গহীত সন্ধি**—(অনুনাসিক বর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলন)। এখানে প্রথম শব্দের শেষের অনুনাসিক বর্ণের সঙ্গে দ্বিতীয় শব্দের প্রথম স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের সন্ধি হবে।

পালিতে বলতে গেলে ব্যঞ্জনসন্ধি নেই, কারণ পালিতে এক অনুস্বর ছাড়া ব্যঞ্জনান্ত শব্দ খুব বেশী নেই। মূল ব্যঞ্জন শব্দ পালিতে বর্জিত হয় কিংবা পরবর্তী স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই যুক্ত হয়ে যায়। যেমন, সংস্কৃতে আছে রাজন্ শব্দ, এতে পদান্ত ন ব্যঞ্জনবর্ণ, কিন্তু পালিতে তা হয়েছে রাজা, শেষের ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত। তেমনি, ভগবৎ, ভগবতা। আরো একটি জিনিস পালিতে লক্ষণীয়। পালিতে খুব কম শব্দই সংযুক্ত ব্যঞ্জন ( যথা—ক্ষ, স্ফ, স্প, ষ্ট, ত্র, গ্র, ম্র ইত্যাদি ) দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। ক্ষপণক, স্ফুরিত, স্পষ্ট, গ্রাম, ম্রিয়মাণ প্রভৃতি শব্দ পালিতে পরিবর্তিত

হয়েছে খপণক, ফুরিত, পস্ট, গাম, মিয়মাণ ইত্যাদি ভাবে। তবে 'ব্র'এর ব্যবহার আছে ব্রহ্ম, ব্রহা, ব্রাহ্মণ, ব্রভি ইত্যাদি শব্দে। ণ, ট, ধ, ল, ল্হ ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ শব্দ পালিতে খুব কম। সুতরাং যদি শব্দের আরম্ভে এবং শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার না থাকে, তবে ব্যঞ্জনসন্ধির প্রশ্ন ওঠে না॥

এখন **সরসন্ধির** কয়েকটি নিয়ম আলোচনা করা হবে।

(ক) **বর্ণলোপ :** অট্ঠ+ইমে=অট্ঠিমে। এখানে অট্ঠ শব্দের শেষের **অ** লোপ পেল।

(খ) **বি-সম স্বরবর্ণের পরবর্তী স্বরবর্ণ লোপ :**

চত্তারো+ইমে=চত্তারোমে। দ্বিতীয় শব্দের প্রথম স্বরবর্ণ ( অর্থাৎ **ই** ) লোপ পেয়েছে।

(গ) **ই** এবং **ঈ**-কারের সঙ্গে **অ, আ, উ, ঊ** যুক্ত হলে নানারকম ফল দেখতে পাচ্ছি। যেমন,

অগ্গি+উদক=অগ্গোদক ( ই+উ=ও )

ন+ঈরেসি=নরেসি ( অ+ঈ=এ )।

মহা+ইসি=মহেসি ( আ+ই=এ )।

(ঘ) **সন্ধি হওয়ার পর প্রথম শব্দের শেষ অক্ষর বর্জন ও পরবর্তী শব্দের প্রথম অক্ষরের দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি :**

যথা+ইদং=যথীদং। এখানে সন্ধি হওয়ার পর প্রথমে শব্দের শেষ অক্ষর 'আ' বর্জিত হল, এবং পরবর্তী শব্দ ইদং-এর ই-কার দীর্ঘত্ব লাভ করল।

(ঙ) **পূর্ব স্বরের দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি, এবং পরবর্তী স্বর লোপ :**

এব+ইতি=এবাতি।

পতি+ইহ=পতীহ।

এখানে সন্ধি হওয়ার পর 'এব' এবং 'পতি' শব্দের যথাক্রমে 'অ' এবং ই-কার সন্ধি হওয়ার পর দীর্ঘ হল, এবং পরবর্তী ইতি, ইহ শব্দের 'ই' কার লোপ পেল॥

(চ) **'এব' শব্দের যোগে সন্ধি হওয়ার সময় 'রি'-এর আগম :**

অতি+এব=অতিরিব।

রাজা+এব=রাজারিব।

(ছ) **য-এর আগম :**

চ+ইমে=চয়িমে।

**বমিস্সক সন্ধির কয়েকটি নিয়ম ঃ**

(ক) **স্বরবর্ণের দীর্ঘত্বপ্রাপ্তি ঃ**

দু+রকৃথ=দূরকৃথ। সু+রত=সূরত।

(খ) **কখনও কখনও দীর্ঘস্বরবর্ণের হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি ঃ**

ভাবী+গুণ=ভাবিগুণ।

(গ) **'অব' শব্দান্ত পদে 'ও'এর আগম ঃ**

অব+কাস=ওকাস।

ভব+তি=ভোতি। নব+নীত=নোনিত।

(ঘ) **ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বপ্রাপ্তি ঃ**

জাত+সর=জাতস্সর। বিজ্জু+লতা=বিজ্জুল্লতা।

**নিগ্গহীত সন্ধির কয়েকটি উদাহরণ** দিয়ে পদসন্ধির আলোচনা এখানে শেষ হবে।

**অনুনাসিক বর্ণের সমবর্গীয় কোন বর্ণে কিংবা 'ল'-তে রূপান্তর ঃ**

এবং+মে=এবম্মে ( ং—'ম'তে পরিবর্তিত )।

সং+লাপ=সল্লাপ ( ং—'ল'তে পরিবর্তিত )।

কিং+চি=কিঞ্চি ( ং—'ঞ'তে পরিবর্তিত )।

(খ) **'এ'** এবং **'হ'**-এর **ঞ্ঞ**-তে রূপান্তর ঃ

অহং+এব=অহঞ্ঞেব।

তং+হি=তঞ্হি।

(গ) **'য'**-এর **ঞ্ঞ-তে য**-সমেত বা **য**-বাদ রূপান্তর ঃ

সং+যতি=সঞ্ঞতি কিংবা সঞ্যতি।

## ॥ অক্খর সন্ধি ॥

দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্খরসন্ধি জিনিসটি কি আমরা এবার তা দেখব। পালিতে অক্ষরসন্ধি ( অক্খরসন্ধি ) মানে পদাভ্যন্তরে ধ্বনিপরিবর্তন। সাধারণভাবে সেই ধ্বনিপরিবর্তন নিম্নের দশটি নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে।

১॥ **অপিনিহিতি**-র ( Epenthesis ) নিয়ম অনুযায়ী—

(ক) সং. ক্লেশ>পালি কিলেশ। তেমনি শ্রী>সিরি, যার থেকে বাংলায় 'ছিরি'। গ্লান>গিলান।

(খ) **শব্দের মধ্যস্থিত স্বরবর্ণের পরিবর্তনের** ( Ablaut ) **নিয়ম অনুযায়ী।** যেমন: বহু>বাহু। পভাসতি>পভাসেতি।

(গ) **আত্তীকরণ** ( Assimilation )এর নিয়ম অনুযায়ী—

এই আত্তীকরণ তিনভাবে হতে পারে। (১) পরবর্তীস্বরে আত্তীকরণ ( Progressive assimilation )—অল্প>অপ্প। (২) পূর্ববর্তীস্বরে আত্তীকরণ ( Regressive assimilation ) অগ্নি>অগ্‌গি। (৩) নতুন শব্দের আগম ( Mutual assimilation ) যেমন, সত্য>সচ্চ।

(ঘ) **অক্ষরের স্থান পরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী** ( Metathesis )— মশক>মকস ( 'অন্ধক মকস ন বিজ্‌জরে' ), জিহ্বা>জিভ্‌হা, বাংলায় যার থেকে জিভ্‌।

(ঙ) **পদের মধ্যে থেকে বর্ণাদির লোপ** (Syncope) নিয়ম অনুযায়ী—

সং. ভদন্ত>পালি ভন্তে ( 'মঞ্‌ঞামি ভন্তে বীজানাং নানা কারণেন তি' ) উদক>ওক।

(চ) **সমজাতীয় ধ্বনির আগমনের দ্বারা লুপ্ত ধ্বনির স্থান অধিকার** ( Compensation ) নিয়ম অনুযায়ী—

সং. ভূয়স>পালি ভিয়ো ( 'ভিয়ো ওপ্পং করোহি তি' )। বিংশতি>বীসতি। সিংহ>সিহ। ভীষণ>ভিংসন।

(ছ) **শব্দের পূর্বে বর্ণ বা বর্ণাবলীর আগম** ( Prothesis ) নিয়ম অনুযায়ী—

অস্তিকে>সন্তিকে। স্ত্রী>ইত্থি, ইত্থী।

(জ) এক কালে উচ্চার্য **দুটি শব্দাংশকে** ( Syllable ) **সঙ্কুচিত করে একটি শব্দাংশে পরিণত করার নিয়ম** ( Haplology ) অনুযায়ী—

অর্দ্ধতৃতীয়>অদ্ধতিয়। পবিসিস্‌সামি>পবিস্‌সামি।

(ঝ) **সমধ্বনি** বা **শব্দাংশের অন্যস্বরে পরিবর্তনের** (Dissimilation) **নিয়ম** অনুযায়ী—

গুরু>গরু। পুরুষ>পুরিস। পিপীলিকা>কিপিল্লিকা।

(ঞ) **একটি শব্দের অনুকরণে অন্য একটি শব্দের সৃষ্টি** ( Analogy ) **নিয়ম** অনুযায়ী—

দুব্বচ>সুব্বচ। দুভিক্‌খ>সুভিক্‌খ।

## ॥ পালিতে লিঙ্গ প্রকরণ ॥

সংস্কৃতের মত পালিতেও পুরুষ, স্ত্রী অথবা প্রাণহীন বস্তু বোঝাবার জন্যে লিঙ্গের ব্যবহার আছে। পালিতে লিঙ্গ পরিবর্তন সাধাণভাবে সংস্কৃতের নিয়ম অনুযায়ীই হয়ে থাকে। কিন্তু পালিতে লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এখানে বিশেষ্য পদের লিঙ্গ পরিবর্তনের সময় বচন, পুরুষ, স্ত্রী বা বিপরীত লিঙ্গ কঠোরভাবে বিবেচনা করা হয় না। আবার এমনও দেখা গেছে, অন্য ভাষায় যেটা সাধারণতঃ পুংলিঙ্গ কিংবা স্ত্রীলিঙ্গ, পালিতে তা স্ত্রীলিঙ্গও হতে পারে, পুংলিঙ্গও হতে পারে, ক্লীবলিঙ্গ হতেও বাধা নেই। যেমন, দেবতা শব্দ পালিতে স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু তপ ক্লীবলিঙ্গ।

পালিতে লিঙ্গ তিনটি : পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ। এইগুলিকে আবার এই চারভাগে ভাগ করা হয়েছে :

(১) **কোন কোন শব্দের একটিই লিঙ্গ :**

সর্বদা পুংলিঙ্গ—বুদ্ধ, দন্ত, লোক ইত্যাদি।

সর্বদা স্ত্রীলিঙ্গ—চিন্তা, দেবতা, পূজা ইত্যাদি।

সর্বদা ক্লীবলিঙ্গ—আয়ু, বিত্ত, তপ, যস ইত্যাদি ॥

(২) **কোন কোন শব্দের দুটি মাত্র লিঙ্গ :**

কেবল পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ :

অস্‌স —অস্‌সা ; দারক—দারকা ; সুত—সুতা ;

বানর—বানরী ইত্যাদি ॥

কোন কোন শব্দের কেবল পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ :

অম্বু—অম্বুং ; দিবস—দিবসং ; আসন—আসনং ॥

কোন কোনো শব্দের কেবল স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ :

আরাধনা—আরাধনং। বন্দনা—বন্দনং। নগরী—নগরং ॥

(৩) **কোন কোন শব্দের তিনটি লিঙ্গ :**

| **পুং** | **স্ত্রী** | **ক্লীব** |
|---|---|---|
| পুর | পুরী | পুরং |
| কলস | কলসী | কলসং |
| রত্ত ( রাত্রি ) | রাত্তি | রত্তং |

**(৪) কোন কোন শব্দের লিঙ্গ নেই :**

অধুনা, সরবথ ( সর্বত্র ), নাম, কদাচি ইত্যাদি।

একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করবার আছে—পালিতে পুংলিঙ্গের সঙ্গে অনুস্বার যোগে ক্লীবলিঙ্গ হয়ে থাকে।

পালিতে স্ত্রীলিঙ্গ গঠনের মোটামুটি নিয়ম এইগুলি :

**আ**-যোগে :

আয্য—আয্যা। সালিক—সালিকা। কনিট্ঠ—কনিট্ঠা ইত্যাদি।

**ঈ**-যোগে :

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী। কলস—কলসী। থের—থেরী। হংস—হংসী ইত্যাদি।

**ইনী**-যোগে :

ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচারিণী। তপস্সী—তপস্সিনী। যসস্সী—যসস্সিনী ইত্যাদি।

**আনী**-যোগে :

আচায্য—আচায্যানী। মাতুল—মাতুলানী। গহপতি—গহপতানী।

**নী**-যোগে :

বন্ধু—বন্ধুনী। ভিক্খু—ভিক্খুনী। পটু—পটুনী।

**ইকা**-যোগে :

জনক—জনিকা। বালক—বালিকা। কারক—কারিকা।

**ইয়া**-যোগে :

অজ্জক—অজ্জিয়া। দুসক—দুসিয়া।

**ইকিনী**-যোগে :

পরিব্বাজক—পরিব্বাজকিনী। রজক—রজকিনী।

**অন্য শব্দ যোগে :**

ভাতা—ভগিনী। পিতা—মাতা। পুরিস ( পুরুষ )—ইত্থি, ইত্থী, থী।

**একাধিক স্ত্রীলিঙ্গ :**

কুম্ভকার—কুম্ভকারা, কুম্ভকারী, কুম্ভকারিণী।

মিগ ( মৃগ )—মিগি, মিগিনী।

নাগ—নাগি, নাগিনী।

সিহ ( সিংহ )—সিহি, সিহিনী।

## ॥ পালিতে বিভক্তি প্রয়োগ ও শব্দরূপ ॥

সংস্কৃত ভাষার মত পালিতেও ছটি বিভক্তি—পথমা (প্রথমা), দুতিয়া (দ্বিতীয়া), ততিয়া (তৃতীয়া), চতুত্থী (চতুর্থী), পঞ্চমী (পঞ্চমী), সত্তমী (সপ্তমী)। ষষ্ঠী বিভক্তি নয়, সম্বন্ধ পদ, কর্তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ বোঝানো হয়। পালিতে সম্বন্ধ পদের নাম ছট্‌ঠি। আর সম্বোধনকে বলা হয়—আলাপনং॥

পালি শব্দরূপে নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি লক্ষণীয় :

(ক) পালিতে সংস্কৃতের মত দ্বিবচন নেই, কেবল একবচন ও বহুবচন।

(খ) চতুর্থীর বহুবচন এবং পঞ্চমীর বহুবচনের রূপ বহুক্ষেত্রে যথাক্রমে ষষ্ঠীর বহুবচন এবং তৃতীয়ার বহুবচনের মত। স্ত্রীলিঙ্গের একবচনেও এদের রূপ এক।

(গ) স্বরবর্ণান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদের দ্বিতীয়ার বহুবচন, পঞ্চমীর একবচন এবং অধিকরণের একবচন বহুলভাবে সর্বনাম শব্দের শব্দরূপের দ্বারা প্রভাবিত।

(ঘ) স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষ্য পদের একবচনের রূপ করণ থেকে অধিকরণ (৩য়া থেকে ৭মী) পর্যন্ত এক রকম।

(ঙ) ব্যঞ্জনান্ত পদের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণটিকে স্বরবর্ণে রূপান্তরিত করে সেই স্বরবর্ণের রূপ অনুযায়ী শব্দরূপ গঠিত হয়, কিন্তু পাশাপাশি ব্যঞ্জনান্ত রূপটিও থাকে।

(চ) কখনও কখনও নিয়ম বহির্ভূত লিঙ্গও শব্দরূপে আসে ; যেমন, 'সুখ' শব্দ প্রথমার একবচনে 'সুখং' হওয়া উচিত, কারণ 'সুখ' ক্লীবলিঙ্গ ; কিন্তু পুংলিঙ্গ শব্দের মত 'সুখ'।

(ছ) অ-কারান্ত শব্দের আলাপনে (সম্বোধনে) একবচনে অ অথবা আ—দুটোই হয়। দেব শব্দের আলাপনে একবচনে দেব, দেবা দুটোই সিদ্ধ।

(জ) বৈদিক শব্দরূপের কিছু বিশিষ্টতাও পালিতে দেখা যায়। যেমন—

(১) পুংলিঙ্গ অ-কারান্ত শব্দের কর্তার বহুবচনে 'আ' বিভক্তির জায়গায় '-আসে' বিভক্তিও যুক্ত হয়। যেমন, ধম্মাসে, পণ্ডিতাসে ইত্যাদি।

(২) পুংলিঙ্গ অ-কারান্ত শব্দের করণের একবচনে '-এন' বিভক্তির জায়গায় আ-বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে। যেমন—সহথেন, সহথা।

(৩) করণের বহুবচনে 'এহি' অথবা 'এভি' দুটোই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে—বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি।

(৪) কতকগুলি পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদের রূপ পালিও হয়, বৈদিকও হয়।

পালি ব্যাকরণ অনুযায়ী কতকগুলি শব্দরূপের নমুনা নীচে দেওয়া হল—

## পুংলিঙ্গ বিশেষ্য অ-কারান্ত পদ

### ॥ দেব ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | দেব | দেব ( দেবাসে ) |
| ২য়া | দেবং | দেবে |
| ৩য়া | দেবেণ | দেবেহি, দেবেভি |
| ৪র্থী | দেবস্স, দেবায় | দেবাণং |
| ৫মী | দেবা, দেবস্মা, দেবংহা | দেবাহি, দেবেভি |
| ৬ষ্ঠী | দেবস্স | দেবাণং |
| ৭মী | দেবে, দেবস্মিং, দেবংহি | দেবেসু |
| আলাপণং | দেব ( দেবা ) | দেবা |

### ॥ বুদ্ধ ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | বুদ্ধ | বুদ্ধা |
| ২য়া | বুদ্ধং | বুদ্ধে |
| ৩য়া | বুদ্ধেণ | বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি |
| ৪র্থী | বুদ্ধস্স, বুদ্ধায় | বুদ্ধাণং |
| ৫মী | বুদ্ধা, বুদ্ধস্মা, বুদ্ধংহা | বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি |
| ৬ষ্ঠী | বুদ্ধস্স | বুদ্ধাণং |
| ৭মী | বুদ্ধে, বুদ্ধস্মিং, বুদ্ধংহি | বুদ্ধেসু |
| আলাপণং | বুদ্ধ, বুদ্ধা | বুদ্ধা |

পুংলিঙ্গ অ-কারান্ত নিম্নলিখিত শব্দগুলিরও একরকম রূপ হবে। আচারিয়, অম্ব, দাবক, ধম্ম, দিপ ( দ্বীপ ), গাম ( গ্রাম ) ইত্যাদি।

## পুংলিঙ্গ বিশেষ্য ই-কারান্ত পদ

### ॥ মুনি ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | মুণি | মুণী, মুণয়ো |
| ২য়া | মুণিং | মুণী, মুণয়ো |
| ৩য়া | মুণিনা | মুণীহি, মুণীভি |

| | | |
|---|---|---|
| ৪র্থী | মুণিনো, মুণিস্‌স | মুণীনং |
| ৫মী | মুণিনা, মুণিস্মা, মুণিংহা | মুণীহি, মুণীভি |
| ৬ষ্ঠী | মুণিনো, মুণিস্‌স | মুণীনং |
| ৭মী | মুণে, মুণিস্মিং, মুণিংহি | মুণীসু |
| আলাপণং প্রথমার মত | | |

মুণি শব্দের মত রূপ হবে এই সব পুংলিঙ্গ ই-কারান্ত শব্দের :—

অহি, অরি, ইসি ( ঋষি ), মণি, সারথি, কপি, সেনাপতি ইত্যাদি।

## পুংলিঙ্গ বিশেষ্য উ-কারান্ত পদ

### ॥ ভিক্‌খু ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | ভিক্‌খু | ভিক্‌খূ, ভিক্‌খবো |
| ২য়া | ভিক্‌খুং | ভিক্‌খূ, ভিক্‌খবো |
| ৩য়া | ভিক্‌খুণা | ভিক্‌খূহি ভিক্‌খূভি |
| ৪র্থী | ভিক্‌খুস্‌সো, ভিক্‌খুণো | ভিক্‌খূণং |
| ৫মী | ভিক্‌খুণা, ভিক্‌খুস্মা, ভিক্‌খুংহা | ভিক্‌খূহি, ভিক্‌খূভি |
| ৬ষ্ঠী | ভিক্‌খুস্‌সো, ভিক্‌খুণো | ভিক্‌খূণং |
| ৭মী | ভিক্‌খুস্মিং, ভিকখুংহি | ভিক্‌খূসু |
| আলাপণং ভিক্‌খু | | ভিকখূ |

পুংলিঙ্গ উ-কারান্ত শব্দগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলির রূপ ভিক্‌খু শব্দের মত হবে—বন্ধু, বহু, বাহু, জণ্‌তু, পসু, সাধু, সেতু, তরু, পটু ইত্যাদি।

## পুংলিঙ্গ বিশেষ্য ও-কারান্ত পদ

### ॥ গো ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | গো | গব, গাব |
| ২য়া | গবং, গাবং | গব, গাব |
| ৩য়া | গবেণ, গাবেণ | গোহি, গোভি |
| ৪র্থী | গবস্‌স, গাবস্‌স | গবং, গোণং, গুন্নং |
| ৫মী | গবা, গবাস্মা | গোহি, গোভি |
| ৬ষ্ঠী | গবস্‌স, গাবস্‌স | গবং, গোণং, গুন্নং |
| ৭মী | গবে, গাবে, গোবস্মিং, গাবংহি, গবংহি | গোসু, গবেসু, গাবেসু |
| আলাপণং | গো | গব, গাব |

## পুংলিঙ্গ বিশেষ্য ব্যঞ্জনান্ত পদ

### ॥ অন্‌-ভাগান্ত—রাজন্‌ ( রাজা ) ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | রাজা | রাজাণো, রাজা |
| ২য়া | রাজাণং | রাজাণো |
| ৩য়া | রঞ্‌ঞা, রাজেন | রঞ্‌ঞহি |
| ৪র্থী | রঞ্‌ঞো, রাজস্‌স | রঞ্‌ঞং |
| ৫মী | রঞ্‌ঞা, রাজস্মা | রঞ্‌ঞহি, রাজেভি |
| ৬ষ্ঠী | রঞ্‌ঞো, রাজস্‌স | রঞ্‌ঞং, রাজাণং |
| ৭মী | রঞ্‌ঞে, রাজস্মিং | রাজূসু, রাজেসু |
| আলাপণং | রাজ ( রাজা ) | রাজাণো ( রাজা ) |

### ॥ ইন্‌-ভাগান্ত বাদিন্‌ ( বাদি ) ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | বাদি | বাদি, বাদিণো |
| ২য়া | বাদিং, বাদিণং | বাদি, বাদিণো, বাদিণে |
| ৩য়া | বাদিণা | বাদিহি, বাদিভি |
| ৪র্থী | বাদিস্‌স, বাদিণো | বাদিণং |
| ৫মী | বাদিণা, বাদিস্‌মা, বাদিংহা | বাদিহি, বাদিভি |
| ৬ষ্ঠী | বাদিস্‌স, বাদিণো | বাদিণং |
| ৭মী | বাদিণি | বাদিসু, বাদিণেসু |
| আলাপণং | বাদি | বাদি, বাদিণো |

সমজাতীয় শব্দ : দণ্ডিণ, ভোগিণ, ভাগিণ্‌ ( আবৃত্তি কারক ), গুণিণ, মেধাবিণ্‌, বিস্‌সাসিন, হথিন্‌ ( হস্তী ) ইত্যাদি।

## স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য আকারান্ত পদ

### ॥ লতা ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | লতা | লতা, লতায়ো |
| ২য়া | লতাং | লতা, লতায়ো |
| ৩য়া | লতায় | লতাহি, লতাভি |
| ৪র্থী | লতায় | লতাণং |
| ৫মী | লতায় | লতাহি, লতাভি |
| ৬ষ্ঠী | লতায় | লতাণং |
| ৭মী | লতায়, লতায়ং | লতাসু |
| আলাপণং | লতে | লতা, লতায়ো |

বাহা, ভারিয়া ( ভার্যা ), কথা, পূজা পিপাসা—প্রভৃতি শব্দের রূপ লতা শব্দের মত।

## স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য ঈ-কারান্ত পদ

॥ দেবী ॥

| বিভক্তি | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | দেবী | দেবী, দেবিয়ো |
| ২য়া | দেবীং | দেবী, দেবিয়ো |
| ৩য়া | | দেবীহি, দেবীভি |
| ৪র্থী | দেবিয়া | দেবিণং |
| ৫মী | | দেবীহি, দেবীভি |
| ৬ষ্ঠী | | দেবীণং |
| ৭মী | দেবিয়া, দেবিয়ং | দেবীসু |
| আলাপণং | দেবি | দেবী, দেবিয়ো |

নদী, ভগিনী, ভিক্‌খুণী, তরুণী ইত্যাদি শব্দের রূপ দেবী শব্দের মত।

## স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য উ-কারান্ত পদ

॥ ধাতু ॥

| বিভক্তি | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | ধাতু | ধাতু, ধাতুয়ো |
| ২য়া | ধাতু | ধাতু, ধাতুয়ো |
| ৩য়া | | ধাতুহি, ধাতুভি |
| ৪র্থী | ধাতুয়া | ধাতুণং |
| ৫মী | | ধাতুহি, ধাতুভি |
| ৬ষ্ঠী | | ধাতুণং |
| ৭মী | ধাতুয়া, ধাতুয়ং | ধাতুসু |
| আলাপণং | ধাতু | ধাতু, ধাতুয়ো |

হণু, বেণু, রজ্জু, যাগু প্রভৃতি শব্দের রূপ ধাতু শব্দের মত।

## স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য ঊ-কারান্ত পদ

॥ বধূ ॥

| বিভক্তি | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | বধূ | বধূ, বধূয়ো |
| ২য়া | বধূং | বধূ, বধূয়ো |
| ৩য়া | | বধূহি, বধূভি |
| ৪র্থী | বধূয়া | বধূণং |
| ৫মী | | বধূহি, বধূভি |
| | | বধূণং |
| ৭মী | বধূয়া | বধূসু |
| আলাপণং | বধু | বধূ, বধুয়ো |

চমূ, জম্বু, সস্সূ প্রভৃতি শব্দের রূপ বধূ শব্দের মত

## স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য ব্যঞ্জনান্ত পদ

### ॥ মাতৃ ( মাতু ) ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | মাতা | মাতা, মাতরো |
| ২য়া | মাতারং | মাতারো |
| ৩য়া | মাতারা, মাতুয়া | মাতুহি, মাতুভি |
| ৪র্থী | মাতু, মাতুয়া | মাতুণং |
| ৫মী | মাতারা, মাতুয়া | মাতুহি, মাতুভি |
| ৬ষ্ঠী | মাতু, মাতুয়া | মাতুণং |
| ৭মী | মাতারি, মাতুয়া | মাতুসু |
| আলাপণং | মাত, মাতা | মাতা, মাতারো |

দুহিতু, ধিতু, ননন্দু ইত্যাদি শব্দের রূপ মাতৃ শব্দের মত।

## ক্লীবলিঙ্গ পদ

### ॥ বণ ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | বণং | বণানি |
| ২য়া | বণং | বণানি |
| ৩য়া | বণেণ | বণেহি, বণেভি |
| ৪র্থী | বণস্‌স, বণায় | বণাণং |
| ৫মী | বণা, বণস্মা, বণংহা | বণেহি, বণেভি |
| ৬ষ্ঠী | বণস্‌স | বণাণং |
| ৭মী | বণে, বণস্মিং, বণংহি | বণেসু |
| আলাপণং | বণ | বণানি |

আসন, উদক, আয়ুধ, দান ইত্যাদি শব্দের রূপ বণ শব্দের মত।

## সর্বনাম পদ

### ॥ অহং ( আমি ) ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | অহং | ময়ং, অংহে |
| ২য়া | মং | অংহে, নো |
| ৩য়া | ময়া, মে | অমেহি |
| ৪র্থী | মম, মমং, মজ্‌ঝং, মে | অংহাকং |
| ৫মী | ময়া, মে | অমেহি |
| ৬ষ্ঠী | মম, মমং, মজ্‌ঝং, মে | অংহাকং |
| ৭মী | ময়ি | অংহেসু |

## সর্বনাম শব্দ

॥ তুংহ ( তুমি ) ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | তং, তুবং | তুংহে |
| ২য়া | তং, তুবং | তুংহে, ভো |
| ৩য়া | তয়া | তুংহেহি |
| ৪র্থী | তব, তুজ্ঝং, তে | তুংহাকং |
| ৫মী | তয়া | তুংহেহি |
| ৬ষ্ঠী | তব, তুজ্ঝং, তে | তুংহাকং |
| ৭মী | তয়ি | তুংহেসু |

## সর্বনাম শব্দ

॥ স ( সে ) ॥

| | | |
|---|---|---|
| ১মা | সো | তে, নে |
| ২য়া | তং, নং | তে, নে |
| ৩য়া | তেণ | তেহি |
| ৪র্থী | তস্স | তেসং |
| ৫মী | তেণ | তেহি |
| ৬ষ্ঠী | তস্স | তেসং |
| ৭মী | তস্মিং | তেসু |

## সংখ্যা শব্দ

॥ এক ( Some, Certain—এই অর্থে ) ॥

| | একবচন | | বহুবচন | |
|---|---|---|---|---|
| | পুং | স্ত্রী | পুং | স্ত্রী |
| ১মা | একো | একা | একে | একা, একায়ো |
| ২য়া | একং | একং | একে | একা, একায়ো |
| ৩য়া | একেণ | একায় | একেহি | একেহি |
| ৪র্থী | একস্স | একিস্সা, একস্সা একায় | একেসং, একেসাণং, | একাসং একাসাণং |
| ৫মী | একস্মা, একংহা | একায় | একেহি | একাহি |
| ৬ষ্ঠী | একস্স | একিস্সা, একস্সা, একায় | একেসং, একেসাণং | একাসং, একাসাণং |
| ৭মী | একস্মিং, একংহি | একিস্সং, একস্সং একায়ং | একেসু | একাসু |

| | ॥ দ্বি ॥ | ॥ উভ ॥ | ॥ তি ॥ | (কেবল বহুবচন) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | বহুবচন | বহুবচন | পুং | স্ত্রী | ক্লীব |
| ১মা | দ্বে, দুবে | উভো, উভে | তয়ো | তিস্সো | তিণি |
| ২য়া | দ্বে, দুবে | উভো উভে | তয়ো | তিস্সো | তিণি |
| ৩য়া | দ্বিহি, দ্বিহি | উভোহি, উভেহি | তিহি | তিহি | তিহি |
| ৪র্থী | দ্বিণ্ণং, দুবিণ্ণং | উভিণ্ণং | তিণ্ণং | তিস্সণ্ণং | তিণ্ণং |
| ৫মী | দ্বিহি, দ্বিহি | উভোহি, উভেহি, | তিহি | তিহি | তিহি |
| ৬ষ্ঠী | দ্বিণ্ণং, দুবিণ্ণং | উভিণ্ণং | তিণ্ণং | তিস্সণ্ণং | তিণ্ণং |
| ৭মী | দ্বিসু, দুবেসু | উভোসু, উভেসু | তিসু | তিসু | তিসু |

| ॥ চতু (চার) ॥ | | | ॥ পঞ্চ (পাঁচ) ॥ |
|---|---|---|---|
| বহুবচন | | | বহুবচন |
| পুং | স্ত্রী | ক্লীব | পুং, স্ত্রী ও ক্লীব |
| চতুরো (চত্তারো) | চতস্সো | চত্তারি | পঞ্চ |
| চতুরো, চত্তারো | চতস্সো | চত্তারি | পঞ্চ |
| চতুহি, চতুব্ভি | চতুহি | চতুহি, চতুব্ভি | পঞ্চহি |
| চতুণ্ণং | চতস্সণ্ণং | চতুণ্ণং | পঞ্চণ্ণং |
| চতুহি, চতুব্ভি | চতুহি | চতুহি, চতুব্ভি | পঞ্চহি |
| চতুণ্ণং | চতস্সণ্ণং | চতুণ্ণং | পঞ্চণ্ণং |
| চতুণ্ণং | চতুস্সণ্ণং | চতুণ্ণং | পঞ্চণ্ণং |
| | | | পঞ্চসু |

সংখ্যাশব্দগুলির মধ্যে ছ, সত্ত, অট্ঠ, নব, দস এবং অন্যান্যগুলি পঞ্চ শব্দের মত রূপ হবে। অ-কারান্ত সংখ্যাশব্দ (তেরস, সোলস ইত্যাদি), আ-কারান্ত এবং ই-কারান্ত (বিসা, বিসতি অসিতি), শেষে ং-যুক্ত (সতং, সহস্সং ইত্যাদি)—এগুলিরও পঞ্চ শব্দের মত রূপ করা যাবে।

**পালি সংখ্যাশব্দ** ( Numerals ) ॥

একাদস, একারস; দ্বাদস, দুবাদস, বারস; তেরস, তেলস; চতুদ্দস, চুদ্দস, চোদ্দস; পঞ্চদস, পন্নরস; সোলস, সোরস; সত্তদস, সত্তরস; অট্ঠাদস, অট্ঠারস; একুণবিসতি; বিসতি, বিসা, বিসং; ইত্যাদি

তিংসতি; দুবাত্তিংস; চত্তাবিসা, চত্তালিসা (চল্লিশ); পঞ্ঞাসা, পণ্ণসা (পঞ্চাশ); সট্ঠি (ষাট); সত্ততি; অসিতি; নবুতি (নব্বই); সতং; দ্বিসতং (দুশো); সহস্সং; দসসহস্সং ইত্যাদি ॥

**পালি পূরণবাচক শব্দ** ( Ordinals ) ॥

পথমা, দুতিয়া, ততিয়া, চতুত্থ, পঞ্চমা; ছট্ঠ, ছত্তম, ছত্তা; সত্তমা; অট্ঠমা, নবম, দসম ইত্যাদি।

## ॥ বিশেষণ ও বিশেষণের তারতম্য ॥

সংস্কৃতে বলা হয়েছে 'বিশিষ্যতে অনেন ইতি বিশেষণম্'—সমজাতীয় পদার্থসমূহ থেকে যে পদ কোনো এক বা একাধিক পদকে বিশেষ করে দেয়, তাকে বলা হয় বিশেষণ। যদি বিশেষণ শব্দটির সাহায্যেই বিশেষ্যের বোধ জন্মানো সম্ভব হয় তবে বিশেষ্য পদটি না দিলেও হয় ( বিশেষণমাত্রপ্রয়োগো বিশেষ্যপ্রতিপত্তৌ )। যেমন, দরিদ্রাঃ দুঃখশতানি ভুঞ্জতে—এখানে 'দরিদ্রাঃ' অর্থ দরিদ্রাঃ জনাঃ। সংস্কৃতের বিধান অনুযায়ী বিশেষ্যপদের যে লিঙ্গ, বচন এবং বিভক্তি থাকবে, বিশেষণ পদটিতেও সেই লিঙ্গ, বচন এবং বিভক্তি যুক্ত হবে। ধার্মিকঃ পুরুষঃ ; উজ্জ্বলানি নক্ষত্রাণি ; গুণিনৌ নরৌ ; ইত্যাদি ॥

সংস্কৃতে শতৃ, শানচ্, ণক্, তৃচ্, তব্য অনীয়, ক্ত ইত্যাদি কৃৎপ্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যোগ করে বিশেষণপদ গঠন করা হয়। উদাহরণ, যথাক্রমে গচ্ছৎ, বর্তমান, ধাবক, কর্তৃ, দাতব্য, করণীয়, সম্পাদিত ইত্যাদি। আবার ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ইন্, মতুপ্, ময়ট্ ইত্যাদি তদ্ধিত প্রত্যয় বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষণপদ গঠিত হতে পারে। যেমন—সৌবর্ণম্, বার্হস্পত্যম্, মাসিকম্, বিনয়ী, যশস্বী, বুদ্ধিমান, তেজোময়ম্ ইত্যাদি ॥

পালিতে বিশেষণ পদ সংস্কৃতের মতই কৃৎ ( কিত ) প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়ে থাকে। যেমন, রুদমান, পিবমান, পচমান ( শতৃ-শানচ ); স্রুত, গীত, ঞাত ( ক্ত ); দাতব্য, পূজনীয়, পুজ্জ ( তব্য অনীয়, য ) ইত্যাদি। তবে সব সময় সংস্কৃতের মত বিশেষণপদ বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন বিভক্তি মেনে চলেনা। যেমন, রত্ত (রাত্রি) পুংলিঙ্গ ; রাত্তি স্ত্রীলিঙ্গ ; রত্তং ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু এদের বিশেষণ পদগুলি সর্বত্র বিশেষ্যের লিঙ্গ বিভক্তি মেনে চলেনি। যেমন, 'নকখত্ত মালিনী রাত্তি' যেমন আছে তেমনি আছে দিগ্ঘ রত্তং ( হওয়া উচিত দিগ্ঘং রত্তং, কারণ রত্তং ক্লীবলিঙ্গ )। পালি-প্রাকৃতে দ্বিবচন লুপ্ত বলে সংস্কৃতের মত বিশেষণের দ্বিবচনের রূপ পালিতে পাওয়া যাবেনা। গুণিনৌ নরৌ পালি-প্রাকৃতে হবে গুণয়ো নরা ॥

দুই বস্তু বা ভাবের মধ্যে একটির শ্রেষ্ঠতা বা অপকর্ষতা বোঝাতে সংস্কৃতে তর, তম, ঈয়স্, ইষ্ঠ প্রত্যয় যোগ হয়। যেমন, দৃঢ়—দ্রঢীয়স্—দ্রঢ়িষ্ঠ ; দৃঢ়—দৃঢ়তর—দৃঢ়তম ইত্যাদি। পালিতে বিশেষণের এই Positive, Comparative এবং Superlative degree বোঝাতে ব্যবহৃত হয় :—

(১) **ইয়, ইথ :**—যেমন পাপ, পাপিয়া—পাপিয়—পাপিথ ; লঘু—লঘিয়—লঘিথ ; কণ—কণিয়—কণিথ ( কনিষ্ঠ ) ইত্যাদি।

(২) **তর, তম :**—যেমন, অধিক—অধিকতর—অধিকতম ; দীঘ—দীঘতর—দীঘতম ; খিপ্প ( ক্ষিপ্র )—খিপ্পতর—খিপ্পতম ; উচ্চ—উচ্চতর—উচ্চতম ; ইত্যাদি।

(৩) **কখনও কখনও তর, তম সংক্ষিপ্ত হয়ে কেবল -র, -ম** ; যেমন, অধ ( নীচু )—অধর—অধম ; অভ ( inferior )—ওর—ওম।

(৪) **নিয়মবিহীন :**—যেমন—সিরি—সেয়্যো—সেট্‌ঠ ; বুদ্ধ—জেয়—জেট্‌ঠ ; সাধিক—সাধিও—সাধিও ইত্যাদি।

**কতকগুলি বিশেষণ এবং তাদের বিপরীত শব্দ :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| অগ্‌গ ( অগ্র ) | মূল ; | অজ্‌ঝত্ত | বাহির |
| অঙ্গ ( আপন ) | পর ; | অনু | থূল |
| অণুলোম | পতিলোম ; | আরাধনা | বিরাধনা |
| আসন্ন | দূর ; | উক্কমস | অব্‌কংস |
| এদিস ( এইরকম ) | অঞ্‌ঞদিস ; | গম্ভীর | উত্তানো |
| পসারিত ( প্রসারিত ) | সম্মিঞ্‌জিত ; | মণুষক | দিব্‌ব |
| বজ্জন | সেবন ; | মুসা ( মিথ্যা ) | সচ্চ |
| সাফল্‌ল | বেকল্‌ল ; | সায়ং | পাত |
| সমারিত | দোসারিত ; | সম্মুখা | পরোক্‌খা |

———

## ॥ পালি ধাতুরূপ ॥

ক্রিয়াবাচক প্রকৃতিকে বলে ধাতু। সংস্কৃতে এই ধাতুরূপ বা Conjugation of Verbs অত্যন্ত জটিল। সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর দশটি বিভক্তি যুক্ত হয়—যেমন লট্, লোট, লঙ, বিধিলিঙ, আশীর্লিঙ, ল্‌ট্, লুট্, লিট্, লুঙ। পাণিনির মতে লকার দশটি। তার মধ্যে লোট্ শুধু বৈদিকে ব্যবহৃত হয়। বাকি নটির মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিঙ-কে দুভাগে ভাগ করেছেন—বিধিলিঙ ও আশীর্লিঙ। এই বিধিলিঙ শব্দটিতেও আবার শুধু বিধি বোঝায় না ; প্রশ্ন, সম্ভাবনা অনেক কিছু এতে বোঝায়। বিভক্তির আবার তিনটি পুরুষ—প্রথম, মধ্যম, উত্তম। এক এক পুরুষে বিভক্তির আবার তিনটে করে বচন—একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। এখানেই জটিলতার শেষ নয়। বিভক্তিগুলিও আবার আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ দুই ভাগে বিভক্ত। আত্মনেপদ নয়টি ও পরস্মৈপদে নয়টি—মোট আঠারোটি আকার। সুতরাং পরস্মৈপদে নব্বইটি এবং আত্মনেপদীতে নব্বই—মোট একশ আশীটি বিভক্তির সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকলে তবে সংস্কৃত ধাতুরূপ সঠিকভাবে আয়ত্ত করা যেতে পারবে ॥

ক্রিয়া পদগুলি সংস্কৃতে দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক একটা শ্রেণীকে বলে 'গণ'। তুদাদি, ভ্বাদি, দিবাদি, স্বাদি, ক্র্যাদি, তনাদি, রুধাদি, অদাদি, হ্বাদি, চুরাদি—এই দশটি গণ। এর পরেও আবার ক্রিয়ার বাচ্য আছে। সংস্কৃতে তিনটি মূল বাচ্য—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য। এদেরও আবার শাখা আছে, যেমন কর্মকর্তৃবাচ্য ॥

পালিতে ধাতুরূপে এত সব জটিলতা নেই। সংস্কৃতের মত পালিতে **পরস্‌সপদ** ( পরস্মৈপদ ) এবং **অত্তানোপদ** ( আত্মনেপদ ) এই দুই রকমই ধাতুরূপ দেখতে পাওয়া যায় ॥

ভাববাচ্য এবং কর্মবাচ্য দুই রূপেই অত্তানোপদ রূপের প্রত্যয়গুলি সংযুক্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার অত্তানোপদ প্রত্যয়ের জায়গায় পরস্‌সপদ প্রত্যয় বা বিভক্তিও বসতে দেখা যায় ॥

পালি ধাতুরূপে দ্বিবচন নেই—একবচন ও বহুবচন—এই দুটিমাত্র রূপ আছে ॥

পালিতে সংস্কৃতের মত তিনটে পুরুষ—উত্তমো পুরিস, মজ্‌ঝিমো পুরিস এবং পথমা পুরিস ॥

পালিতে বাচ্য তিনটি—কত্তরি (কর্তৃবাচ্য), কম্ম (কর্মবাচ্য বা Passive Voice) এবং ভাবে বা ভাববাচ্য ( Absolute voice )। কত্তরি বাচ্যে কর্তা কর্তৃকারক, কর্ম

দ্বিতীয়া, ক্রিয়া কর্তার অনুগামী এবং ক্রিয়ার সঙ্গে পরস্সপদ প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হয়॥

কম্মবাচ্যে কর্তা করণকারক কর্ম কর্তৃকারক, ক্রিয়া কর্মের অনুগামী এবং ক্রিয়ার সঙ্গে অত্তানোপদ বিভক্তি প্রত্যয় এবং ক্রিয়ারূপে ধাতুমূলের সঙ্গে 'য়া' যুক্ত হয়। ভাবে বা ভাববাচ্যে কর্তা করণকারক, কর্ম নেই, ক্রিয়া সর্বদা কর্মবাচ্যের প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ গ্রহণ করবে। যেমন:

কর্তৃবাচ্য বা কত্তরি—দারক চন্দং পস্সতি।

কর্মবাচ্য বা কম্ম—দারকেন চন্দ দিস্সতে বা দিস্সতি।

ভাববাচ্যে—ময়া সুয্যতে বা সুয্যতি।

পালিতে মোটামুটি **কাল** ( tense ) তিনটি—বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ।

অতীতের তিনটি ভাগ: **পরোক্খ** ( Past Perfect ) সং. লিট্; **হিয্যত্তনী** ( Past Imperfect ) সং. লঙ; **অয্যতনী** ( Aorist ) বক্তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে বর্তমানের পূর্বে ঘটিত ঘটনা, সং. লুঙ॥

ভবিষ্যতের একটি ভাগ— **কালাতিপত্তি**, অর্থাৎ অতীতে সুরু হয়েছে এমন ঘটনার অসম্পূর্ণতা বোঝাতে ( conditional ) সং. লুঙ্॥

পালিতে ভাব বা mood তিনটি—ঘটনাপ্রকাশক (Indicative ), অনুজ্ঞাবোধক ( Imperative ), ইচ্ছাপ্রকাশক ( Optative )॥

সমস্ত জিনিসটি গুটিয়ে আনলে দেখা যাচ্ছে, পালিতে ধাতুরূপ দুই রকম (অত্তানোপদ, পরস্সপদ ); পুরুষ তিনটি ; বচন দুটি ; কাল ছ'টি ( বত্তমান. পরোক্খ, হিয্যত্তনী, অয্যতনী, ভবিস্সন্তী, কালাতিপত্তি ) ; বাচ্য তিনটি ; ভাব বা mood তিনটি॥

ক্রিয়াপদগুলি পালিতে ভূবদি, রুধদি, দিবদি, সদি, কিয়দি, তনদি এবং চুরদি—এই সাতটি গণে ভাগ করা হয়েছে॥

এইবার সমস্ত কালগুলির উদাহরণ দিয়ে আমাদের এই অধ্যায় সমাপ্ত হবে।

**বত্তমান** ( সংস্কৃত লট্, Present Indicative )—বর্তমানের সাধারণের ঘটনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন সুখং ভবতি, হত্থী গচ্ছতি, বালক জীবতি॥

**পঞ্চমী** (সংস্কৃত লোট্, Imperative )—আদেশ, আশীর্বাদ, প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে। যেমন—সুখং ভবতু, থের গচ্ছতু, বালক জীবতু॥

**সত্তমী** ( সংস্কৃত বিধিলিঙ, Optative ) ইচ্ছা প্রকাশ করতে—সুখং ভবেয় ( সুখ হোক এই আমার ইচ্ছা ), থের গচ্ছেয়, বালক জেয়েয়॥

**পরোক্খ** ( সংস্কৃত লিট্, Past Perfect ) সাধারণ অতীত কাল বোঝাতে। যেমন—বভূব, জগাম, আহ। তবে পালিতে এই কালটির ব্যবহার কম।

**হিয্যত্তনী** ( সংস্কৃত লঙ্, Past Imperfect )—গতকালের পূর্বে সংঘটিত কোনো কাল বোঝাতে। সেই ঘটনাটি বক্তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঘটেছে, এমন বোঝাতে হবে। যেমন, অভবা ( হল ), অগমা ( গেল ), অদ্দসা ( দেখল ) ইত্যাদি॥

**অয্যত্তনী** ( সংস্কৃত লুঙ্, Aorist ) আজকের পূর্বে বক্তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সংঘটিত কোনো ঘটনার কাল বোঝাতে—যেমন—অভবি, অগমি, অসোসি।

এই রূপটি দুভাবে গঠিত করা যায়:

(ক) ধাতুমূলের সঙ্গে সোজাসুজি কোনো প্রত্যয় যোগ করে—যেমন, √খাদ্+ই=খাদি, অতীতে অখাদি। তেমনি, √ভূ+ই=ভবি, অতীতে অভবি।

(খ) দীর্ঘস্বরান্ত পদের মধ্যে "স' যোগ করে। যেমন, √দা+স+ই=দাসি, অতীতে অদাসি বা অদাসিং।

**ভবিস্সন্তি** ( সংস্কৃত লৃট, Future Indefinite ) এখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে, তেমন ঘটনা বোঝাতে। যেমন—গমিস্সতি, ভবিস্সতি, বদিস্সতি ইত্যাদি।

**কালাতিপত্তি**—(সংস্কৃত লৃঙ, Conditional Future ) অতীতে কোনো ঘটনা সুরু হয়েছে, তার অসম্পূর্ণতা বোঝাতে এই কালের ব্যবহার। যেমন—অভবিস্স, অগমিস্স ইত্যাদি॥

## ॥ পালির ধাতুরূপের নমুনা ॥

পালিতে ভূবদি, রুধদি, দিবদি, স্দি, কিয়দি, তনদি এবং চুরদি এই সাতটি গণে ক্রিয়াপদগুলিকে ভাগ করা হয়েছে ॥

আত্মনেপদীর প্রয়োগ কম, পরস্মৈপদ প্রয়োগ বেশি। তবে পালিতে সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতুগুলি প্রায়ই পরস্মৈপদী এবং পরস্মৈপদী ধাতুগুলি কখনও কখনও আত্মনেপদে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন, সং√মৃ=মরতি; √ভূ=ভবতে, √মন্=মঞ্‌ঞতে ॥

### √ভূ

| | পরস্সপদ | | অত্তানোপদ | |
|---|---|---|---|---|
| | **॥ বত্তমানা ॥** | | | |
| | একবচন | বহুবচন | একবচন | বহুবচন |
| প্রথম পুরুষ | ভবতি (হোতি) | ভবন্তি (হোন্তি) | ভবতে | ভবন্তে |
| মধ্যম পুরুষ | ভবতি (হোসি) | ভবথ (হোথ) | ভবসে | ভববেহ |
| উত্তম পুরুষ | ভবামি (হোমি) | ভবাম (হোম) | ভবে | ভবমেহ |
| | **॥ পঞ্‌চমী (লোট্) ॥** | | | |
| প্রথম পুরুষ | ভবতু (হোতু) | ভবন্তু (হোন্তু) | ভবতং | ভবন্তুং |
| মধ্যম পুরুষ | ভব, ভবাহি (হোহি) | ভবথ (হোথ) | ভবস্সু | ভববেহা |
| উত্তম পুরুষ | ভবামি (হোমি) | ভবাম (হোম) | ভবে | ভবামসে |
| | **॥ সত্তমী (বিধিলিঙ) ॥** | | | |
| | একবচন | বহুবচন | একবচন | বহুবচন |
| প্রথম পুরুষ | ভবেয্য, ভবে (হেয্য) | ভবেয্যুং (হেয্যুং) | ভবেথ | ভবেয়ং |
| মধ্যম পুরুষ | ভবেয্যাসি, ভবে (হেয্যাসি) | ভবেয্যাথ (হেযযাথ) | ভবেথো | ভবেয্যাবেহ |
| উত্তম পুরুষ | ভবেয্যামি, ভবে (হেয্যামি) | ভবেয্যাম (হেয্যাম) | ভবেয্যং ভবে | ভবেয্যামেহ |

॥ পরোক্খা ( লিট্ ) ॥

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ বভূব | বভূব | বভূবিথ | বভূবিরে |
| মধ্যম পুরুষ বভূবে | বভূবিথ | বভূবিথো | বভূবিবেহ্য |
| উত্তম পুরুষ বভূব | বভূবংহ | বভূবি | বভূবিমেহ |

॥ ভবিস্সন্তি ( ল্ট্ ) ॥

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ ভবিস্সতি ( হেতি] | ভবিস্সন্তি ( হোন্তি ) | ভবিস্সতে | ভবিস্সন্তে |
| মধ্যম পুরুষ ভবিস্সসি (হেসি) | ভবিস্সথ ( হেথ ) | ভবিস্সসে | ভবিস্সবেহ |
| উত্তম পুরুষ ভবিস্সামি ( হেমি) | ভবিস্সাম ( হেমি ) | ভবিস্সং | ভবিস্সামেহ |

॥ কালাতিপত্তি ( ল্ঙ ) ॥

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ অভবিস্সা | অভবিস্সংসু | অভবিস্সথ | অভবিস্সিংসু |
| মধ্যম পুরুষ অভবিস্সে | অভবিস্সথ | অভবিস্সে | অভবিস্সবেহ |
| উত্তম পুরুষ অভবিস্সং | অভবিস্সংহা | অভবিস্সং | অভবিস্সাংহসে |

॥ হিয্যত্তনী ( লঙ ) ॥

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ অভবা ( অহুবা ) | অভবু ( অহুব ) | অভবথ | অভবথুং |
| মধ্যম পুরুষ অভবো (অহুবো) | অভবথ ( অহুবথ ) | অভবসে | অভববহং |
| উত্তম পুরুষ অভব ( অহুবং ) | অভবংহা ( অহুবংহা ) | অভবিং | অভবমহসে |

॥ অয্যত্তনী ( লুঙ ) ॥

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ অভবি (অহোসি) | অভবুং ( অহেসুং ) | অভবা | অভবু |
| মধ্যম পুরুষ অভবো (অহোসি) | অভবিথ ( অহোসিথ) | অভবিসে | অভবিবেহ |
| উত্তম পুরুষ অভবিং (অহোসিং) | অভবিংহা (অহোসিংহ) | অভব | অভবিমেহ |

পরস্সপদ

√হন্          √গম্

॥ বত্তমানা ( লট্ )

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ হনতি, হন্তি | হনন্তি | গচ্ছতি, গমেতি | গচ্ছন্তি, গমেন্তি |
| মধ্যম পুরুষ হনসি | হনথ | গচ্ছসি, গমেসি | গচ্ছথ, গমেথ |
| উত্তম পুরুষ হনামি | হনাম | গচ্ছামি, গমামি | গচ্ছাম, গমাম |

॥ পঞ্চমী ( লোট ) ॥

| | একবচন | বহুবচন | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ | হনতু | হোন্তু | গচ্ছতু, গমেতু | গচ্ছন্তু, গমেন্তু |
| মধ্যম পুরুষ | হনহি | হনথ | গচ্ছহি, গমেহি | গচ্ছথ, গমেথ |
| উত্তম পুরুষ | হনামি | হনম | গচ্ছামি, গমামি | গচ্ছাম |

॥ সত্তমী ( বিধিলিঙ ) ॥

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ | হনেয্য | হনেয্যুং | গচ্ছেয্য | গচ্ছেয্যুং |
| মধ্যম পুরুষ | হনেয্যাসি | হনেয্যাথ | গচ্ছেয্যাসি | গচ্ছেয্যাথ |
| উত্তম পুরুষ | হনেয্যামি | হনেয্যাম | গচ্ছেয্যামি | গচ্ছেযযাম্ |

॥ পরোক্খ ( লিট্ ) ॥

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ | হন | হনউ | জগম | জগমু |
| মধ্যম পুরুষ | হনে | হনত্থ | জগমে | জগমিত্থ |
| উত্তম পুরুষ | হন | হনংহ | জগম | জগমিংহ |

॥ ভবিস্সন্তি ( লৃট্ ) ॥

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ | হনস্সতি | হনস্সন্তি | গচ্ছিস্সতি | গচ্ছিস্সন্তি |
| মধ্যম পুরুষ | হনস্সসি | হনস্সথ | গচ্ছিস্সসি | গচ্ছিস্সসি |
| উত্তম পুরুষ | হনস্সামি | হনস্সাম | গচ্ছিস্সামি | গচ্ছিস্সাম |

॥ কালাতিপত্তি ( লৃঙ ) ॥

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ | অহনিস্সা | অহনিস্সংসু | অগচ্ছিস্সা | অগচ্ছিস্সংসু |
| মধ্যম পুরুষ | অহনিস্সে | অহনিস্সথ | অগচ্ছিস্সে | অগচ্ছিস্সথ |
| উত্তম পুরুষ | অহনিস্সং | অহনিস্সংহা | অগচ্ছিস্সং | অগচ্ছিস্সংহা |

॥ হিয্যত্তনী ( লঙ ) ॥

| | একবচন | বহুবচন | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ | অহনা | অহনূ | অগচ্ছা | অগচ্ছু |
| মধ্যম পুরুষ | অহনো | অহনত্থ | অগচ্ছো | অগচ্ছত্থ |
| উত্তম পুরুষ | অহন | অহনংহা | অগমা | অগমু |

॥ অয্যত্তনী ( লুঙ ) ॥

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পুরুষ | অহনী | অহনুং | অগচ্ছি | অগচ্ছুং |
| মধ্যম পুরুষ | অহনো | অহনিত্থ | অগচ্ছো | অগচ্ছিত্থ |
| উত্তম পুরুষ | অহনিং | অহনিংহা | অগচ্ছিং | অগচ্ছিংহা |

## ॥ পালিতে প্রত্যয় ॥

পালিতে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রত্যয়ান্ত শব্দ গঠিত হয়। এই প্রত্যয়কে পালিতে বলা হয় কিত ॥

কিত-র অন্তর্গত : বিশেষণ ও ক্রিয়া এই উভয় পদযুক্ত শব্দ ( Participle ), অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ (Infinitives), ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ ( Gerund )।

সংস্কৃতে যেটা শতৃ, শানচ্ প্রত্যয় ( Present Participle ) পালিতে তা নিম্নলিখিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়—

ং-যোগে : √কর্+ং=করং ; রুদং, পিবং, গচ্ছং, পচং ইত্যাদি।
**অন্ত**-যোগে : √কর্+অন্ত=করন্ত ; রুদন্ত, পিবন্ত, গচ্ছন্ত, পচন্ত।
**মান**-যোগে : √কর্+মান=করমান ; রুদমান, পিবমান, পচমান।
**বান**-যোগে : √কর্+বান=করবান ; রুদবান ইত্যাদি ॥

সংস্কৃতের নিষ্ঠা প্রত্যয় ( Past Participle ) পালিতে তিন রকম ভাবে গঠিত হয়—

**ত**-যোগে : √ভুজ্+ত=ভুত্ত, সুত ( শ্রুত ) ; গীত, ঞাত ( জ্ঞাত )।
**তবা**-যোগে : √বস্+তবা=বুসিতবা ; √ভুজ্+তবা=ভুত্তবা।
**তাবী**-যোগে : √সু (শোনা)+তাবী=সুতাবী ; √ভুজ্+তাবী=ভুত্তাবী।

সংস্কৃতের স্যতৃ ও স্যমান ( Future Participle ) পালিতে গঠিত হয় তিন ভাবে—

**তব্ব**-যোগে : √দা+তব্ব=দাতব্ব ; সুতব্ব, ভবিতব্ব ইত্যাদি।
**অনীয়**-যোগে : √দা+অনীয়=দানীয় ; পূজনীয়, চিন্তনীয় ইত্যাদি।
**য**-যোগে : √দা+য=দেয় ; পূজ্জ, চিন্তেয় ॥

সংস্কৃতের তুমুন্ ( Infinitive mood ) পালিতে গঠিত হয় চার ভাবে—

**তুং**-যোগে : √দা+তুং=দাতুং ; খাতুং, সোতুং ( শুনিয়া ), নেতুং
**তবে**-যোগে : √দা+তবে=দাতবে ; খাতবে, সুতবে ইত্যাদি।
**তুয়ে**-যোগে : √মর্+তুয়ে=মরিতুয়ে ; গণেতুয়ে।
**তায়ে**-যোগে : √খাদ্+তায়ে=খাদিতায়ে ; পুচ্ছিতায়ে ॥

সংস্কৃতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদের ( Gerund ) উত্তর ণ্মুল প্রত্যয় হয়।
পালিতে Gerund বোঝাতে হয় চারটি প্রত্যয়—

**ত্বা**-যোগে : √ঞা+ত্বা=ঞাত্বা ; জেত্বা, হিত্বা, সুত্বা, পীত্বা।
**ত্বান**-যোগে : √সু+ত্বান=সুত্বান ; জেত্বান, গন্ত্বান ইত্যাদি।
**তুনা**-যোগে : √গম্+তুনা=গন্তুনা ; সোতুনা, খাতুনা ইত্যাদি।
**য়**-যোগে : √কর্+য়=করিয় ; পস্সিয়, মুঞ্চিয় ইত্যাদি ॥

## ॥ পালিতে সাধিত ধাতু (Derivative Verb) ॥

পালিতে সংস্কৃতের অনুকরণে ণিজন্ত, যঙন্ত, সন্নন্ত, নামধাতু, কর্মভাববাচ্যের ধাতু ইত্যাদি গঠিত হয় এইভাবে :

**কর্মভাববাচ্যের ধাতু** (Passive verb) : পালিতে কর্মভাববাচ্যের ধাতু গঠিত হয় 'ইয়' প্রত্যয় যোগে। ধাতুমূলে সোজাসুজি 'ইয়' প্রত্যয় যোগ হয় ব্যঞ্জনান্ত ধাতুমূলে, আর যে সব ধাতুর মূলে অ, আ, ই আছে, সেখানে সেগুলি ঈ-তে পরিণত হয়। সময় সময় ব্যঞ্জনান্ত ধাতুমূলেও ঈ-যোগ হয়। যেমন,—√দা+ইয়+তি=দিয়তে, দিজ্‌জতে। √জি+ইয়+তি—জীয়তি, জীয্যতি। √স্থু+ইয়+তি=স্থুয়তি, স্থুয়তে। √হন্+ইয়+তে=হঞ্ঞতে, হঞ্ঞতি। কর্মভাববাচ্যের ধাতু সর্বদা অত্তানোপদ বিভক্তি যোগে গঠিত হয়। কখনও কখনও পরস্‌সপদ বিভক্তিও নির্বিচারে যুক্ত হয়।

**ণিজন্ত ধাতু** ( Causative ) : গঠিত হয় ধাতুমূলে অয় এবং আপয় যোগে। কখনও কখনও অয়>এ ; আপয়>আপে। যেমন, √গম্+অয়+তি=গময়তি, গমেতি ( যাওয়ায় )। √পচ্+অয়+তি=পাচয়তি, পাচেতি ( রান্না করায় )। √হা+আপয়+তি=হাপয়তি, হাপেতি ( হারায় ), √ঞা+আপয়+তি= ঞাপয়তি, ঞাপেতি ( জানায় )॥

**নামধাতু** ( Denominative ) : বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে—আয়, ইয়, ঈয়, এবং এ-যোগে গঠিত হয়।

যেমন, ধুম+আয়+তি=ধুমায়তি ( ধোঁয়ায় ); পরবতায়তি (পাহাড়ের মত কাজ করে ); পুত্তায়ত্তি ( পুত্রের মত আচরণ করে ); চিরায়তি ( দেরী করে ); বিবাদ+ইয়+তি=বিবাদিয়তি ( ঝগড়া করে ); বিথারিয়তি ( বিস্তার করে ); ছত্তীয়তি ( ছাতার মত কাজ করে ); সমাধানেতি ( সমাধান করে ); সংগ্রাম> সংগামেতি ইত্যাদি।

**সন্নন্ত ধাতু** ( Desiderative ) : ইচ্ছা প্রকাশ করতে। ধাতুমূলের শেষ বর্ণটি স, চ, খ, এবং চ্ছ, কৃখ তে পরিবর্তিত হয়। যেমন, √জি+স+তি=জিগিংসতি ; জিগীসতি ( জয় করতে চায় )। আবার, দা>দিচ্ছতি, তিজ>তিতিকৃখতি, ( বহন করতে, সহ্য করতে চায় )।

**যঙন্ত ধাতু** ( Frequentive ) : পালিতে যঙন্ত ধাতু অব্‌ভাসা ( Reduplication ) দ্বারাই সম্পন্ন হয়। √গম্>জংগমতি। √কম্>চঞ্কমতি। √হস>জগ্ঘতি।

## ॥ পালিতে বিভত্তি ( বিভক্তি ) প্রয়োগ ॥

**কত্তরি কারকের বিভত্তি ঃ**

কর্তায় প্রথমা : **অহং** তং জানামি। **বালক** অম্বং ( আম ) খাদতি।

কর্মে প্রথমা : বালকেন **ওদন** ( অন্ন ) পচ্‌চতে।

নামাদি যোগে ঃ অসোক **নাম** রাজা অহোসি।

**কম্মকারকের বিভত্তি ঃ**

কর্মে দ্বিতীয়া : পুরিসো **গেহং** গচ্ছতি।

কাল এবং দূরত্ব অর্থে ঃ সিস্‌স **মাসং** পঠতি। পুরিসো **যোজনং** গচ্ছতি।

কর্মপ্রবচনীয় যোগে : অনু **সারিপুত্তং** পঞ্‌ঞবা। সো ভিকৃখু সংঘং অনু **পঞ্‌চাহং**।

গতি বুদ্ধি ভুজ ইত্যাদি বোঝাতে ঃ রাজা **পুত্তং** নগরং গময়তি। আচারিয়ে **সিস্‌সং** ধম্মং বোধেতি। মাতা **পুত্তং** ভোজনং ভোজেতি।

অন্তরা, নিস্‌সায়, পতি প্রভৃতি অব্যয় যোগে : ভিকৃখু **রাজগহং** নিসায় ( নিকটে ) বেণুবনে বিহরি। '**নদিং নেরাঞ্জরং** পতি বোধিরুকৃখমূলে ভগবা নিসীদি।'

**করণকারক ঃ**

করণে ৩য়া : বালক **চকৃখুনা** রূপং পস্‌সতি।

কর্তায় ৩য়া : এবং **ময়া** সুতম্।

বিশেষণে ৩য়া : বুদ্ধো **জাতিয়া** খত্তিয়।

অঙ্গবিকারে ৩য়া বালক **সোতেন** ( শ্রুতেন ) বধির।

সহ, বিনা, অলং যোগে সিহ বিনা **মাংসেন** ন ভুঞ্‌জতি। **পিতরা** সহ পুত্ত গচ্ছতি। **বিবাদেন** অলং।

হেতু অর্থে ৩য়া : কেন **অথেন** ইধগাতো।

অপাদানে ৩য়া : 'পথব্যা **একরজ্জেন** সোতাপত্তিফলং বরং।'

অধিকরণে ৩য়া : 'এত্তকেন **কালেন** ইমং পঞ্‌হং চিন্তেথ।'

সম্প্রদানে— ধনং **ভিকৃখুস্‌সো** দেহি।

নিমিত্তার্থে— বোধিসত্ত **হিতসুখতায় জাতো**।

অলং-যোগে— **বিবাদায়** অলং।

কর্মে ৪র্থী—'**ভিক্‌খুনং** দূতং পাহেসী।'

অধিকরণে ৪র্থী—'**তস্‌স** ফাসু হোতি।'

**অপাদান বিভক্তি ঃ**

অপাদানে ৫মী : রাজা **গেহা** নিক্‌খমতি।

হেতু অর্থে ৫মী : **কস্‌মা** ভীত ( কিসের থেকে ভীত )।

করণে ৫মী : **সতস্‌মা** বদ্‌ধ নরো। সে বচনা চ পন ভগবত সা আরোগা অহোসি।

**ছট্‌ঠী বিভক্তি :**

নির্ধারণে ষষ্ঠী : **মনুস্‌সানং** খত্তিয় সূরতম।

অনাদরে ষষ্ঠী রুদতো **দারকস্‌স** মাতা গেহা নিক্‌খমি।

করণে ষষ্ঠী **গন্ধতেলস্‌স** পূরিতো।

ভাবে ষষ্ঠী **দেবস্‌স** বস্‌সতো তে গেহং অগমিংসু।

অপাদানে ষষ্ঠী **কস্‌স** ভীত।

**সপ্তমী বিভক্তি**

স্থানাধিকরণে **অরঞ্‌ঞে** সিহ বিচরতি।

কালাধিকরণে রাজা পুব্‌বংহ **সময়ে** গেহং গচ্ছতি।

নিমিত্ত অর্থে কুঞ্জরো **দন্তেসু** ( দাঁতের জন্য ) হঞ্‌ঞতে।

## ।। পালিতে অব্যয় ।।

পালিতে অব্যয়ের ( Indeclinables ) মূলভাগ দুটি : উপসগ্‌গ, নিপাট ॥
**উপসগ্‌গ** ( সংস্কৃত উপসর্গ ) কুড়িটি :—প, পরা, অপ্‌, সং; অব্‌ অনু, নী; দু, বি, অধি, সু; উ, পরি, পতি, অভি; অতি, অপি, উপ, আ।

**নিপাট** পাদপূরণ বা অর্থপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, অদ্ধা ( Really ), অম্ভো ( Hallo ), হন্দ ( Well then ), খলু ( খো ) ( Surely ) ইত্যাদি ॥

## ।। পালিভাষায় সমাস ।।

পালিতে ছয়রকম সমাস আছে। তপ্‌পুরিস ( তৎপুরুষ ), অব্যয়ীভাব, কম্মধারয় ( কর্মধারয় ), দিগু ( দ্বিগু ), বহুব্বীহি ( বহুব্রীহি ), দন্দ ( দ্বন্দ্ব ) ॥

**তপ্‌পুরিস ঃ** সংস্কৃতের মতই ব্যাসবাক্যে পূর্বপদে বিভক্তি থাকবে, সমাসবদ্ধ হওয়ার পর বিভক্তি লোপ পাবে ও পরপদেরই প্রাধান্য বজায় থাকবে।

ছয়রকমের তপ্‌পুরিস আছে।

দুতিয়া তপ্‌পুরিস = ভূমিং গত = ভূমিগত। সবণগত, সুখপ্‌পত্তো।

তুতিয়া তপ্‌পুরিস = সল্লেন বিদ্ধ = সল্লবিদ্ধ। একুণ, ভয়তজ্জিতো।

চতুত্থী তপ্‌পুরিস = সংঘস্‌স দানং = সংঘদানং। ব্রাহ্মণদানং।

পঞ্চমী তপ্‌পুরিস = বন্ধনো মুত্ত = বন্ধোনোমুত্ত। চোরভয়ং নগরাগত।

ছট্‌ঠী তপ্‌পুরিস = বুদ্ধস্‌স পূজা = বুদ্ধপূজা। নদীতীরং, হংসরাজা।

সত্তমী তপ্‌পুরিস = ধম্মে রুচি = ধম্মরুচি। সংসারদুক্‌খং।

**অব্যয়ীভাব ঃ** সমাসবদ্ধ হওয়ার পর পূর্বপদে অব্যয় বসে।

অত্তম পতি—পচ্ছতম। অক্‌খিং পতি = পরোক্‌খং ॥

**কম্মধারয় ঃ** বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষ্যপদ, বিশেষ্যপদের সঙ্গে বিশেষণপদ, মিলিত হয়ে কম্মধারয় সমাস হয়। এ ছাড়াও সংস্কৃতের মত পালিতেও উপমান কম্মধারয়, সম্ভাবনা কম্মধারয়, অবধারণ ( রূপক ) কম্মধারয়, নঞ কম্মধারয় ইত্যাদিও আছে।

পূর্বপদ বিশেষণ পরপদ বিশেষ্য—পক্ক ওদন = পক্কোদন।

পূর্বপদ বিশেষ্য পরপদ বিশেষণ—সারিপুত্ত থের = সারিপুত্তোথের।

পূর্বপদ বিশেষণ পরপদ বিশেষণ—পক্কং চ অপক্কং চ = পক্কাপক্কং।

পূর্বপদ বিশেষ্য পরপদ বিশেষ্য—হত্থং চ পদং চ = হত্থপদং।

উপমান কম্মধারয়—মুনি সিহ ইব = মুনিসিহ।

সম্ভাবনা কম্মধারয়—ধম্ম তি বুদ্ধি = ধম্মোবুদ্ধি।

অবধারণ ( রূপক ) কম্মধারয়—গুণো এব ধনং = গুণধনং।

নঞ কম্মধারয়—ন আরিয়—অনারিয় ( অনার্য ) ॥

**দ্বিগু সমাস** পালিতে দুই রকম।

(ক) সমাহার : তিন্নং লোকানাং সমাহারো = তিলোকং।

(খ) অসমাহার : তিয়ো ভাবা = তিভাবা। তেমনি, চতুদ্দিসা, তিলোকা।

**বহুব্বীহি সমাস** পালিতে ছয় ভাগে বিভক্ত।

তুল্যাধিকরণ : ছিন্ন হত্থা যস্‌স সো = ছিন্নহত্থা।

জিতানি ইন্দিয়ানি যস্‌স সো—জিতিন্দয়।

দ্বিপদে : দণ্ডং পানিংহি যস্‌স সো—দণ্ডপানি।

উপমান : সুবণ্ণস্‌স ইব বণ্ণ যস্‌স সো = সুবণ্ণবণ্ণো।

তিপদে : ওনিতো পত্তো পানি = ওনীতপত্তপানি।

দিসন্তরালখে : পুব্ব চ উত্তরায় চ দিসায় অন্তরালং = পুব্বোত্তর।

ব্যতীহার : দণ্ডেহি দণ্ডেহি পহরিত্তা ইয়ং পবত্তিতং = দণ্ডাদণ্ডি॥

**দ্বন্দসমাস** পালিতে দুইভাগে বিভক্ত।

ইতরেতর : অগ্‌গি চ ধূমো চ = অগ্‌গিধূমো॥

সমাহার : কাক চ উলুক চ = ককোলূক॥

## ।। পালিভাষায় শব্দগুচ্ছ এবং বাগ্‌ধারা ।।

পালি শব্দগুচ্ছ, প্রবাদ এবং বাগ্‌ধারার সংখ্যা কিছু কম নয়। তাদের মধ্যে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হল। এগুলির প্রভাব বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি।

অগগং অক্‌খায়তি = শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়।

অথানে কোপং বদ্ধিতা = অস্থানে কোপ প্রকাশ করে।

অতারমান = ব্যস্ত না হয়ে।

অত্তণাং তক্‌কেত্ত = নিজের বেলায় আঁটিসাঁটি।

অন্তং করোতি = শেষ করে।

অলং বচনায় = বলবার কথা নয়।

অপুব্বং অচরিমং = আগেও না, পরেও না।

আঘাতং বণ্‌ধতি = রাগ পোষে।

আবি বা রহো বা = খোলাখুলি বা গোপনে।

ইতো বা ততো বা = এখানে সেখানে।

একত করোতি = এক করে।

একত হুত্বা = এক হয়ে।

উদ্ধং অধো তিরিয়ং সব্বধি = উপরে, নীচে, পাশে, সবদিকে।

কম্মং ন অত্থি = কাজ নেই।

কালং আরোচেতি = ( খাবার ) সময় ঘোষণা করে।

কত্থচি কত্থচি = কোথাও কোথাও।

কদাচি কদাচি = কখনও কখনও।

কিং করিস্‌সতি = কি হবে ?

কিং নক্‌খত্তং কীলিস্‌সসি উদাহু ভত্তিং করিস্‌সসি = আকাশের তারা গুনবে, না, কাজ করবে ?

গচ্ছন্তে গচ্ছন্তে কালে = কালক্রমে।

গাথা বন্ধিত্বা = গান বাঁধে।

সে হং-তি বা হুং-তি বা ন কিঞ্চি বদেসি = সে হাঁ-হুঁ কিছুই করল না।

যথাসত্তি যথা বলং = যথাশক্তি।

য়াদিসং বপতে বীজং তাদিসং হরতে ফলং = যেমন বীজ বুনবে তেমন ফল ফলবে।

য়েন তেন উপায়েন = যে-কোনো উপায়ে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা

### ।। প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ।।

প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতরা যা বলেছেন, প্রথমে সেগুলি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নিই।

হেমচন্দ্র নামে একজন প্রাকৃত বৈয়াকরণ বলেছেন, "সংস্কৃতই হচ্ছে প্রকৃতি বা মূল। তার থেকে যা এসেছে বা উৎপন্ন হয়েছে তাই প্রাকৃত।"[১] "প্রাকৃতচন্দ্রিকা" রচয়িতা কৃষ্ণ পণ্ডিতও বলেছেন "সংস্কৃতই প্রকৃতি; তা আবার সংস্কৃতসম ( তৎসম ), সংস্কৃতভব ( তদ্ভব ) এবং দেশি—এই তিন রকম।"[২]

এদেশি প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেছেন সংস্কৃত এসেছে আগে, তার পরে হয়েছে প্রাকৃত।

কিন্তু বিদেশে পণ্ডিতরা এই মত মানেন না। জর্মন পণ্ডিত ওয়েবার বলেন, সংস্কৃত ভাষা সমস্ত লোকের কথ্যভাষা ছিল এটা হওয়া সম্ভব নয়। সংস্কৃত ভাষার গঠন এবং বাঁধুনি দেখে স্বভাবতই আমাদের মনে হয় এই ভাষা বিদ্বানের ভাষা। বৈদিক ভাষাই সুগঠিত হয়ে, শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে, বৈয়াকরণের হাতে পরিমার্জিত হয়ে তবেই সংস্কৃত ভাষায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বৈদিকভাষাই মানুষের প্রকৃতিগত এবং অনিয়তবেগে প্রবাহিত হয়ে সৃষ্টি করেছে প্রাকৃতভাষার। ওয়েবারের মতে বৈদিক ভাষাই সাধারণ লোকের মুখে পরিবর্তিত হতে হতে শেষে প্রাকৃতভাষার রূপ নিয়েছে। তাহলে, জিনিসটা দাঁড়ায় এই, বৈদিক ভাষার দুটি রূপ—একটি শিষ্ট মার্জিত পরিচ্ছন্ন রূপ যার নাম সংস্কৃত, অন্যটি লৌকিক ধারায় প্রবাহিত বৈদিকের সহজতর সরলতর রূপ—সেইটিই প্রাকৃতভাষা। স্বভাবতই তাই প্রাকৃতভাষায় নিয়মবন্ধন সংস্কৃতের তুলনায় অনেক শিথিল। সেইজন্যেই প্রাকৃতভাষার অনিয়ম সংস্কৃতে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বৈদিকে দেখতে পাওয়া যায়।

---

(১) প্রকৃতি সংস্কৃতং তত্র ভবঃ তত আগতং বা প্রাকৃতং।

(২) প্রকৃতি সংস্কৃতিং তত্র ভবত্বাতৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্।
তদ্ভবং তৎসমং দেশীত্যেবমেতত্ত্রিধা মতং ॥ [ প্রাকৃতচন্দ্রিকা। ১।৪ ॥ ]

জর্মন অধ্যাপক ঔফ্রেকৃট্ বলছেন, অধ্যাপক ওয়েবার যে বলেছেন, প্রাকৃতভাষা বৈদিক ভাষার সমসাময়িক এবং বৈদিকভাষা থেকেই উৎপন্ন সে-কথাটি বোধ হয় ঠিক নয়। ঋক্‌বেদের ভাষা ভারতের সমস্ত লোক বলতো, এটা হওয়া সম্ভব নয়। আর্যরা কেবল পঞ্জাবেই তাঁদের আদিনিবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পঞ্জাবের আশে-পাশেই যে-সমস্ত অনার্য জাতি বাস করতো, কেবল তারা বা তাদের বংশধরদের দ্বারা লৌকিক সহজ বৈদিক ভাষা ব্যবহৃত হত এবং কালক্রমে তা প্রাকৃতভাষায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভারতের অন্যত্র যে-সব অনার্যজাতি বাস করতো, যেমন ধরা যাক দক্ষিণভারতে, পূর্ব ভারতে—তারা বোধ হয় বৈদিকের কাছে ঋণী নয়। তাদের নিজস্ব একটা ভাষা নিশ্চয় ছিল, আর্যদের আগমনের পূর্বেই সেই ভাষার প্রচলন নিজেদের অঞ্চলে তাঁরা নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

পরে যখন আর্যদের অধিকার বিস্তৃত হল তখন এঁরাও বৈদিক ভাষার অধিকারে আসতে বাধ্য হলেন। আর্যরাও আস্তে আস্তে অনার্যকন্যাদের পত্নী, উপপত্নী এবং দাসী হিসাবে গ্রহণ করার পর আর্যগৃহেও অনার্যভাষা প্রবেশ করতে লাগল। শেষে রাজ-নৈতিক প্রভাবে অনার্যরাই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হল এবং তাদের প্রভাবে সাধারণের চলিত ভাষা প্রাকৃত প্রাধান্য পেল। বেদের ভাষা, ব্রাহ্মণের ভাষা, রামায়ণ-মহাভারতের ভাষা এবং সমকালীন অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের ভাষা পণ্ডিতমণ্ডলী ছাড়া জনসাধারণের মুখে কখনই অবিকৃতভাবে বরাবর প্রচলিত ছিল না। তাহলে, অধ্যাপক ঔফ্রেকৃট্-এর মতে প্রাকৃত ভাষা গঠিত হয়েছে দুইভাবে—বৈদিকের সরলতর রূপ থেকে এবং আর্যদের পূর্বে যে-সমস্ত অনার্যজাতি এদেশে বাস করতেন তাঁদের ভাষা থেকে শব্দসংগ্রহ করে।

অধ্যাপক ল্যাসেন কিন্তু বলেছেন, বৈদিক ভাষা কোনো সময়েই জনসাধারণের কথিত ভাষা ছিল না এটা বলা ভুল। কোনো না কোনো সময়ে বৈদিকই ছিল জনসাধার-ণের কথিত ভাষা। পরে এই লৌকিকভাবে কথিত বৈদিকভাষাকে পাণিনি সংস্কৃতের রূপ দেন, অর্থাৎ তাকে একটি নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে মার্জিত রূপ দেন। সংস্কৃত ভাষা গঠিত হবার পরে যে-লৌকিকভাবে ব্যবহৃত বৈদিকভাষা থাকল, সেটাই তখন দিন দিন সহজতর সরলতর রূপ গ্রহণ করে প্রাকৃতে এসে দাঁড়ালো। তিনি বলেন, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে এটা বোধ হয় ঠিক নয়। হিন্দু আর্যদের উত্তরভারতে বিস্তৃতি লাভ করার পর অর্থাৎ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে বৈদিক লৌকিকতা তথা বিকৃতি লাভ করার পর, বৈদিককে পরিমার্জিত করে সংস্কৃত করে নেওয়া হয়। সেইজন্যে বৈদিকের সঙ্গে প্রাকৃতের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ, সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের সম্বন্ধ তত নিবিড় নয়। এর থেকেই বোঝা যায় প্রথমে বৈদিক, পরে বৈদিকের

বিকৃত রূপ এবং তার থেকে প্রাকৃত এসেছে; পরে সংস্কৃতের উৎপত্তি। সেইজন্যে বয়সের দিক দিয়ে প্রাকৃত সংস্কৃতের অগ্রজ, যদিও দুজনেই বৈদিকের গর্ভজাত। এর আরও প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, স্থানভেদে প্রাকৃতের রূপ ভেদ আছে, কিন্তু সংস্কৃতের নেই, বা যদি থেকেও থাকে তার কোনো নিদর্শন আজ আর পাবার উপায় নেই। এতেই বোঝা যায়, সংস্কৃত একটা planned language। অনেক পরে বেশ ভেবেচিন্তে তার গঠন-নিয়ম ইত্যাদির একটা দৃঢ়বদ্ধ রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতের ক্ষেত্রে সেরকম হয়নি। সেইজন্যেই বোঝা যায়, প্রাকৃত অনেক আগের স্তরের ভাষা—সংস্কৃত এসেছে পরে।

অধ্যাপক Benefy-র মত হচ্ছে এই যে, মহারাজ অশোকের সময় দুই রকম দেশি ভাষা প্রচলিত ছিল। একটি গুজরাটে, অন্যটি মগধে। ওই দুটি ভাষার গঠন আলোচনা করলে দেখা যাবে, ওই দুই প্রদেশে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাকৃতভাষা একত্রে প্রচলিত ছিল না। সেখানে কোনো-এক সময়ে বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাই সবাই বলতো, সেটাই বিকৃত হয়ে একসময়ে প্রাকৃতে পরিণত হয়। আবার কোনো কোনো বৌদ্ধশাস্ত্রকার বলেছেন, তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের শাস্ত্র রচনা করেননি, করেছেন মগধ-অঞ্চলের জনসাধারণের কথিত ভাষায়। তাহলে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে, কোন্ ভাষাটি আগে—সংস্কৃত না প্রাকৃত? না মগধ-অঞ্চলের সংস্কৃত-নিরপেক্ষ জনসাধারণের কথিত ভাষা? এ সম্বন্ধে তিনি কোনো নির্দিষ্ট মতামত না দিতে পারলেও বলেছেন, খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে-সময়ে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, তখন জনসাধারণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো না; তার অন্তত তিনশো বছর আগ জনসাধারণের কথ্য ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকে গণ্য করলেও করা যেতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষারও আগে যারা ঐ অঞ্চলে বাস করতো তারা কোন্ ভাষায় কথা বলতো? সবাই কি বৈদিক ভাষায়, না কি অন্য একটা ভাষায়, যা আর্যদের আগমনের আগে থেকেই প্রচলিত ছিল? এ সম্বন্ধে এখনও কিছু সঠিকভাবে বলা যায়নি।

নিরুক্তকার যাস্ক বলছেন বৈদিক-আর্য ভাষার অনেক বিশেষ্য পদ (যেমন দমূনা, ক্ষেত্রসাধা) প্রাকৃত থেকে গৃহীত, আবার সংস্কৃতের অনেক পদ এসেছে বৈদিক ধাতু থেকে। তাহলে, বৈদিক, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত তিনটের মধ্যেই কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও বা পরোক্ষ সম্বন্ধ আছে। এখন বৈদিক বিকৃত হয়ে প্রাকৃত আসছে, না প্রাকৃত পরিশোধিত হয়ে সংস্কৃত হচ্ছে এ সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত কোনো মতামত দিতে পারা যাচ্ছে না। তবে যাস্কের কথায় একটি জিনিস সম্বন্ধে তির্যক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে এই, একসময় কম্বোজ দেশেও (বর্তমান কাম্বোডিয়া) সংস্কৃত ভাষা

প্রচলিত ছিল। কম্বোজ দেশে 'শবতি' ক্রিয়াপদের দ্বারা বোঝাতো 'গতিকর্ম' আর আমাদের দেশে তারই বিকৃত রূপ 'শব'—গতিকর্মহীন অর্থে প্রচলিত।

যাহোক, প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের এবং বাইরের পণ্ডিতরা যা বলেছেন, মোটামুটি উপরে দেওয়া হল। বিচার করলে দেখা যাবে, এই সমস্ত মতই আংশিকভাবে সত্য। আর্যদের আদি ভাষা হচ্ছে বৈদিক, যা রক্ষিত আছে বেদে, ব্রাহ্মণে। আর্যদের আগমনের পূর্বে আমাদের দেশের লোকের ভাষা যাই থাকুক না কেন, আর্য-আধিপত্য নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অধিকাংশ লোকেরই মনোভাব প্রকাশের ভাষা হয়ে দাঁড়ায় নিজের ভাষার প্রচলিত শব্দসম্ভার-মিশ্রিত আগন্তুক বৈদিক ভাষা। এই ভাষা পুরোপুরি বৈদিকও নয়, আবার সম্পূর্ণ দেশিও নয়। তবে এতে প্রাধান্য ছিল বৈদিকের। সেই বৈদিকই জনসাধারণের ব্যবহারের সামগ্রী হতে হতে কালক্রমে তাদের মুখে মুখে অন্যরকম রূপ পেল। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোকের এবং পণ্ডিতদের ভাষা আগের বৈদিকই থাকল। তাহলে, এখন বৈদিকের স্রোত হল দ্বিমুখী—একটি সরলতর সহজতর রূপ, যা জনসাধারণের মুখে মুখে বেগবান ; অন্যটি শিষ্টজনের ব্যবহৃত ভাষা, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই যার বিকাশ। এখন এই অবস্থায় দুই ধারার স্বরূপটি কি ছিল, অর্থাৎ দুই ধারার নমুনা সংগ্রহের চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য, কারণ তখন ভাষা লিপিবদ্ধ করবার উপায় ছিল না। যে-সময়ে বেদ-ব্রাহ্মণ রচিত হয় তখন আর্যরা ছাড়া অন্য কেউ সে-ভাষা জানতেন না। সেইজন্য তাতে বিকৃতি ঘটেনি। কিন্তু পরে যখন আর্য অনার্য মিলন সংঘটিত হল তখন প্রচুর অনার্য শব্দ এবং কিছু কিছু প্রাদেশিক শব্দও বৈদিক ভাষায় প্রবেশ করল। অনার্যরাও রাজভাষা বলে বৈদিক ভাষা ব্যবহার করতে হয় বাধ্য নতুবা প্রয়োজনের তাগিদে অনুপ্রাণিত হলেন। ফলে বৈদিক ভাষা বিকৃত হয়ে জন-সাধারণের মুখে সহজতর সরলতর রূপ পেল—তা পেতে বাধ্য, কেননা বহুজন-ব্যবহৃত ভাষা সহজ না হলে চলে না। এখন পণ্ডিতদের সামনে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। হয় তাঁদের লৌকিকরূপে পরিবর্তিত বৈদিককেই সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করতে হয় কিংবা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পণ্ডিতসমাজে এবং রাজকার্যে প্রাচীন ভাষাকেই আঁকড়ে থাকতে হয়। বৈদিকভাষা তখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতাদের দ্বারা কথিত ভাষা, অতএব পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে, ব্রাত্যদের দ্বারা একে ব্যবহৃত হতে দিলে একদিন তাঁদের সমগ্র শাস্ত্রই দূষিত হয়ে যাবে। কিন্তু বিপদ হয়েছে, ইতিমধ্যে খাঁটি বৈদিকের মধ্যে বহু অনার্যশব্দ এবং লৌকিকরূপে পরিবর্তিত বিকৃত বৈদিকশব্দ অনুপ্রবিষ্ট

হয়েছে। তখন পাণিনি-যাস্ক প্রমুখ বৈয়াকরণরা আদি বৈদিক ভাষাকে শিষ্ট পরিচ্ছন্ন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দিলেন। সেই ভাষার আগাগোড়া ঋজু নিয়ম, কঠোর শৃঙ্খলা এবং আশ্চর্য শিষ্টতা। এই ভাষাই সংস্কৃত। যেমন এর গতি তেমনি এর অ্যাকাডেমিক সৌন্দর্য। সাহিত্যরচনায়, শাস্ত্ররচনায় এর জুড়ি নেই। আবার অত্যন্ত কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ বলে সাধারণ লোকের কোনোদিন একে যথেচ্ছ ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলবারও উপায় নেই। এই ভাষা রীতিমত 'শিক্ষালাভ' না করে বলবার বা লিখবার উপায় নেই। ইতিমধ্যে লিপির উদ্ভব হয়েছে, সংস্কৃত ভাষাকে লিপিবদ্ধ করবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ, সুতরাং এর আর বিকৃত হবার কোনো রাস্তা থাকছে না। এই ভাবে আটঘাট বেঁধে আদি বৈদিকভাষার একটি শিষ্ট মার্জিত পরিচ্ছন্ন রূপ দিলেন পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণরা। এত কঠোরভাবে তা সম্পাদিত হয়েছিল যে, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোথাও বিন্দুপ্রমাণ প্রাদেশিকতার চিহ্ন নেই। দক্ষিণভারতের পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত সংস্কৃত গ্রন্থে কিংবা পূর্ব বা পশ্চিম-ভারতের পণ্ডিতদের দ্বারা প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক বিশেষত্ব কিছু কিছু নিশ্চয় ছিল, থাকা স্বাভাবিকও। কিন্তু সেই গ্রন্থ উত্তর-ভারতের সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে আসামাত্র তাদের আঞ্চলিক এবং প্রাদেশিক বিশেষত্ব নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে। তাই, পরবর্তীকালে উত্তর এবং দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম— ভারতের যে-কোনো অঞ্চলের সংস্কৃত ভাষায় লেখা গ্রন্থে কোথাও আঞ্চলিক বৈষম্য নেই। সর্বত্র তা উত্তরভারতের মুনিঋষি-প্রবর্তিত নিয়ম এবং standard-কে প্রাণপণে মেনে চলেছে।

কিন্তু লোকের মুখে মুখে দিন দিন বিকৃতিপ্রাপ্ত বৈদিক ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ নেই। বহু শাখায় প্রবাহিত হয়ে সে তখন এক বিরাট স্রোতস্বতীর রূপ পেয়েছে, প্রবল তার বেগ, বিশাল তার বিস্তৃতি—একে নিয়ম-শৃঙ্খলার বাঁধ দিয়ে আটকাবার সাধ্য আছে কার! সেই সৃষ্টিছাড়া, গতির আনন্দে পাগল, সর্বজনের মুখে উচ্ছ্বসিত লৌকিকরূপে পরিবর্তিত বৈদিকই পরিণত হল প্রাকৃত ভাষায়।

প্রাকৃত এবং সংস্কৃত—দুজনেরই জননী বৈদিক, কিন্তু জন্মের পর থেকে সহোদরারা হয়ে গেল বৈমাত্রেয় ভগ্নীর মত। একজন মুক্তি পেল সমৃদ্ধ হল রূপান্তরিত হল জনসাধারণের প্রেমে, অন্যজন নিয়মশৃঙ্খলার বেদীতে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়ল। একজন হলো প্রাণদায়িনী, অন্যজন জ্ঞানদায়িনী। পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে একদিন প্রাণেরই জয় হল, জ্ঞান বাঁধা পড়ে রইল পুঁথির শুষ্ক পাতায়, পণ্ডিতদের নীরস মনে আর গবেষকদের ঘর্মসিক্ত অনুশীলনে।

প্রাকৃতভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যতদূর জানা গেছে উপরে খুব সংক্ষেপে তা বলা হল। এখন দেখা যাক্, কোন্ অঞ্চল থেকে প্রাকৃতের প্রথম উৎপত্তি হয়েছে।

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, আর্যরা প্রথম যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, অর্থাৎ পঞ্চনদভূমি, সেখান থেকেই প্রাকৃতের উৎপত্তি। এই মতটি কতদূর গ্রহণ-যোগ্য তা বিবেচনা করতে হবে। আর্যরা যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, দীর্ঘকাল ধরে তা তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাই সেখানে বৈদিক প্রথমে এবং পরে সংস্কৃতেরই প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক।' 'ললিতবিস্তরে'র গাথাভাষাকে প্রাকৃতের আদিরূপ বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু আসলে তা তৎকালীন সংস্কৃতেরই কথিতরূপ—পরে সেই ভাষাই পালিতে পরিণত হয়েছে। সেইজন্যেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাকৃতের উৎপত্তি হয়েছে, এই মতটি সকলে গ্রহণ করতে চাননা। বরং এবিষয়ে আমাদের দেশের পণ্ডিতরা যা বলেন সেগুলি অনুধাবন করে দেখা যেতে পারে।

পণ্ডিত লক্ষ্মীধর তাঁর 'ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা'য় বলেছেন, 'প্রাকৃতং মহারাষ্ট্রোদ্ভবম্'—মহারাষ্ট্র থেকেই প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি। চণ্ডীদেব তাঁর প্রাকৃতদীপিকায় বলেছেন—"লোক-ব্যবহার অনুসারে এবং নাটকাদি ও মহাকবিদের প্রয়োগ অনুসারে মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রাকৃতই উৎকৃষ্ট ভাষা বলে গণ্য। দণ্ডীও তাই বলেছেন, মহারাষ্ট্র দেশে যে প্রাকৃতভাষা প্রচলিত, তাই শ্রেষ্ঠ।[১] রামতর্কবাগীশ তাঁর 'প্রাকৃত-কল্পতরু'র সূচনাতেই বলেছেন—মহারাষ্ট্রী ভাষাই সকল প্রাকৃত ভাষার সার।[২] রামশর্মা, চণ্ডীদেব এবং লক্ষ্মীধর এই তিনজন পণ্ডিতের বক্তব্য—মহারাষ্ট্র অঞ্চল থেকেই প্রাকৃতের উৎপত্তি। রামশর্মা আরও বলেছেন, মহারাষ্ট্র-প্রাকৃতই আদি, তার থেকে শৌরসেনী এবং শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে মাগধীপ্রাকৃত।

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকে যাঁরা আদি প্রাকৃত বলেননি তাঁদের মধ্যে 'প্রাকৃত-লক্ষণ' প্রণেতা পাণিনি ( সংস্কৃত আদি বৈয়াকরণ পাণিনি নন ) অন্যতম। চণ্ড নামে আরও একজন বৈয়াকরণ 'প্রাকৃত-লক্ষণ' নামে আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি

(১) "এতদপি লোকানুসারাৎ নাটকাদৌ মহাপ্রয়োগদর্শনাৎ প্রাকৃতং মহারাষ্ট্র দেশীয়ং প্রকৃষ্ট ভাষণম্। তথাচ দণ্ডী—'মহারাষ্ট্রাশ্রয়ং ভাষাং কৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ ॥"

(২) সর্বাসু ভাষাস্বিহ হেতুভূতাং ভাষাং মহারাষ্ট্রভবাং পুরস্তাৎ।
নিরূপয়িষ্যামি যথোপদেশং শ্রীরামশর্মাহমিমাং প্রযত্নাৎ ॥

বলেছেন, প্রাকৃত চার রকম—আর্যপ্রাকৃত, অপভ্রংশ, মাগধী এবং পৈশাচিকী। তিনি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের কোনো উল্লেখ করেননি। পাণিনি প্রণীত প্রাকৃতলক্ষণের টীকা যিনি রচনা করেছেন তিনিও মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের কোনো পরিচয় দেননি। বররুচি অবশ্য তাঁর 'প্রাকৃতপ্রকাশে' মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী এবং মাগধী—এই চাররকম প্রাকৃত আছে। অন্যতম প্রাকৃত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র বলেছেন ছয়রকম প্রাকৃতের কথা—মূলপ্রাকৃত, শৌরসেনী, মাগধী, অপভ্রংশ, পৈশাচী এবং চুলিকাপৈশাচী। তবে, এখানে একটা কথা বিবেচ্য—চণ্ডের আর্যপ্রাকৃত, বররুচির মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত এবং হেমচন্দ্রের মূল-প্রাকৃত, তিনটির প্রকৃতি তিনরকম। যদি এমন দেখা যেত, এই তিনটির প্রকৃতি মোটামুটি একই রকম তবে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকে আদি প্রাকৃত বলতে কোনো বাধা ছিল না।

বৌদ্ধ পণ্ডিতরা প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যা বলছেন সেটাও এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। কচ্চায়নের ( কাত্যায়নের ) 'পয়োগসিদ্ধি' থেকে তাঁরা নজীর দেখিয়ে বলতে চান—'মাগধীই হচ্ছে মূলভাষা, সমস্ত ভাষার আদি কল্পক। এই অশ্রুতপূর্ব ভাষায় মানুষেরা ব্রহ্মেরা এমন কি সম্যকবুদ্ধেরাও কথা বলতেন।১ বৌদ্ধ-পণ্ডিতরা মাগধী প্রাকৃতকেই যে আদি-প্রাকৃত বলতেন এবং তার থেকেই যে পালি ভাষা এসেছে সেই সম্বন্ধে পালিভাষার প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছি।

জৈন পণ্ডিতরা বলেন অর্ধমাগধীই হচ্ছে আদি প্রাকৃত। তাঁদের সাক্ষ্য 'পন্নবণাসুত্ত'—যেখানে একজায়গায় বলা হচ্ছে 'কি ভাষায় তার প্রয়োগ? যাতে অর্ধমাগধীভাষা প্রকাশ করা যায় সেটাই ব্রাহ্মীলিপি' ।২

বৌদ্ধদের মতে মাগধী এবং জৈন পণ্ডিতদের মতে অর্ধমাগধী মূল প্রাকৃত হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় তাঁদের নিজের নিজের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থগুলির অধিকাংশই যথাক্রমে মাগধী এবং অর্ধমাগধীতে রচিত। জৈন তীর্থঙ্করদের উপদেশগুলির অধিকাংশই আবার অর্ধমাগধীতে রচিত। অশোকের শিলালিপির কতক কতক বৌদ্ধধর্মগুরুদের প্রভাবে মাগধী প্রাকৃতে, গুজরাত-অঞ্চল থেকে অশোকের যে-সব শিলালিপি পাওয়া গেছে সেগুলি মূলে মাগধীপ্রাকৃত ছিল, পরে তা বদ্‌লে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত হয়েছে।

(১) সা মাগধী মূলভাসা নরা যেয়াদিকপ্পিকা।
ব্রহ্মানো চ সসুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥

(২) সে কিং তং ভাসারিয়া? জেনং অদ্ধমগাহাএ ভাসাএ ভাসেন্তি জথ য ণং বম্ভীলিবি পবত্তই॥

পূর্বভারতের শিলালিপিগুলি মাগধীপ্রাকৃতেই আছে। সেগুলি বোধ হয় আর পরিবর্তিত হয়নি।

অধ্যাপক ল্যাসেন বলেন, বররুচির মতানুযায়ী শৌরসেনী, মাগধী, মহারাষ্ট্রী, পৈশাচি ইত্যাদি ভাগে প্রাকৃতকে ভাগ করা হলেও আসলে এদের মধ্যে মূলগতভাবে খুব বেশি পার্থক্য নেই, পার্থক্য আছে বহিরঙ্গে এবং তাও হয়েছে স্থানীয় প্রভাবে। তিনি বলছেন, শৌরসেনী পশ্চিমভারতের এবং মাগধী পূর্বঅঞ্চলের কথ্য ভাষা ছিল। এই দুটি প্রাকৃত-ই মূল, তাদের পরিবর্তিত স্থানীয় লক্ষণাক্রান্ত রূপ মহারাষ্ট্রী এবং পৈশাচি। ল্যাসেন বলেন, পৈশাচি নামটি কাল্পনিক, আর মহারাষ্ট্রী নাম হলেও সেটা মহারাষ্ট্র-অঞ্চলের প্রাকৃত নয়। মধ্যভারতের সর্বত্রই সেই প্রাকৃত প্রচলিত ছিল।

এই সমস্ত মতামতের থেকে সিদ্ধান্ত করতে পারা যায়, একসময়ে ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই একই ধরনের প্রাকৃত ভাষাই প্রচলিত ছিল, কেননা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলির এবং বররুচির 'প্রাকৃত প্রকাশে' আলোচিত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতের ভাষার মূল গঠনভঙ্গী মোটামুটি একই রকম। পরে সামাজিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মে এক এক অঞ্চলের প্রাকৃতে এক এক রকম স্থানীয় বিশেষত্ব এসেছে। পূর্ববাংলার এবং পশ্চিমবাংলার লোকের মাতৃভাষা বাংলা, কিন্তু বাংলাদেশের দুই অঞ্চলে এদের নানা স্থানীয় বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক কারণেই তা হয়েছে। প্রাকৃতভাষার ক্ষেত্রেও এই রকম হয়েছিল বললে তা বোধ হয় খুব অসঙ্গত হয়না। এখন যদি কেউ বলেন, পূর্ববাংলার বাংলাটাই আদি বাংলা, তার পরিবর্তিত রূপ পশ্চিমবাংলার বাংলাভাষা, তবে যেমন সুবিচার করা হয় না, তেমনি মাগধী বা মহারাষ্ট্রী বা শৌরসেনী—এদের যে-কোনো একটিকে আদি প্রাকৃত বলে রায় দিলে সেই রকম অবিচার করা হয়।

প্রাকৃত ভাষাকে তার আঞ্চলিক বিশেষত্ব অনুযায়ী চারটি জাতিতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। তাদের নাম মাগধী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচি। মাগধীর আরেকটি ভাগ—অর্ধ-মাগধীর কথাও কোনো কোনো পণ্ডিত বলে থাকেন।

**মাগধী প্রাকৃত** সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে অশিক্ষিত, ইতরজনের কথ্য ভাষা হিসাবে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে লিখিত বাংলা নাটকে ঝি-চাকর বা নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের ভাষায় যেমন মেদিনীপুর বাঁকুড়া বা পূর্ববাংলার গ্রাম-অঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহার করা হত এবং এখনও কোনো কোনো নাট্যকার করে থাকেন—তেমনি সংস্কৃত নাটকেও অশিক্ষিত ইতরজনের কথ্যভাষা হিসাবে মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হয়। কালিদাস তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে—দুষ্মন্তের

আংটিটি যে-ধীবর রোহিত মৎস্যের পেটের মধ্যে পেয়েছিলেন—তাঁর মুখের কথাগুলি মাগধীপ্রাকৃতে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, তার দ্বারা লোকটির সামাজিক পরিচয় বোঝানো এবং কিঞ্চিৎ হাস্যরস সৃষ্টি করা। মাগধীর একটি স্তর অর্ধমাগধী। এই ভাষার ব্যবহার বেশি ছিল জৈন-সন্ন্যাসীদের শাস্ত্র গ্রন্থে। অশ্বঘোষের নাটকেও এর ব্যবহার ছিল। এর অন্য নাম 'জৈন-মহারাষ্ট্রী' বা 'জৈন শৌরসেনী'। মাগধী প্রাকৃতের নমুনা—"অধ এক্কোদিয়শং মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডাশো কপ্পিদে। যাব তশ্শ উদল-

ব্ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেশকামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅন্তং গং দংশঅন্তে যএব গহিদে ভাবমিশ্শেহিং এত্তিকে দাব এদশ্শ আগমে। অধুণা মালেধ কুস্টেধ বা॥ ১

**মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত** কবিতা বা গানের ভাষা হিসাবে সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে অধিকাংশ গানগুলিই মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে ব্যবহার করেছেন। মিষ্টত্ব এবং চারুত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতই বোধ হয় সমস্ত রকম প্রাকৃতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গানের ভাষা হিসাবে এর প্রয়োগ হওয়ার কারণ, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে পদমধ্যস্থিত অযুক্ত ব্যঞ্জনগুলি প্রায়ই লুপ্ত—শৌরসেনী প্রাকৃতে তা হয়নি বলে শৌরসেনী একটু কর্কশ। তা না হলে শৌরসেনী এবং মহারাষ্ট্রীর রূপ প্রায় একই রকম। উচ্চশ্রেণীর রমণীর কথ্যভাষা হিসাবে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ব্যবহার 'সাহিত্যদর্পণে' অনুমোদিত। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে অনেকগুলি কাব্য-গাথা রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেতুবন্ধ বা রাবণবধ, গাহা সতসই ( গাথা সপ্তশতী ), বাক্‌পতি লিখিত গৌড়বাহ ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের নমুনা—

তুজ্ঝণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা-অ-রাত্তিং চ।
ণিক্কিব দাবই বলিঅং তুঅ হুত্ত মণোরহাহী অংগাগ্গিং ॥২

**শৌরসেনী প্রাকৃত** সংস্কৃত নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর এবং অশিক্ষিত পুরুষের কথ্যভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেকে মনে করেন, মথুরা-অঞ্চলের কথ্যভাষা

(১) তারপর একদিন আমি একটা রুইমাছ যখন টুকরো টুকরো করে কাটছিলাম তখন তার পেটের মধ্যে এই মহারত্নসমুজ্জ্বল আংটিটা দেখলাম। পরে এই জায়গায় বিক্রির জন্যে এই মাছটাকে যখন দেখালাম তখন হুজুরেরা আমায় গ্রেপ্তার করেছেন। এই পর্যন্তই এর প্রাপ্তির বৃত্তান্ত। এখন আপনারা আমাকে মারুন বা কুটে ফেলুন॥

(২) তোমার হৃদয়ে কি হচ্ছে আমি জানি না। কিন্তু তোমাতে আমার সমস্ত ইচ্ছা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় মদনদেব আমার অঙ্গসমূহকে দিনরাত্রি প্রবলভাবে তাপিত করছে॥

ছিল শৌরসেনী প্রাকৃত, কেননা শূরসেন-অঞ্চল বলতে তখন বোঝাত্যে ভারতবর্ষের মধ্যদেশের কেন্দ্রীয় অংশ। এই ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব বেশি, কেননা ঐ অংশে সংস্কৃতভাষার চর্চা ছিল প্রবল। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সঙ্গে শৌরসেনী প্রাকৃতের গঠনে খুব একটা পার্থক্য নেই। শৌরসেনী প্রাকৃতের নিদর্শন—

পোরব জুত্তং ণাম তুহ পরা অস্সমপদে সভাবুত্তাণহিদঅং ইমং।
জণং তধা সমঅপুব্বং সংভাবিঅ সংপদং ঈদিসেহিং পচ্চাচ্‌কখিদুং ॥১

**পৈশাচী প্রাকৃতে** শিষ্ট সমাজের জন্য সাহিত্যগ্রন্থ খুব কমই রচিত হয়েছে, কিন্তু নিম্নস্তরের জনসমাজে প্রচলিত লোকসাহিত্য রচনায় পৈশাচী প্রাকৃতের ব্যবহার হয়েছে সর্বাধিক। গুণাঢ্যের লেখা "বড্ডকহা" ( বৃহৎকথা ) পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ, এর বিষয়বস্তু রোমাঞ্চকর রূপকথা এবং বিবিধ কাহিনী। কিন্তু মূল গ্রন্থখানির সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে তার কাহিনীগুলি সংস্কৃত অনুবাদের মাধ্যমে রক্ষিত আছে। পৈশাচী প্রাকৃতের গঠনে প্রাকৃতের সরলতর রূপ অপভ্রংশের আদি লক্ষণটি ধৃত। পৈশাচী প্রাকৃতের নমুনা—

পত্তূণ কিং ফট্‌চণো নিচতেহতাণা
অত্থাসণং ফচতি চমফণিস্সুতণস্স।
ভোত্তূণ খোরতর তুকৃথ-সতাই পাপা
মোহাণ্‌ধকারগহণং লপ কিং লফন্তি ॥২

উপরে মাগধী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী এবং পৈশাচী প্রাকৃতের যে-সব নিদর্শন দেওয়া হয়েছে তা সবই সাহিত্যরচনায় ব্যবহৃত প্রাকৃত, সেজন্য এদের সাধারণভাবে **সাহিত্যিক প্রাকৃত** বলা যেতে পারে। এদের সাহিত্যিক প্রাকৃত বলার উদ্দেশ্য, ঠিক এই রকম ভাষা জনসাধারণের কথ্য ভাষা ছিল না। এই ভাষার সমস্ত নিদর্শন নেওয়া হয়েছে তৎকালীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকের নিম্নশ্রেণীর পুরুষ বা রমণীর কথোপকথন, গান ইত্যাদি থেকে। সেইজন্য একে সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত বলা হচ্ছে, কথ্য প্রাকৃত বলা হচ্ছে না। প্রাকৃত ভাষার যাঁরা ব্যাকরণ রচনা করেছেন

(১) পৌরব, একদিন আশ্রমপদে স্বভাবত সরলহৃদয় এই ব্যক্তির কাছে সেইরকমভাবে প্রতিজ্ঞা করে এবং তাকে আশ্বাস দিয়ে এখন এই রকম ভাষায় তাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উপযুক্ত কাজই বটে!

(২) যোদ্ধ্‌গণের পক্ষে নিজ দেহদানের ফলে জম্ভাসুরবধকারীর ( অর্থাৎ কৃষ্ণের ) অর্ধাসন লাভ করার সৌভাগ্য হয়; কিন্তু পাপীদের পক্ষে ঘোরতর শতশত দুঃখভোগ করবার পরও গভীর মোহান্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কি বা লাভ হতে পারে!

তাঁদের আলোচনার অবলম্বন এই সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রাকৃত কিংবা আগাগোড়া প্রাকৃতেই রচিত কাব্য-কাহিনী (যেমন, গাহা সত্‌সই, গৌড়বাহ, সেতুবন্ধ, বড্ডকহা ইত্যাদি) অথবা জৈনদের সাহিত্যগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রাকৃত। সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে বররুচি, শাকল্য, চণ্ড, কোহল, ভামহ, কাত্যায়ন, হেমচন্দ্র, রামতর্ক-বাগীশ, নরচন্দ্র ইত্যাদি প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করেন এই সাহিত্যিক প্রাকৃতকে অব-লম্বন করেই। সেই ব্যাকরণসম্মত সাহিত্যিক প্রাকৃতই সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কবি-নাট্যকার খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত, এই এগারোশো বছর ধরে। সেইজন্যে তাঁদের নাটকে অর্থাৎ সাহিত্যগ্রন্থে পঞ্চম শতাব্দীর প্রাকৃত যা ষোড়শ শতাব্দীর প্রাকৃতও তাই—এর আর কোনো পরিবর্তন হয়নি, কারণ তা ব্যাকরণ-মানা সাহিত্যে ব্যবহৃত standard classical প্রাকৃত। কিন্তু লোকের মুখে মুখে ইতিমধ্যে পঞ্চম শতাব্দীর প্রাকৃত বদলাতে বদলাতে, সহজ হতে হতে, অপভ্রংশের বেড়া পার হয়ে আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষার স্তরে চলে এসেছে। নবম-দশম শতাব্দীতে অপভ্রংশ থেকে বাংলাভাষার উৎপত্তি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পুথিপত্রে সংস্কৃতে রচিত নাটকে তখনও চলেছে 'সাহিত্যিক প্রাকৃত'। সেইজন্য সাহিত্যিক প্রাকৃতকে আমরা ঠিক লোকায়ত ভাষা বলব না। তা কৃত্রিম, শিষ্ট এবং একমাত্র সাহিত্যেই ব্যবহৃত।

প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশকে আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করে নিতে পারি ; বস্তুত আচার্য সুনীতিকুমার সেই রকম ইঙ্গিতই দিয়েছেন। আমরা প্রথমে এই তিনটি স্তরের আনুমানিক সময় বলে নেব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যে-যে সূত্র থেকে এই স্তরের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেগুলিও পাঠকের সুবিধার জন্যে উল্লেখ করব। পরে আলাদা করে প্রত্যেকটি স্তরের ভাষার নমুনা দেব।

প্রথম স্তরের আনুমানিক সময় খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। এই স্তরের ভাষার প্রধান নিদর্শন পাওয়া গেছে মহারাজা অশোকের বিভিন্ন অনুশাসনগুলিতে, সমসাময়িক অন্যান্য শিলালিপিতে এবং হীনযানী বৌদ্ধদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে অর্থাৎ পালিভাষায় লিখিত গ্রন্থে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃতভাষার আনুমানিক সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। এই স্তরের ভাষার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ সময়ের অন্তর্গত প্রথম তিন শতাব্দীর প্রত্নলিপিতে, সাহিত্যিক প্রাকৃতে এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃতে। তৃতীয় স্তরটির প্রাকৃত ভাষা আগের এবং পরবর্তী নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির (যেমন বাংলা,

হিন্দী, মরাঠী, পঞ্জাবী ইত্যাদি ) আদি স্তরের মাঝামাঝি। এই স্তরটিকে আমরা বলি অপভ্রংশ। এর আনুমানিক স্থিতিকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন বলেন, মধ্যস্তরের প্রাকৃতের শেষ অবস্থাটিই অপভ্রংশ। এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের কয়েকটি গানে, পরবর্তীকালে ( আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ) পাঞ্জাবের অধিবাসী মুসলমান কবি আব্দর রহমানের 'দূত' কাব্য 'সংনেহয় রাসক' গ্রন্থে। পরে অপভ্রংশের আমরা আলাদা করে বিস্তৃত আলোচনা করব।

আগে উল্লেখ করেছি, প্রথম স্তরের প্রাকৃত ভাষার ( সময়: খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী ) প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় অশোকের অনুশাসনে, সমকালীন অন্যান্য শিলালিপিতে এবং হীনযানী বৌদ্ধদের শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষায়। প্রথম স্তরের প্রাকৃত ভাষার এবার উদাহরণ দেব।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের যে-সমস্ত অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে তাতে তখনকার প্রাকৃতের চারটি উপভাষার বা dialect-এর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এই উপভাষাগুলির নিদর্শন পাওয়া যায়—

(১) অশোকের শাহবাজগঢ়ী এবং মান্‌সেহরা অনুশাসনে,

(২) গির্ণার অনুশাসনে,

(৩) কালসী ও ছোট অনুশাসনগুলিতে,

(৪) ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসনে।

স্থানানুযায়ী এদের নাম যথাক্রমে উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, প্রাচ্যমধ্যা এবং প্রাচ্যা॥

উত্তর-পশ্চিমা উপভাষার শাহবাজগঢ়ী অনুশাসন খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা। আগেই বলা হয়েছে, এই লিপি বিদেশী, উর্দু লেখার মত এই লিপি লেখা হত ডানদিক থেকে বাঁদিকে ; এতে দীর্ঘস্বরের অর্থাৎ ঈ, ঊ ইত্যাদির আলাদা কোনো চিহ্ন ছিল না। শাহবাজগঢ়ী অনুশাসনের ভাষা এই রকম—

> দেবনং প্রিয়ো প্রিয়দ্রশি রয় এবং অহতি জনো উচবুচং মংগলং করোতি অবধে অবহে বিবহে পজুপদনে প্রবসে। এতয়ে অঞয়ে চ এদিশিয়ে জনো বহু মংগলং করোতি।............[ নবম অনুশাসন ][১]

---

(১) বাংলা অনুবাদ: দেবদেব প্রিয়দর্শী রাজা এই কথা বলেছেন—লোকে নানারকম মঙ্গল অনুষ্ঠান করে—আপদে, ছেলের বিয়েতে, মেয়ের বিয়েতে, সন্তানলাভে, প্রবাসগমনে। এই সব এবং এই রকম অন্য উপলক্ষে লোকে অনেক মঙ্গল অনুষ্ঠান করে।

দক্ষিণ-পশ্চিমা বা গির্ণার অনুশাসনে ব্যবহৃত উপভাষায় এই অনুশাসনটিই নিম্নলিখিত রূপ নিয়েছে—

দেবানং পিয়ো প্রিয়দসি রাজা এবং আহ অস্তি জনো উচবচং মংগলং করোতে আবাধেসু বা আবাহবিবাহেসু বা পুত্রলাভেসু বা প্রবাসম হি বা। এতম্‌হি অঞম্‌হি চ জনো উচাবচং মংগলং করোতে।……[ নবম অনুশাসন ]১

কালসী এবং ছোট অনুশাসনগুলি প্রাচ্যমধ্যা উপভাষার অন্তর্গত। এর নিদর্শন—

দেব্যণং পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা মগেষু পি মে নিগোহাণি লোপাপিতাণি ছায়োপগাণি হোসংতি পসুমুণিষাণাং অংবাবডিক্কা লোপাপিতা অড্‌ঢকোসিক্কাণি পি মে উদুপাণাণি খাণাপিতাণি নিংসিধয়া চ কালাপিতা আপাণাণি মে বহুকাণি তত তত কালাপিতাণি পটিভোগায়ে পমুমণিসাণং। [ দিল্লী-তোপরা স্তম্ভলিপির সপ্তম অনুশাসন ]২

ধৌলীলিপি প্রাচ্যা উপভাষার নিদর্শন হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। এর নমুনা—

সবে মুনিসে পজা মমা। অথা পজায়ে ইছামি হকং কিংতি সবেন হিতসুখেন হিদলোকিকপাললোকিকেন যুজেবু তি। তথা সবমুনিসেসু পি ইছামি হকং।৩

উপরে শাহবাজগঢ়, গির্ণার, তোপ্‌রা, কালসী, ধৌলী ইত্যাদি স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল জাগতে পারে, এই ভেবে এই স্থানগুলি ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় অবস্থিত তা সংক্ষেপে বলে নিই।

শাহবাজগঢ় একটি গ্রাম। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আটক এবং পেশোয়ারের মাঝামাঝি মর্দান রেলস্টেশন। সেখান থেকে সাত-আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে শাহবাজগঢ়।

মান্‌সেহ্‌রা শহর অ্যাবটাবাদ থেকে যে-রাস্তাটি কাশ্মীরে গিয়েছে সেই রাস্তার উপরে অবস্থিত।

গুজরাটের জুনাগড় শহরের পূর্বদিকে মাইলখানেক দূরে প্রাচীন সুদর্শন হ্রদের

(২) দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা বলছেন—পশুর ও মানুষের ছায়াপ্রদ হবে বলে আমি পথে ন্যগ্রোধ রোপণ করেছি, আমবাগান বসিয়েছি; আধক্রোশ অন্তর অমি কূপ খনন করিয়েছি, সোপান বাঁধিয়েছি। যেখানে সেখানে আমি পশু ও মানুষের উপকারের জন্য জলছত্র বসিয়েছি।

(৩) সব মানুষ আমার প্রজা ( সন্তান )। যেমন আমি সন্তানের বিষয়ে এই চাই যে, তারা যেন ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সমস্ত হিতসুখ পায়, তেমনি সব মানুষের বিষয়েও আমি তাই চাই।

তীরে রৈবতক পাহাড়ের আধুনিক নাম গির্ণার। এই রৈবতক নামটির সঙ্গে পুরাণ-পাঠক নিশ্চয় পরিচিত—কবি নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যত্রয়ীর একটি এই নামে, অপর দুটি নাম 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস'।

কাল্সী গ্রাম মুসৌরী থেকে যোল মাইল দূরে। ধৌলী গ্রাম উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর থেকে মাইল চারেক দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে। জৌগড়ও এই উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার প্রায় সমুদ্রতীরবর্তী গঞ্জাম থেকে আঠারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে। তোপ্‌রা গ্রাম আম্বালা জেলায়।

এই সব জায়গা ছাড়াও শাহবাদের সাসারাম, জয়পুরের বৈরাট, মহীশূরের সিদ্ধিপুর, ব্রহ্মগিরি, মাদ্রাজের কুর্ণুল, মীরাট, কৌশাম্বী বিহারের চম্পারন জেলায়, জব্বলপুর সাঁচী, সারনাথ ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন অনুশাসন ও স্তম্ভলিপি পাওয়া গিয়েছে। ভারতের বাইরে নেপালের দু'এক জায়গায় স্তম্ভলিপির সন্ধান মিলেছে।

যে-সমস্ত প্রত্নলিপিতে প্রথমস্তরের প্রাকৃত ভাষার নমুনা পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত সুতনুকা প্রত্নলিপি। এটি অশোকের অনুশাসনের সমসাময়িক। পণ্ডিতেরা বলেন, মাগধী প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে এই প্রত্নলিপিটি বিশেষ মূল্যবান। সেই লিপিটি এই—

সুতনুক নাম দেবদশিকৃকি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।১

উড়িষ্যার উদয়গিরি পাহাড়ে হাতিগুম্ফার দরজায় কলিঙ্গরাজ খারবেলের অনুশাসনটিও মূল্যবান। তার একটু অংশ—

> কলিঙ্গাধিপতিনা সিরিখারবেলেন পন্দরস বসানি সিরিকড়ারসরীরবতা কীড়িতা কুমারকীড়িকা। ততো লেখরূপগণনা ব্যবহারবিধিবিসারদেন সববিজাবদাতেন নব বসানি যোবরজং পসাসিতং।২

সুতনুকা প্রত্নলিপিটির গুরুত্ব এইখানে যে, এর ভাষায় এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যা অশোকের অনুশাসনে পাওয়া যায় না, যদিও দুটোই একই সময়ের অন্তর্গত।

(১) সুতনুকা নামে ছিল দেবদাসী। তাকে কামনা করেছিল বারাণসীবাসী একজন রূপদক্ষ, নাম দেবদীন॥

(২) কলিঙ্গ-অধিপতি শ্রীখারবেল পনের বছর যাবৎ শ্রীকড়ার শরীর ধারণ করে বাল্যক্রীড়া করেছিলেন। তারপর লেখ, রূপ, গণনা, ব্যবহারবিধিবিশারদ এবং সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে নয় বছর ধরে যৌবরাজ্য শাসন করেছিলেন॥

সুতনুকা প্রত্নলিপির ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত মাগধী প্রাকৃতের আদিরূপ বলে কোনো কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন।

খারবেলের অনুশাসনও অশোকের সমসাময়িক। কিন্তু এর ভাষার সঙ্গে প্রাচ্যার খুব মিল নেই, আত্মীয়তা বেশী দক্ষিণ-পশ্চিমার সঙ্গে, যদিও ভৌগোলিক দিক দিয়ে এর ভাষা প্রাচ্যার প্রভাবান্বিত হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর ছিল। পণ্ডিতদের মতে খারবেল অনুশাসনের ভাষা পালি এবং অশোকের গির্ণার অনুশাসনের সমধর্মী। এর ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্যের ছাঁচে ঢালা 'সাধুভাষা'—তা কথ্য কিনা সন্দেহের বিষয়। ভাষায় সংস্কৃত রচনাভঙ্গীরও প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ, পণ্ডিতমহলে তখন সংস্কৃতের প্রাধান্য এবং তার প্রভাবে জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত-কালচারের আধিপত্য থাকায় প্রাকৃতে বা পালিতে তখন যা লিখিত হত তাতে লেখকদের জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক সংস্কৃত সাধু গদ্য বা পদ্য রচনার আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রভাব এসে পড়ত। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য প্রাকৃতের একটা সর্বজনবোধ্য standard রূপ দেওয়ার জন্য সংস্কৃত রচনাভঙ্গীর অনুসরণেরও প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় দেখা দিয়েছিল।

**প্রথম স্তরের** প্রাকৃতের অন্তর্গত পালি ভাষা। এই ভাষা দক্ষিণভারতের হীনযানী বৌদ্ধরাই চর্চা করতেন বেশি। পালিভাষা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে।

**দ্বিতীয় স্তরের** প্রাকৃতভাষার আনুমানিক সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। এই স্তরের ভাষার প্রধান নিদর্শন সমসাময়িক প্রত্নলিপিতে, সাহিত্যে ব্যবহৃত মাগধী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ইত্যাদি প্রাকৃতে এবং মহাযানী বৌদ্ধদের বৌদ্ধ-সংস্কৃতে। এই স্তরের ভাষার নিদর্শন আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে কোনো কোনো জায়গায় প্রাকৃতের ব্যবহার আছে, আগে নাটকের মধ্যে তা করা হত। এই প্রাকৃতের মধ্যে তৎকালীন প্রাকৃতের তিনটি উপস্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্য-এশিয়ার খোটানে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা যে 'ধম্মপদে'র সন্ধান পাওয়া গেছে তার ভাষাও প্রাকৃত। ভারতের বাইরে চৈনিক-তুর্কীস্তানের শান্‌শান্ রাজ্যের সীমান্তে একটি জায়গার নাম 'নিয়া'। সেখানকার বালুকাস্তূপ খুঁড়ে খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা কিছু প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে; সেগুলির অধিকাংশই ব্যবসাবাণিজ্য, শাসনকার্য ইত্যাদি সংক্রান্ত রিপোর্ট। তার একটির নমুনা—

> লিপেয় বিশ্নবেতি যথ অত্র থর্থোনি স্ত্রি নিখলিতন্তি তহ সুধ এদসন্তি মরিতন্তি অবশিঠি স্ত্রিয় ব মৃত্তন্তি। এদ প্রচে তু অপ্‌গেয়দে অনদি গিড়েসি লিপেয়স

ত্রি পতেনস্তবিদব হোঅতি। যহি এদ কিলমুদ্র অত্র এশতি প্রঠ অত্র অনদ প্রোছিদবো। ১

নিয়া নামক স্থানে এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'নিয়া-প্রাকৃত'॥

নাটকে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাচীনকালের আলঙ্কারিক এবং বৈয়াকরণরা যে নির্দেশগুলি দিয়েছেন সেগুলিও এই প্রসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক। 'সাহিত্য-দর্পণে' বলা হয়েছে—

> কৃতাত্মা উত্তম পুরুষরা সংস্কৃত এবং সেই রকম যোষিদ্রা শৌরসেনী ভাষা ব্যবহার করবেন। কিন্তু এই যোষিদ্দের যে-সমস্ত গাথা থাকবে, তাতে কিন্তু প্রযুক্ত হবে মহারাষ্ট্রী। এছাড়া যারা রাজাদের অন্তঃপুরচারী তাঁরা মাগধী, এবং চেট রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠী—এঁরা ব্যবহার করবেন অর্ধ-মাগধী। বিদূষক ইত্যাদিদের প্রাচ্য, ধূর্তদের অবন্তিকা, যোধনাগরিকদের দাক্ষিণাত্য, শকার ও শকদের শাকারী, দিব্যদের বাল্হীকী, দ্রাবিড়দের দ্রাবিড়ী, আভীরদের আভীরী, পুক্কসদের চণ্ডালী, আর কাঠপাতা দিয়ে যারা জীবিকানির্বাহ করে তাদের পক্ষে শাবরী ভাষা প্রশস্ত। সেইরকম অঙ্গারকারাদির পৈশাচি, উত্তম চেটীদের শৌরসেনী, উন্মত্ত ও আতুরদের শৌরসেনী ভাষা প্রয়োগ প্রশস্ত।······ঐশ্বর্যগাবত, দারিদ্র্যযুক্ত ও ভিক্ষুদের ভাষা প্রাকৃত এবং উত্তম পরিব্রাজিকা ব্রহ্মচারিণীদের ভাষা হবে সংস্কৃত। তাছাড়া দেবী মন্ত্রী ও গণিকাদের সম্বন্ধেও সংস্কৃত ভাষা বিহিত হয়ে থাকে।

'প্রাকৃত-চন্দ্রিকা'কার কৃষ্ণ পণ্ডিতের মতে—

> দেবতারা রাজারা মন্ত্রীরা অমাত্যরা এবং বণিকরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলবেন। কেউ কেউ সংস্কৃতে, কেউ কেউ বা প্রাকৃতে, কেউ কেউ সাধারণ ভাষায় এবং কোনো কোনো লোক ম্লেচ্ছ ভাষায় কথা বলবেন। যাগযজ্ঞাদিতে ম্লেচ্ছ ভাষার ব্যবহার চলবে না এবং স্ত্রী-লোকদেরও প্রাকৃত ভিন্ন অন্যভাষা চলবে না। কুলীন ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ ভাষা এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তির (অর্থাৎ অশিক্ষিত লোকের) সংস্কৃত প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যাঁরা পরিব্রাজক মুনি অথবা ব্রাহ্মণ তাঁদের সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা শাস্ত্রকারদের অভিপ্রায়সিদ্ধ নয়। প্রধান ব্যক্তিরা প্রায়ই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করবেন, তবে তাঁদের মধ্যে ভাষান্তরের ব্যবহারও কদাচিৎ দেখা যায়। বালক, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বৈশ্য ও অপ্সরারা—এঁদের সংস্কৃত ভাষা একেবারেই নিষিদ্ধ।······রাজা বা ব্রাহ্মণ এঁরা ক্রীড়ার জন্যে প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন।

(১) ল্যিপেয় জানাচ্ছে যে, ওখানে ডাইনীতে তিনজন স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে গিয়েছে। (সেই তিন-জনের মধ্যে) কেবল তার স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে, অবশিষ্টদের ছেড়ে দিয়েছে। এই সম্বন্ধে তুমি অপগেয়ের কাছে উপদেশ পেয়েছ—ল্যিপেয়কে তার স্ত্রীর জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যখন এই আজ্ঞাপত্র ওখানে গিয়ে পৌছবে, তখন তুমি ভালো ক'রে খোঁজ করবে।

প্রাকৃতভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে ভরতাজের মত—

> গাথা মাত্রই সংস্কৃতে লিখতে হবে। এছাড়া অন্যান্য যাবতীয় ভাষাই নাট্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যারা বালক, স্ত্রী, বৃদ্ধ, ভিক্ষুক, শ্রাবক কিংবা কপট দণ্ডী এবং গ্রহাভিভূত, মত্ত বা যণ্ডরূপী তারা প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করবে। নায়িকা বা সখীদের শৌরসেনী, বিদূষকদের প্রাচ্য, ধূর্তদের অবন্তিকা, রাক্ষসদের মাগধী, অন্তঃপুরবাসী চেট, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীদের অর্ধ-মাগধী ভাষাই শ্রেয়। শাকার, দিব্যভাষী, যোধ এবং ভারিশ—এদের জন্যে যথাক্রমে শকারী, বাল্হীক ও শাবরী ভাষাই প্রশস্ত।

এই উদ্ধৃতিগুলির অন্য দিকও লক্ষণীয়। সেটি তখনকার সামাজিক গঠন, শ্রেণী-বিভাগ ও নিয়মের দিক। কত জাতি গোষ্ঠী কৌম ইত্যাদি মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রচলনের সময় বাস করত তার একটা তির্যক ইঙ্গিত আমরা এর সাহায্যে পেতে পারি। কার কতখানি সামাজিক অধিকার ছিল তারও একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাই এবং সর্বোপরি স্পষ্ট হয় সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে সেকালের পণ্ডিতদের কতখানি গোঁড়ামি এবং রক্ষণশীলতা ছিল। বস্তুত, এই দৃষ্টিভঙ্গীই যে সংস্কৃত ভাষার সমাধি রচনা করেছে—একথা বললে খুব অসঙ্গত হয় না। সমাজে নারীর স্থানও দেখা যাচ্ছে তখন অবজ্ঞাত এবং তার অধিকারের ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত। ভাষাবিজ্ঞান এইভাবেই আমাদের সামাজিক ইতিহাসের উপর আলোকসম্পাত করে।

প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখি, উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে যে শাকারী, চণ্ডালী, শাবরী ইত্যাদির উল্লেখ আছে সেগুলি মাগধীরই বিভাষা বা আঞ্চলিক বিশেষত্বযুক্ত রকমফের। বাল্হীকী বাল্হীক দেশের উপভাষা। পুক্কস, রাক্ষস ইত্যাদিরা ভারতের তৎকালীন আদিবাসী সম্প্রদায়॥

প্রাকৃতভাষায় যে-সব ব্যাকরণ রচিত হয়েছে তাদের রচয়িতাদের নাম পূর্বে কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ব্যাকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সমন্তভদ্রের "প্রাকৃতব্যাকরণ"; হেমচন্দ্রের "প্রাকৃতশব্দানুশাসন"; রাম তর্কবাগীশের "প্রাকৃত-কল্পতরু", "প্রাকৃতকৌমুদী"; কাত্যায়নের "প্রাকৃত মঞ্জরী", নবচন্দ্রের "প্রাকৃতপ্রবোধ"। কাব্যগুলির মধ্যে, মহারাজ সাতবাহন প্রণীত 'গাহা সতসই' (গাথা সপ্তশতী); রাজা প্রবরসেনের "সেতুবন্ধ" এবং বাক্‌পতির "গৌড়বধ কাব্য" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য॥

## ॥ প্রাকৃত ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ॥

নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি যথা, বাংলা, হিন্দী, অসমিয়া, ওড়িয়া, গুজরাতি, মারাঠী ইত্যাদি—প্রাচীন আর্যভাষারই বিবর্তিত রূপ। আধুনিক বা নব্য রূপ পাওয়ার আগে এদের স্বরূপ লুকানো ছিল প্রাকৃত এবং অপভ্রংশে। সুতরাং নব্যভারতীয় আর্য ভাষার অধ্যয়ন ও আলোচনার জন্য প্রাকৃত অপভ্রংশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা আবশ্যক ॥

সংস্কৃত প্রাকৃতে পরিণত হওয়ার পর তাদের মধ্যে তিন বিষয়ে পরিবর্তন দেখা গেল—(১) **ধ্বনি পরিবর্তনে,** (২) **শব্দ ও ধাতুরূপে,** (৩) **পদযোগে।**

### ধ্বনিগত পরিবর্তন :

১ ॥ পালির মত প্রাকৃতে ঋ ৯ ধ্বনি নেই। ঋ-কারের উচ্চারণ অ, ই, উ, এ-তে পরিবর্তিত। ৯ সম্পূর্ণ লুপ্ত ॥ মৃগ>মগ, মিগ, মুগ। মৃত>মত। ঋষি>ইসি। মৃণাল>মৃণাল। গৃহ>গেহ, গহ।

২ ॥ ঐ-কার এবং ঔ-কার এ, ও-তে পরিবর্তিত। কখনও বা ঐ-কার উ, ও-তে, এবং ঔ-কার ই, এ-তে পরিবর্তিত। যেমন, ঔষধানি>ওসধাণি। মৌক্তিক>মুত্তিক। পৌর>পোর। তৈল>তেল। সৈন্ধব>সিন্ধব।

৩ ॥ অয়্, অব্ স্থলে এ, ও—ভবতি>ভোতি। পূজয়তি>পূজেদি।

৪ ॥ তিনটি স-ধ্বনির ( শ, ষ, স ) মধ্যে 'শ', 'ষ' লুপ্ত। কেবল মাগধী প্রাকৃতে 'শ' সংরক্ষিত। শুশ্রূষা>সুস্রুসা।

৫ ॥ পদের শেষে ম্ স্থলে অনুস্বার। সংস্কৃতের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব। যেমন, কান্তাং >কন্ত। দীর্ঘ>দিগ্‌ঘ।

৬ ॥ অন্ত্য স্বরবর্ণের পর সর্বদা বিসর্গ লোপ।
যেমন—জনঃ>জণ। নরঃ>ণরো। পুত্রাঃ>পুত্তা।

৭ ॥ দন্ত্য-ন ও মূর্ধন্য-ণ এর মধ্যে কেবল ণ সংরক্ষিত। তবে পৈশাচি প্রাকৃতে ন রক্ষিত। ন জানে>ণ আণে ( মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত )। ভটজনো> ফটচনো ( পৈ. প্রাকৃত )।

৮ ॥ দন্ত্য ব্যঞ্জন ধ্বনি মূর্ধন্যে পরিণত। যেমন কৃত>কট। দ্বাদশ>দুবাডস।

৯ ॥ পদের প্রথমে অবস্থিত বফলা, রফলা লুপ্ত। যেমন—

ব-ফলার লোপ—দ্বাদশ >দুবাডস।

র-ফলার লোপ—ম্রিয়মাণ>মিঅমাণ।

১০ ॥ স্বরভক্তির উদাহরণ : দ্বাদশ >দুবাডস। স্বামি>সুবামি।

সর্বত্র >সব্বত্ত। ক্ষুদ্র >খুদ্দ।

১১ ॥ সমীকরণের উদাহরণ : অগ্নি>অগ্গি। কর্ম>কম্ম।

চক্র>চক্ক ॥

**শব্দরূপে পরিবর্তন :**

(১) দ্বিবচন সম্পূর্ণ লুপ্ত। দ্বিবচনের স্থলে বহু বচন। দ্বৌ নরৌ>দ্বো ণরা।

(২) প্রাচীন ভারতীয়-আর্যে শব্দের আকৃতি ও লিঙ্গভেদে শব্দরূপে পরিবর্তন। প্রাকৃতে শব্দরূপ অনেক সরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাবতীয় পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ 'নর' শব্দের মত, আর সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গের রূপ 'লতা' শব্দের মত।

(৩) ব্যঞ্জনান্ত শব্দ স্বরান্তে পরিবর্তিত। রাজা>রয়়। কর্মনে>কম্মায়।

(৪) শব্দের শেষের ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের প্রভেদ লুপ্ত। চতুর্থীর ও পঞ্চমীর একবচন প্রায় লুপ্ত।

(৫) ২য়া ও ষষ্ঠীর দ্বারা ৪র্থী, এবং ৩য়া ও ৭মীর দ্বারা ৫মী বোঝানো হয়েছে। যেমন, নাস্তি হি কর্মতরং সর্বলোকে হিতত্বাৎ > নাস্তি হি কম্মতরং সব্বলোকহিতৎপা>ণথি হি কম্মতলা সব্বলোকহিতেণ।

**ধাতুরূপে পরিবর্তন :**

(১) সংস্কৃতে সূক্ষ্মভাবে কাল দশটি। প্রাকৃতে কাল মাত্র তিনটি।

(২) সংস্কৃতে ধাতুর 'গণ' দশটি। প্রাকৃতে 'গণ' মাত্র একটি। শ্রু ধাতু—সুণ্, জি ধাতু—জিণ্, ক্রী ধাতু—কিণ্ ইত্যাদি।

(৩) এক মূল ধাতু থেকে একাধিক নূতন ধাতুর উৎপত্তি।
√বাদ্= √বাজ্, √বাঅ।

(৪) ক্রিয়াপদে দ্বিবচন লুপ্ত।

(৫) আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদের মধ্যে প্রাকৃতে কেবল পরস্মৈপদ রক্ষিত, আত্মনেপদ লুপ্ত।

(৬) অসমাপিকা বোঝাতে ত্বাচ্ প্রত্যয় ব্যবহৃত : আলোচয়িত্বা>লোচেৎপা।

এই যে পরিবর্তনগুলি, সেগুলি হঠাৎ একদিনে হয়নি। বহু সময় ধরে নানা বিবর্তনের মধ্যে শেষে তারা এই রূপটি পেয়েছে॥

এই বিবর্তনের স্তরকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

**আদি স্তর** ( আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৭০০ থেকে খৃঃ পূঃ ২০০ ) এই স্তরের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যাবে অশোকের অনুশাসনগুলিতে কিংবা বৌদ্ধ পালিধর্মগ্রন্থগুলিতে। এই স্তরে যে-সমস্ত পরিবর্তন দেখা গেছে সেগুলি মোটামুটি এই :

ঋ-কার লুপ্ত। ঋ-কারের ধ্বনি অ-ই-উ-তে পরিবর্তিত। মৃণাল>মুণাল। শৃগাল>শিয়াল। গৃহ>গহ।

ঐ এবং ঔ পরিণত হয়েছে এ এবং ও-তে। তৈল>তেল। পৌর>পোর।

শব্দের শেষের ব্যঞ্জনবর্ণ, হসন্ত এবং বিসর্গ লোপ। রাজা>রাঅ। দৈবাৎ >দেবা। নরঃ>নর।

তিনটি স-ধ্বনির মধ্যে 'শ' এবং 'স'-এর স্থিতি। 'ষ' লুপ্ত। সর্বেষু >সব্বেসু।

মূর্ধন্য ধ্বনির দ্বারা দন্ত্যধ্বনির পরিবর্তন। প্রতিবিধান>পটিবিঢাণ।

সমীকরণের প্রবণতা—চক্র>চক্ক। কর্ম>কম্ম।

দীর্ঘ স্বরবর্ণের স্থলে হ্রস্ব স্বরবর্ণের ব্যবহার। কান্তাং>কন্ত।

সমস্ত শব্দরূপের অ-কারান্ত রূপ করার দিকে প্রবণতা।

দ্বিবচন লুপ্ত। ২য়া ও ষষ্ঠীর বিভক্তি দিয়ে চতুর্থী বোঝানোর চেষ্টা এই সময় থেকেই আরম্ভ।

এর পরে খৃষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে আরেকটি পরিবর্তন আসে। সেটি হচ্ছে অঘোষ এবং অল্পপ্রাণ বর্ণগুলির ঘোষবর্ণে রূপান্তর॥

**দ্বিতীয় স্তরের** আনুমানিক সময় ২৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ। এই স্তরের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃতে কিংবা প্রাকৃতেই রচিত বিভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থে।

এই স্তরের মূল লক্ষণ শব্দরূপের সরলতা।

বিভক্তির পরিবর্তে অনুসর্গের রীতিসিদ্ধ ব্যবহার।

অল্পপ্রাণ বর্ণের সম্পূর্ণ লোপ।

শেষ বা **তৃতীয়** স্তরটির আনুমানিক সময় ৬৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০ম শতাব্দী। এই স্তরের ভাষার পরিবর্তিত সরলীকৃত রূপটি শৌরসেনী অপভ্রংশে পাওয়া যাবে।

এই স্তরেই পদান্ত দীর্ঘস্বর হ্রস্বতে পরিণত।

বিভিন্ন স্বরান্ত শব্দের 'নর' শব্দের মত রূপ গঠনের দিকে প্রবণতা স্পষ্ট হতে থাকল।

সমস্ত কাল মুছে গিয়ে কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ থাকল। অতীতকাল বোঝাতে থাকল ভাব-কর্মবাচ্য।

অনুনাসিক বর্ণের যথেচ্ছ ব্যবহারও সুরু হল।

## ॥ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য ॥

আগেই উল্লিখিত হয়েছে প্রাকৃত ভাষাকে আঞ্চলিক বিশেষত্ব অনুযায়ী চারটি জাতিতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এই চারটির নাম মাগধী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী এবং পৈশাচি। ডঃ স্কুমার সেন মাগধীর আরেকটি ভাগ অর্ধ-মাগধীর কথা বলেছেন। এই চারটি বা সাড়ে চারটি প্রাকৃত ভাষার প্রত্যেকের মূল এক হলেও নানা কারণে এদের মধ্যে নিজস্ব কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেইগুলি এখন আলোচনা করা হবে। এই আলোচনা আরম্ভ করার আগে পাঠকদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—এই চার শ্রেণীর প্রাকৃতের মধ্যে কোন্‌টি অগ্রজ তা বলবার মত নিশ্চিত প্রমাণ পণ্ডিতদের হাতে নেই ॥

## ॥ মাগধী প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ॥

মাগধী প্রাকৃতের ব্যবহার সংস্কৃত নাটকে হয়েছে একেবারে অশিক্ষিত ইতর জনের কথ্য ভাষা হিসাবে। যেমন একশ বছর আগের বাংলা নাটকে ঝি চাকর বামুনের মুখের কথ্য ভাষা হিসাবে পূর্ববাংলার বা মেদিনীপুর বাঁকুড়া অঞ্চলের ভাষা হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হত ( এবং এখনও কোনো কোনো নাট্যকার ব্যবহার করছেন )। মনে হয় সেই উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে মাগধী প্রাকৃত ব্যবহার করতেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে দুষ্মন্তের আংটিটি যে ধীবর রোহিত মৎস্যের পেটের মধ্যে পেয়েছিল—তার মুখে কালিদাস মাগধী প্রাকৃত দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, তার দ্বারা লোকটির সামাজিক পরিচয় বোঝানো এবং কিঞ্চিৎ হাস্যরস সৃষ্টি করা।

মাগধী প্রাকৃতে 'র' ধ্বনি ল-তে পরিবর্তিত : উদরভ্যন্তরে>উদলব্‌ভন্তলে।

'স' ও 'ষ, 'শ'-তে পরিবর্তিত। রোহিত মৎস্য>লোহিদমশ্চ। এষঃ>এশে।

অকারান্ত পদের শেষের বিসর্গ 'এ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত : শোভনঃ>শোহনে।

ক্ষ, চ্ছ এবং ল্য যথাক্রমে শ্‌ক, শ্চ এবং য্য-তে পরিবর্তিত :

বৃক্ষ>বিশ্‌ক ( বিস্ক ) ; পৃচ্ছ>পিশ্চ। কল্য>কয্য।

জ-এর বদলে য : জানাতি>যাণাদি।

সম্বোধনে অ-কারান্ত পদ আ-কারান্ত :

হে দেব>হে দেবা।

শ্ন, শ্ট, শ্ত, শ্ক শ্চ প্রভৃতি যুক্তাক্ষর সমীকরণ না হয়ে অবস্থিতি। এই বৈশিষ্ট্যটি মাগধী প্রাকৃতের নিজস্ব ॥

## ॥ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ॥

প্রাকৃত বৈয়াকরণরা মহারাষ্ট্রীকেই মূল প্রাকৃত ধরেছেন। সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত গান এবং কবিতাগুলি প্রায় সবই মহারাষ্ট্রীতে লিখিত। সেতুবন্ধ বা রাবণবধ, গাহা সত্তসই ( সপ্তশতী ), বাক্‌পতি লিখিত গৌড়বাহ বা গৌড়বধ সবই মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা ॥

মহারাষ্ট্রীতে পদান্তে ব্যঞ্জন লোপ বৈদিকের নিয়মানুসারে। পদমধ্যের অঘোষ মহাপ্রাণবর্ণ লুপ্ত, ঘোষ মহাপ্রাণ 'হ'-তে পরিণত :

সফল>সঅল। কধম>কহম।

সপ্তমীর একবচনে স্মিং প্রত্যয় :

সর্বেস্মিং>সব্‌বেস্মিং।

ইয় প্রত্যয় হয় ইজ্জ : করণীয়>করণিজ্জং।

ক্তাচ্ প্রত্যয়ের পরিবর্তনে উল্ প্রত্যয়ের আগম।

দৃষ্ট্বা>দিচ্ছিউল।

শব্দ ও ধাতুরূপে প্রাচীনত্বের অর্থাৎ বৈদিকের চিহ্ন কিছু কিছু আছে ॥

## ॥ শৌরসেনী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য ॥

নারীর এবং অশিক্ষিত পুরুষের ভাষা হিসাবে সংস্কৃত নাটকে শৌরসেনীর ব্যবহার। অনেক পণ্ডিত শৌরসেনী প্রাকৃতকে শূরসেন বা মথুরা অঞ্চলের কথিত ভাষা বলে মনে করেন। তবে এ নিতান্তই অনুমান, এর স্বপক্ষে প্রমাণ কম। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন :

> "...মহারাষ্ট্রীর সঙ্গে শৌরসেনীর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, একটি ছাড়া—স্বরমধ্যগত দ-কার ও ধ-কারের স্থিতি ( যেমন শৌ. গচ্ছদি, মা. গচ্ছই <গচ্ছতি ; শৌ. কধেদি, মা. কহেই<কথয়তি )। শৌরসেনীর এই লক্ষণটি হইতেছে দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয়-আর্যের আদি (অথবা মধ্য,—দ-কারের ও ধ-কারের উচ্চারণ সিদ্ধ হইলে ) উপস্তরের জের ॥"

[ ভাষার ইতিবৃত্ত। ৫ম সংস্করণ। ৯২-৯৩ পৃঃ ॥ ]

শৌরসেনীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

শৌরসেনী সংস্কৃত ভাষার অনুগামী। র বর্ণের প্রাধান্য। ক গ চ জ ত দ পদমধ্যে থাকলে তা লুপ্ত হয়নি। পশ্চিমা হিন্দীর পূর্বপুরুষ হিসাবে শৌরসেনীকে ধরা যায়। ডঃ সুকুমার সেন আরও বলেছেন :

> "শূরসেন মধ্যদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চল। মধ্যদেশ সংস্কৃত-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং এই অঞ্চলেই দক্ষিণ-পশ্চিমা উপভাষা সাহিত্যিকদের হাতে গদ্যে শৌরসেনী প্রাকৃত রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল।"

[ ঐ, পৃষ্ঠা ৯৩ ]

## ॥ পৈশাচি প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য ॥

পৈশাচি প্রাকৃত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কথ্য ভাষা। লোক-সাহিত্যে এর কদর ছিল, কিন্তু শিষ্ট-সাহিত্যে এর কোনো স্থান ছিল না। পৈশাচিতে গুণাঢ্য যে 'বড্ডকহা' সংগ্রহ করেন তার কাহিনীগুলি অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃতে থেকে গিয়েছে। পৈশাচি প্রাকৃতের সঙ্গে গান্ধারীর মিল আছে। ডঃ সেন সিদ্ধান্ত করেছেন পৈশাচি অপভ্রংশের পূর্বপুরুষ। পৈশাচি প্রাকৃতের প্রধান বিশেষত্ব 'স্বরমধ্যের ঘোষবৎ ব্যঞ্জনের ঘোষহীনতা' ও 'স্বরমধ্যগত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের অ-লোপ ॥'

নগর>নকর। রাজা>রাচা। ভজতি>ফচতি।

আত্মনেপদের ধাতুর পরস্মৈপদে রূপান্তর : লভন্তে>লফন্তি।

## ॥ প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণগত বিশেষত্ব ॥

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত এবং পালি ব্যাকরণের সরলতর রূপ। সংস্কৃতের ব্যাকরণ যেমন নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ, কোথাও তার কোনো বিচ্যুতি সহ্য করা হয়না—পালি এবং প্রাকৃতে নিয়মের কঠোরতা অত নয়॥

প্রাকৃত ভাষায় ঋ, ৯, ঐ, ঔ এই স্বরগুলি নেই। এগুলি সবই ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে অন্য স্বরবর্ণে পরিবর্তিত হয়েছে।

ঋ পরিবর্তিত হয়েছে—রি : ঋণং>রিণং। অ : ঘৃতং>ঘতং।
এ : বৃন্তং>বেণ্টং। উ : বৃদ্ধ>বুড্ঢো॥

ঐ-ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে—এ : তৈলং>তেলং। অই : ঐশ্বর্যং>অইসরিয়ং।
ঈ : ধৈর্যং>ধীরং॥

ঔ-ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে—উ : মৌক্তিক>মুত্তিক॥

আ, ঈ, ঊ এই কটি দীর্ঘস্বরের পরে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়ে যায় : কার্য>কজ্জ। তীক্ষ্ণং>তিক্‌খং। ঊর্ধ্বং>উড্ঢং।

হ্রস্ব স্বরের পর সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয় এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত হয় : জিহ্বা=জীহা।

প্রাকৃতে ষ, শ নেই ; কেবল দন্ত্য স। অবশ্য মাগধী প্রাকৃতে শ-এর ব্যবহার আছে।

প্রাকৃতে ন নেই—সবই ণ—একমাত্র পৈশাচি প্রাকৃতে ছাড়া।

ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, বর্গীয় ব, অন্তঃস্থ-ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লুপ্ত :

মুকুল>মউল। সাগর>সাঅর। বচনং>বঅণং। রজতং>রঅতং। বিতাণং >বিআণং। জীবং>জীঅং। আবার কোথাও কোথাও লুপ্ত নয়। যেমন, কুসুমং, অবজলং, পিঅগমণং ইত্যাদি॥

খ, থ, ভ, ধ—ইত্যাদির জায়গায় আসে হ। যেমন, প্রিয়সখী>পিয়সহি। গাথা> গাহা। রাধা>রাহা। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লুপ্ত হয় না—পথলো, পলংঘণো, অধীর।

ণ, ম, ল, হ—এগুলি বজায় আছে। কোথাও আবার 'শ'-র জায়গায় 'হ' বা 'স' দুটোই হয়। একাদশ>এগারহ্। দ্বাদস>দুবাডস্>বারহ্।

ক, গ, ত, ঙ, দ, প, স—ইত্যাদি কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে লুপ্ত হয়:

ভক্ত>ভত্ত। স্নিগ্ধ>সিণিদ্‌ধ। মুদ্গর>মুগ্‌গরো। সুপ্ত>সুত্ত।

ম,ন,য-ফলা কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে লুপ্ত হয়—রশ্মি>রস্‌সী। নগ্ন>ণগ্‌গো।

ল, ব, র-ও কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলে লোপ পায়:

বল্কল>বক্কল। অর্ক>অক্ক। পক্ব>পক্ক। কথনও বা বিপ্রকর্ষের নিয়মে ধ্বনি-পরিবর্তন হয়: শ্রী>সিরি, বাংলায় 'ছিরি'। ক্লেশ>কিলেস॥

## ॥ প্রাকৃতে শব্দরূপ ॥

প্রাকৃত শব্দরূপে দ্বিবচন নেই, সম্প্রদান কারক নেই। ২য়া, ৪র্থী ও ৬ষ্ঠীর রূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক, আবার কোথাও ষষ্ঠী ও চতুর্থীর রূপ এক।
নীচে প্রাকৃত ভাষার কয়েকটি শব্দের শব্দরূপের নমুনা দেখানো হল ॥

### । পুংলিঙ্গ, অ-কারান্ত।

#### ॥ 'ণর' শব্দ ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | ণরো | ণরা |
| ২য়া | ণরং | ণরা, ণরে |
| ৩য়া | ণরেণ | ণরেহি |
| ৪র্থী | ণরং, ণরস্স | ণরা, ণরে |
| ৫মী | ণরাহি, ণরা | ণরেহি |
| ৬ষ্ঠী | ণরস্স | ণরাণং |
| ৭মী | ণরে, ণরম্মি | ণরেস্থ |
| সম্বোধন | ণর | ণরা |

### । স্ত্রীলিঙ্গ 'আ'-কারান্ত শব্দ।

#### ॥ মাআ ( মাতৃ ) ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | মাআ | মাআ |
| ২য়া | মাঅং | মাআও |
| ৩য়া | মাআএ | মাআহিংতো, মাআসুংতো |
| ৪র্থী | মাআএ | মাআণং |
| ৫মী | মাআএ | মাআহিং, মাআহি |
| ৬ষ্ঠী | মাআএ | মাআণং |
| ৭মী | মাআএ | মাআসু |
| সম্বোধন | মাএ | মাআও |

## । স্ত্রীলিঙ্গ ঈ-কারান্ত শব্দ ।

### ॥ ণঈ ( নদী ) ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | ণঈ | ণঈও, ণঈউ |
| ২য়া | ণঈং | ণঈও, ণঈউ |
| ৩য়া | ণঈআ | ণঈহিং, ণঈহি |
| ৪র্থী | ণঈআ | ণঈণং |
| ৫মী | ণঈহি | ণঈহিংতো, ণঈস্থংতো |
| ষষ্ঠী | ণঈআ | ণঈণং |
| ৭মী | ণঈই, ণঈএ | ণঈস্থ |
| সম্বোধন | ণঈ | ণঈও |

## । ক্লীবলিঙ্গ শব্দ ।

### ॥ বণ ( বন ) ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | বণং | বণাইং, বণাণি |
| ২য়া | বণং | বণে, বণা |
| ৩য়া | বণেণ | বণেহি, বণেহিং |
| ৪র্থী | বণস্স | বণাণং |
| ৫মী | বণাহি | বণাহিংতো, বণাস্থংতো |
| ৬ষ্ঠী | বণস্স | বণাণং |
| ৭মী | বণে | বণেস্থ |
| সম্বোধন | বণ | বণাইং, বণাই ॥ |

## । সর্বনাম শব্দ ।

### ॥ ত ( তদ্ ) পুংলিঙ্গ ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | তো | তে |
| ২য়া | তং | তে |
| ৩য়া | তেণ | তেহিং |
| ৪র্থী | তস্স | তাণং |
| ৫মী | তত্তো, তদো, তত্তু, তহু | তাহিংতো, তাস্থংতো |
| ৬ষ্ঠী | তস্স, তাস, সে | তাণং, তাণ, তেসিং |
| ৭মী | তস্সিং, তম্মিং, তহিং | তেস্থ, তেস্থং |

## । সর্বনাম শব্দ ।

### ॥ অহং ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | অহং, অম্হি, অম্মি | বয়ং, অম্হে, অম্হো |
| ২য়া | মাং, মমং | অম্হে, অম্হো, ণে |
| ৩য়া | মএ, মে, মই | অম্হেহি, অম্হেহিং |
| ৪র্থী | মাং, মমং | অম্হে, অম্হো, ণে |
| ৫মী | মইত্তো, মজ্ঝত্তো | অম্হেহিংতো, অম্হেসুংতো |
| ৬ষ্ঠী | মে, মম, অম্হং | অম্হাণ্ |
| ৭মী | ময়ি | অংহেসু, মমসু |

## । সর্বনাম শব্দ ।

### ॥ তং ( যুষ্মদ্ ) ॥

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| ১মা | তং, তুমং, তুবং | তুম্হে, তুম্হ |
| ২য়া | তুং, তুবং, তুএ, তুমে | তুম্হে, তুব্ভে |
| ৩য়া | তই, তে, তুম্এ | তুম্হেহিং, তুজ্ঝেহি |
| ৪র্থী | তুং, তুবং | তুম্হে, তুব্ভে |
| ৫মী | তুমাও, তুমাহিং | তুম্হাহিংতো, তুম্হাসুংতো |
| ৬ষ্ঠী | তে, তুমং, তুহং | তুম্হ, তুজ্ঝং |
| ৭মী | তই, তুম্মে | তুম্হেসু |

অহং এবং তং শব্দের শব্দরূপে একবচন এবং বহুবচনে 'ম' স্থানে অনুস্বরও ব্যবহৃত হতে পারে ॥

## ॥ প্রাকৃতে ধাতুরূপ ॥

প্রাকৃত ভাষার ধাতুরূপও সরল। এখানে দ্বিবচন নেই। কাল মোটামুটি তিনটি—বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অনুজ্ঞা। কর্মবাচ্যে কর্তৃবাচ্যের বিভক্তি হয়। পঠ্যাতে>পড়িঅই। য-ফলার জায়গায় পূর্ববর্তী বর্ণের দ্বিত্ব হয়—গম্যাতে>গম্মই।

ণিচ্ প্রত্যয়ে সংস্কৃতের অয়্ স্থানে এ—যেমন, হাসয়তি>হাসেই। কারয়তি>কারেই। কখনও কখনও ণিচ্ প্রত্যয়ে—আবে-ও হয়। যেমন, হাসয়তি>হসাবেই। কারয়তি>করাবেই॥

কর্মবাচ্য অতীত কালে ক্ত প্রত্যয়ের জায়গায় ত বা অ। যেমন—শ্রুত>সুঅ, সুত॥

## ॥ প্রাকৃতে অব্যয় ॥

সংস্কৃত অব্যয়ের পি, অপি, খলু, ইতি ইত্যাদি প্রাকৃতে বর্ণবিপর্যয়ের ফলে—বি, পি, কলু, তি ইত্যাদি রূপ নিয়েছে॥

## ॥ অপভ্রংশ ॥

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার ক্রমপরিণতির শেষ স্তরটির নাম অপভ্রংশ। প্রাকৃতের আরো সরল সহজ লৌকিক রূপটি অপভ্রংশের মধ্যে আমরা পাই। খৃষ্টীয় আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যেই এই স্তরটি একটি সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করে। পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন বলেন, মধ্যস্তরের প্রাকৃতের শেষ অবস্থাটিই অপভ্রংশ। অপভ্রংশ কোনোদিন সমাজের উচ্চকোটি লোকের মুখের বা জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়নি, কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে, যেটাকে আমরা বলি আর্যেতর Substratum—সেখানে মানুষের প্রাণের ভাষা ও লোকসাহিত্যের প্রধান বাহক হিসাবে অপভ্রংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে॥

এই অপভ্রংশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কালগত ও স্থানগত রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্তর্গত বাংলা, পাঞ্জাবী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছে। অপভ্রংশের এবং নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার ঠিক মাঝামাঝি 'অবহট্‌ঠ'। অপভ্রংশের শেষ স্তর এবং নব্য ভারতীয়-আর্যের আদি স্তরটিকে ডঃ সুকুমার সেন-অবহট্‌ঠ বলেছেন। খুব সূক্ষ্ম বিচার ছাড়া এর পার্থক্য ধরা পড়েনা। ডঃ সেন এর যুক্তি হিসাবে একটি দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন—সেটি হচ্ছে 'সাহিত্যিক ভাষায় রক্ষণশীলতা' এবং অন্য কারণ 'নব্য ভারতীয় সাহিত্যে লৌকিকের স্থায়ী প্রভাব'।

আনুমানিক ৮০০-১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্যতম প্রধান ভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে সংস্কৃত, প্রাকৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ—এই তিন রকমের ভাষা প্রচলিত ছিল। এই তিনটি ভাষা তিন ধরনের সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা-শাস্ত্র, সাহিত্য রচনায় শিক্ষিত বাঙালী ব্যবহার করতেন সংস্কৃত। কোনো কোনো সময়ে প্রাকৃতে রচিত এই ধরনের গ্রন্থকেও তাঁরা সংস্কৃত করে নিতেন। প্রাকৃত মিশ্রিত সংস্কৃতে বা বৌদ্ধসংস্কৃতে মহাযানী বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা তাঁদের ধর্ম দর্শন আলোচনা করতেন। আর, সমাজের নিম্নস্তরের লৌকিক সাহিত্য রচনায় লোক-কবিরা ব্যবহার করতেন অপভ্রংশ। বাংলাদেশে মাগধী, শৌরসেনী দুটো প্রাকৃতের অপভ্রংশই কাব্যরচনায় ব্যবহৃত হত, দুটোতে খুব বেশি পার্থক্যও ছিলনা। বহুজন ব্যবহৃত এই অপভ্রংশ দুটির প্রভাব জনসমাজে ছিল ব্যাপক ও গভীর। শৌরসেনী

প্রাকৃতের অপভ্রংশ শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র উত্তর-ভারতেই ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও ব্যবহৃত হত। সেই কারণেই বাংলাদেশের সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা এবং ব্রাহ্মণ কবিদের কেউ কেউ অপংভ্রংশে কাব্য রচনা করেছেন। কাহ্নপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যরা শৌরসেনী অপভ্রংশেই তাঁদের দোহাগুলি রচনা করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁর 'কীর্তিলতা' কাব্যটিও রচনা করেন শৌরসেনী অপভ্রংশে। এমন কি কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-ও যে মূলে শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত হয়েছিল, এমন কথাও কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন। সেটা সত্যি হোক বা না হোক, কবি জয়দেব যে অপভ্রংশে গীতিকবিতা রচনা করতেন তার প্রমাণ আছে। গুর্জরী ও মারু রাগে গেয় জয়দেবের দুটি গান শিখদের শ্রীগুরুগ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে, অবশ্য কিছুটা বিকৃতরূপে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই গান দুটি উদ্ধার করেছেন॥

অপভ্রংশে কাব্যসাহিত্য রচনার কতকগুলি বাস্তব কারণ ছিল। মাগধী, শৌরসেনী ইত্যাদি অপভ্রংশের ভাষা ছিল খুবই সহজে বোঝাবার এবং নিরক্ষর জনসাধারণের অধিগম্য। কবি শিল্পী ও সহজুয়ানী সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁদের সৃষ্টি, অনুভূতি, দর্শনের কথাগুলি সাধারণ লোকের চিত্তের দুয়ারে পৌছিয়ে দেওয়া। তাঁরা সবাই ভালো সংস্কৃত জেনেও সংস্কৃতের মাধ্যমে বক্তব্যকে উপস্থিত করেননি, কারণ তাতে তাঁদের বক্তব্যের আবেদন অতি অল্প সংখ্যক লোকের মনে ঘা দিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ জনসাধারণের দ্বারা আদৃত হবে না বলে একমাত্র সেই সব গ্রন্থই লেখা হত সংস্কৃতে, কিন্তু কাব্যচর্চা তাঁরা বেশির ভাগ করতেন অপভ্রংশে। বিশেষ করে বাঙালী কবিদের এই বিষয়ে আশ্চর্য উদারতা এবং বাস্তববোধ ছিল। তখন অপভ্রংশ এবং নতুন-সৃষ্ট বাংলা এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেনি যাতে কবিতার সূক্ষ্মভাব ও দর্শনের গভীর তত্ত্বগুলি এই ভাষায় সঠিকভাবে বাহিত হতে পারে। তবুও সব জেনেও, শিক্ষিত, বিদগ্ধ, সংস্কৃতিপূত চিত্ত হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালী কবিরা ছিলেন প্রাগ্রসরবুদ্ধি ও গণচেতনাসম্পন্ন—তাই পণ্ডিত সমাজে অনাদৃত ও উপেক্ষিত অপভ্রংশকে এঁরা অবহেলা করেননি—একেই সানন্দে মনোভাব ব্যক্ত করার বাহন হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই সৎসাহস এবং উদারতা বাঙালী কিছু কিছু পণ্ডিত কবিদের মধ্যে ছিল বলেই তাঁদের কারও কারও রচনায় বৃহত্তর জনসমাজের নানা সুখ দুঃখ, আনন্দ ভাবনা, বেদনা কল্পনা, বস্তুময় কাব্যময় রূপ নিয়েছে। জনতার ভাষা হিসাবে প্রায় ৫০০ বছর অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ সমগ্র উত্তরভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল॥

চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামে অবহট্‌ঠে বা অপভ্রংশে রচিত একটি গীতি-কবিতার সঙ্কলন গ্রথিত হয়। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের সম্ভবতঃ উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির নমুনা সঙ্কলন করা। এই সঙ্কলন গ্রন্থটিতে আনুমানিক ১১০০—১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এমন কতকগুলি শ্লোক আছে, যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু বাংলা শব্দ, বাঙালী ধরন-ধারণ রীতি প্রকৃতি সুস্পষ্ট। ভাষার দিক থেকেও এদের সঙ্গে গীতগোবিন্দের মিল উপেক্ষা করা যায় না। এদের রূপ রস ভাব আবহ সবই বাংলার। বস্তুত ছন্দে রসে ভাবে ক্ষুদ্র-পরিসরে ঘনীভূত এমন অপূর্ব কাব্য প্রাচীন সাহিত্যে খুব বেশি নেই ॥

প্রাকৃতপৈঙ্গলে শুধু প্রেম বা ভক্তি রসের কবিতা আছে তাই নয়, ডক্টর সুকুমার সেন অনেকগুলি বীররসের কবিতাও তার মধ্যে থেকে উদ্ধার করেছেন। লৌকিক রাধাকৃষ্ণের কথা, রামচন্দ্রের কথা নিয়েও ছোট ছোট কবিতা কিছু কিছু আছে। শিবপার্বতীর লৌকিক গার্হস্থ্য জীবনের সুখ দুঃখের প্রাচীন নিদর্শনও এখানে পাই। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থেরও অনেক শ্লোকে শিবপার্বতীর লৌকিক সুখদুঃখময় দাম্পত্য-জীবনের পরিচয় পাচ্ছি। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতেও ঐ একই চিত্র কিছুটা পরিণতরূপে আমরা দেখছি। এই কবিতাগুলি সবই তুর্কী আক্রমণের পূর্বে রচিত। 'শেক-শুভোদয়া'য় ১৯শে অধ্যায়ের একটি শ্লোক প্রাক্‌তুর্কী আমলের। ডক্টর সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, 'শেক-শুভোদয়া'র কোনো কোনো শ্লোক অপভ্রংশে রচিত ॥

ডাক ও খনার বচন নামে প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ এবং শুভংকরের নামে প্রচলিত গণিত-আর্যার শ্লোকগুলিতে অপভ্রংশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এত আছে যে, সেগুলি যে মূলে অপভ্রংশে রচিত তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না ॥

## ॥ অপভ্রংশের ব্যাকরণগত বিশেষত্ব ॥

অপভ্রংশের ব্যাকরণে যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিয়মশৃঙ্খলাহীনতা। পালি বা প্রাকৃতের ব্যাকরণে কিছুটা নিয়মের বাঁধন আছে, কিন্তু অপভ্রংশে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে কিছু কিছু বিশেষত্ব লক্ষণীয় ॥

**অপভ্রংশে ধ্বনি পরিবর্তন :**

স্বরবর্ণের পরে ক, খ, ত, থ, প, ফ থাকলে তা বহুক্ষেত্রে গ, ঘ, দ, ধ, ব, ভ তে পরিণত হয় ॥

দীর্ঘস্বর প্রায়ই হ্রস্বস্বর হয়। স্ত্রী>ইত্থি ॥

য-ফলার পরিবর্তন হয় পূর্ববর্ণের দ্বিত্বে। ব্যণিজ্য>বণিজ্জ। শব্দের শেষের ই, উ অনুনাসিক হয় ॥

স্বরবর্ণের 'ম' বহুক্ষেত্রে বঁ-তে পরিণত হয়—কমলম্>গবঁলু। কখনও কখনও অনুরূপ স্বরধ্বনির সমীকরণ হয়—প্রিয়তর>পিঅঅর ॥

আবার, যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের একটি লোপ পায় এবং পূর্বস্বর বা পরবর্তী স্বর দ্বিত্ব হয়—জন্ম>জম্ম। পুত্র>পুত্ত ॥

আ কিংবা উ-এর আগের 'ম' লুপ্ত হয়—যমুনা>জউনা।

**লিঙ্গ পরিবর্তনে** কোনো নিয়ম নেই। পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ স্ত্রী পুরুষ জীবজন্তু নির্বিশেষে নির্বিচারে ব্যবহৃত হতে পারে ॥

পালি ও প্রাকৃতের সঙ্গে **শব্দরূপ ও ধাতুরূপের** দিক দিয়ে অপভ্রংশের কিছুটা মিল আছে ॥

'মত' এই অর্থে আল, আলু, ইল্ল, উল্ল প্রত্যয় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শিখাবৎ>শিখা+আল>সিহাল। তেমনি নিদ্রালু>নিন্দালু। গোহাল>গোহিল্ল। দর্প+উল্ল>দপ্পুল্ল>দপ্পুল ॥

## ॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ পালি প্রাকৃত অপভ্রংশে রচিত
সাহিত্যের নিদর্শন ॥

*                    *

॥ টীকা ও বাংলা অনুবাদসহ ॥

*                    *

## ॥ পালি ॥

মিলিন্দ পণ্‌হো

মখাদেব জাতক

বুদ্ধ এবং তাঁর পিতা

ধণিয় সুত্ত হইতে অংশবিশেষ

থেরী গাথা ॥ অনোপমা

সুভাসিতম্‌

## ॥ প্রাকৃত ॥

| | |
|---|---|
| কাব্যাংশ | অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ |
| কাব্যাংশ | বিক্রমোর্বশী |
| নাটক | অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ ( ৬ষ্ঠ অঙ্ক ) |
| নাটক | মৃচ্ছকটিক ( ৩য় অঙ্ক ) |

## ॥ অপভ্রংশ ॥

সরহ-র দোহাকোষ

প্রাকৃতপৈঙ্গল থেকে শ্লোকসমূহ ॥

[ নাগসেন এবং মিলিন্দের কথোপকথন ]

রাজা আহ : ভদন্তে নাগসেন কেণ কারণেণ মণুস্‌স ণ সব্বে সমকা ? অঞ্‌ঞে দীগ্‌ঘায়ুকা, অঞ্‌ঞে অপ্‌পায়ুকা, অঞ্‌ঞে বভালাভা, অঞ্‌ঞে অপ্পলাভা ; অঞ্‌ঞে বভাবাধা, অঞ্‌ঞে অপ্পবাধা ; অঞ্‌ঞে দুব্‌বণ্ণা, অঞ্‌ঞে বণ্ণবন্ত ; অঞ্‌ঞে অপ্‌পেসক্‌খা, অঞ্‌ঞে মহেসক্‌থা ; অঞ্‌ঞে অপ্পভোগা, অঞ্‌ঞে মহাভোগা ; অঞ্‌ঞে ণীচকুলিণা, অঞ্‌ঞে মহাকুলিণা ; অঞ্‌ঞে দুপ্‌পঞ্‌ঞা, পঞ্‌ঞাবন্ত তি ?

রাজা বললেন, হে নাগসেন, কোন্ কারণে মানুষেরা সব সমান হয় না—কেউ দীর্ঘজীবী, কেউ অল্পায়ু ; কেউ বহু লাভ করে, কেউ অল্প লাভ করে ; কারো (জীবনে) বহু বাধা, কারো বা অল্প ; কেউ দুর্বল, কেউ বলবন্ত ; কেউ কুৎসিত , কেউ বা সুন্দর, কেউ অল্প ভোগ করে, কেউ বা মহাভোগী ; কেউ নীচকুলে জন্মায়, কেউ বা মহা কুলীন ; কেউ প্রজ্ঞাহীন, কেউ বা প্রজ্ঞাবন্ত ?

থের আহ : কিস্‌স পণ মহারাজ রুক্‌খা ণ সব্বে সমকা ! অঞ্‌ঞে অম্‌বিলা, অঞ্‌ঞে লভণা, অঞ্‌ঞে তিত্তকা, অঞ্‌ঞে কটুকা, অঞ্‌ঞে কসাবা, অঞ্‌ঞে মধুরা তি ?

জ্যেষ্ঠ উত্তর দিলেন, মহারাজ, সব গাছগুলি কেন একরকম হয় না। কেউ অম্ল, কেউ লবণাক্ত, কেউ তিক্ত, কেউ কটু, কেউ কষায়, কেউ মধুর।

রাজা : মঞ্‌ঞামি ভন্তে বীজাণাং ণাণা কারণেণ তি ॥

রাজা বললেন : আমার মনে হয়, নানা রকমের বীজ থেকে তারা জন্মায়—এই তার হেতু।

নাগসেন : এবং এব খো মহারাজ কম্মণাং ণাণা কারণেণ মণুস্‌সা ণ সব্বে সমকা। অঞ্‌ঞে অপ্পায়ুকা, অঞ্‌ঞে দীগ্‌ঘায়ুকা ; অঞ্‌ঞে বভাবাধা, অঞ্‌ঞে অপ্পবাধা ; অঞ্‌ঞে দুব্‌বণ্ণা, অঞ্‌ঞে বণ্ণবন্ত ; অঞ্‌ঞে অপ্‌পেসক্‌খা অঞ্‌ঞে মহেসক্‌থা ; অঞ্‌ঞে অপ্পভোগা ;

অঞ্ঞে মহাভোগা ; অঞ্ঞে নীচকুলিণা, অঞ্ঞে মহাকুলীণা ; অঞ্ঞে দুপ্পঞ্ঞা, অঞ্ঞে পঞ্ঞাবন্ত। ভাসিতং-প-এতং মহারাজ ভগবতা : কম্মস্সকা মাণব সত্তা কম্মদায়াদা কম্মযোণি কম্মবন্ধু কম্মপতিসরণা॥ কম্মং সত্তে বিভজতি ইদং হীণপ্পণিততায়া তি॥

নাগসেন : এই কারণে, হে মহারাজ, কর্মের বিভিন্নতার জন্য ( নানা রকম কর্মের কারণের জন্য ) সব মানুষ সমান হয় না। কারো অল্প আয়ু, কারো দীর্ঘ আয়ু, কেউ অল্পবাধা, কেউ মহাবাধা ; কেউ দুর্বল, কেউ বলবান ; কেউ দেখতে সুন্দর, কেউ কুৎসিত ; কেউ অল্পভোগী, কেউ মহাভোগী ; কেউ নীচকুলজাত, কেউ মহাকুলজাত ; কেউ প্রজ্ঞাহীন, কেউ প্রজ্ঞাবান। সেই জন্যই হে মহারাজ, ভগবান (বুদ্ধ) বলেছেন, মানুষ তার কর্মদায়জাত, কর্মযোনিপ্রাপ্ত, কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ এবং কর্মই তাদের শরণ। কর্মই তাদের হীন বা উচ্চ ইত্যাদি ভাবে ভাগ করে॥

: কল্লো সি ভন্তে নাগসেন তি।

রাজা আহ : ভন্তে নাগসেন তুম্হে ভণথ: 'কিং তি ইমং দুক্খং নিরুজ্ঝেয় অঞ্ঞঞ্ঞ চ দুক্খং ণ উপজ্জেয়তি' ?

নাগসেন : এতদত্থা মহারাজ অম্হাকং পব্বজ্জতি।

রাজা : কিং পতিগচ্ছ'এব বায়মিতেণ ণণু সম্পত্তে কালে বায়ামিতব্বাণতি ?

থের আহ : সম্পত্তেকালে মহারাজ বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি, পতিগচ্ছ'এব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি।

: ওপম্মং করোহি তি।

: তং কিঞ্ঞ্ মঞ্ঞসি মহারাজ, যদা তং পিপাসিত ভাবয়েসি তদা তং উদপাণং খণাপেয়াসি তলাকং খণাপেয়াসি পাণীয়ং পিবিস্সামীতি ?

রাজা : ণহি ভন্তি তি।

নাগসেন : এবমেব খো মহারাজ সম্পত্তেকালে বায়ামো অকিচ্চ-করো ভবতি, পতিগচ্ছ'এব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি॥

নাগসেন, আপনি সক্ষম।

রাজা বল্লেন, মহান নাগসেন, আপনি বলছেন আমাদের এই সমস্ত দুঃখ দূর হতে পারে এবং ভবিষ্যতে আর আমাদের দুঃখ আসবে না ?

: এর অর্থ হে মহারাজ, আমাদের প্রব্রজ্যা এই জন্যই।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন একি আমাদের পূর্বচেষ্টাকৃত, নাকি তা সম্প্রতিকালের জন্য ?

থের বললেন, হে মহারাজ, সম্প্রতিকালের জন্য চেষ্টা করা অকিঞ্চিৎকর (অকার্যকর)। পূর্বকৃত চেষ্টাই তার কর্তব্য করার দিক থেকে কার্যকরী।

রাজা : আমাকে একটি উদাহরণ ( উপমা ) দিন।

নাগসেন : মহারাজ আপনি কি মনে করেন, যদি আপনার পিপাসা পায় (আপনি পিপাসার্ত হন ) তথনই কি আপনি জলপান করার জন্য কূপখনন করাবেন, হ্রদখনন করাবেন ?

[ এখানে নাগসেনের বক্তব্য, ভবিষ্যতে জলতেষ্টা মেটাতে হবে এই চিন্তা যার আছে সে আগে থেকেই কূপখনন, হ্রদখনন ইত্যাদি করিয়ে রাখে। যে এ-সব ভাবে না, সে কোনো রকমে উপস্থিত পিপাসা মেটাবার উপায় খুঁজে পেলেও ভবিষ্যতে আবার বিপদে পড়ে। মানুষও তেমনি কামনা বাসনা জাগলে অবিলম্বে তা মেটাবার চেষ্টা করে, কামনা বাসনা কিসে চিরতরে দূর হবে এটা সে ভাবে না ; কিন্তু সেটা ভাবাই তার পক্ষে কার্যকরী ]।

রাজা : আমি কথনই তা ভাবি না।

নাগসেন : সেই রকমই, মহারাজ, সম্প্রতিকালের জন্য চেষ্টা করা অকিঞ্চিৎকর, পূর্বকৃত চেষ্টা করাই তার কর্তব্য করার দিক থেকে কার্যকরী।

রাজা : ভিয়্যো ওপ্পং করোহি তি।

নাগসেন : তং কিঞ্ঞ্ মঞ্ঞ্ঞসি মহারাজ, যদা তং বুভুক্খিতো ভাবয়েসি তদা খেত্তং কসাপেয়াসি, শালিং রোপাপেয়াসি ধঞ্ঞ্ঞং অতিহরপেয়াসি ; ভত্তং ভূঞ্জিস্সামি তি ?

: ণহি ভন্তি তি।

: এবমেব খো মহারাজ সম্পত্তেকালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি, পতিগচ্ছ'এব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি তি।

: ভিয়্যো ওপ্পং করোহি তি।

: তং কিঞ্ঞ্মঞ্ঞ্ঞসি মহারাজ, যদা তে সংগামো পচ্চুপত্থিত ভাবেয় তদা তং পরিখং খণাপেয়াসি, পাকারং কারাপেয়াসি, গোপুরং কারাপেয়াসি, ধঞ্ঞ্ঞং অতিহরাপেয়াসি, তদা তং হত্থিস্মিং সিক্খেয়াসি,

অস্‌সোস্মিং সিক্‌খেয়াসি, রথস্মিং সিক্‌খেয়াসি, ধনুস্মিং সিক্‌খেয়াসি, থরুস্মিং সিক্‌খেয়াসি তি ?

ঃ ণহি ভন্তে তি।

ঃ এবমেব খো মহারাজ সম্পত্তেকালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি, পতিগচ্ছ'এব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি তি। ভাসিতং-পএতং মহারাজ ভগবতা : পতিগচ্ছ'এব তং কইরা ইয়ং জঞ্ঞা হিতং অত্তণো ণ সাকতিক চিন্তায়মন্তা ধীরো পরাক্কমে।

> যথা সাকতিকণাং সমং হিত্বা মহাপথং ভিষমং মগগং আরুহ্য অক্‌খচ্ছিন্ন ব জায়াতি এবং ধম্মা অপকম্ম অধম্মং অণুবত্তিয় মণো মচ্চু মুখং পত্তো অক্‌খচ্ছিন্ন ব সোচতিতি।

ঃ কল্লো সি ভন্তে নাগসেনা তি ॥

: আমাকে আর একটি উদাহরণ দিন।

: আপনি কি মনে করেন, মহারাজ,—আপনি যখন ক্ষুধার্ত বোধ করেন, তখন কি আপনি অন্নগ্রহণ করবেন বলে ক্ষেত চাষ করান, ( শালি ) ধান রোপণ করান, শস্য ( ধন ) সংগ্রহ করান ?

: নিশ্চয় আমি তা ভাবিনা।

: সেই রকম, হে মহারাজ, সম্প্রতিকালের জন্য চেষ্টা করা অকিঞ্চিৎকর। পূর্বকৃত চেষ্টাই তার কর্তব্যের দিক থেকে কার্যকরী ॥

: আমাকে আর একটা উদাহরণ দিন।

: আপনি কি মনে করেন, মহারাজ, যুদ্ধ যখন একান্তই সমাগত তখন কি আপনি পরিখা খনন করান, প্রাকার তোলেন, গোপুর ( শহরে প্রবেশ করার দরজা ) নির্মাণ করেন, প্রহরীদের লক্ষ্যকরার জন্য স্তম্ভ (watch-tower) নির্মাণ করেন, ধন (শস্য ) সংগ্রহ করেন ? আপনি কি ঠিক তখনি হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনুর্ধারী এবং তরবারীধারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ? [ অর্থাৎ এসব আপনি আগে থেকেই করিয়ে রাখেন। ]

: আমি কখনই তা ভাবিনা।

: ঠিক তেমনি, হে মহারাজ, সম্প্রতিকালের জন্য চেষ্টা করা অকিঞ্চিৎকর। পূর্বকৃত চেষ্টাই তার কর্তব্যসাধনের পক্ষে কার্যকরী। তাই, হে মহারাজ, ভগবান ( বুদ্ধ )

> বলেছেন—( মানুষ ) যাকে তার মঙ্গল বলে মনে করে তাকে সে পূর্বেই করে রাখবে।

শকটচালকের মত জ্ঞানী তার পথ ঠিক করে নিয়ে অগ্রসর হবে।
সমতল মহাপথ ছেড়ে যে শকটচালক বিষম ( অসমতল ) পথে আরোহণ করে, সে যেমন অক্ষচ্ছিন্ন হয়, ( অর্থাৎ চাকার axle ভেঙে যায় ) তেমনি ধর্মপথ ছেড়ে যে অধর্মের পথে চলে, সেও তেমনি অক্ষচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে অনুশোচনা করে ॥

: নাগসেন, আপনি সক্ষম ॥

**মূল পালি ঃ**

অতীতে বিদেহরট্‌ঠে মিথিলায়ং মখাদেব নাম রাজা অহোসি ধম্মিকো ধম্মোরাজো। সো চতুরাসীতিবস্‌স সহস্‌সাণি কুমারকীলং তথা ওপরজ্জং তথা মহারজ্জং কত্তা দীগ্‌ঘং অধ্‌ধাণং খেপেত্ত এক দিবসং কপ্পকং আমন্তোসি ঃ যদা মে সম্ম কপ্পক সিরস্‌সিং ফলিতাণি পস্‌সয়েসি অথা মে আরোচেস্‌সাসিতি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

বিদেহরট্‌ঠে=বিদেরাষ্ট্রে ॥ অহোসি=অভূবৎ ॥ কুমারকীলম্‌=কুমার-ক্রীড়া ॥ ওপরজ্জং=ঔপরাজ্যং ॥ দীগ্‌ঘং=দীর্ঘং ॥ কপ্পক=কল্পক ॥ অদ্‌ধাণং খেপেত্ত=উপভোগ করে ॥ সম্ম=সৌম্য ॥ আরোচেস্‌সাসিতি=আলোচনা করবে, জানাবে ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

অনেকদিন আগে বিদেহরাষ্ট্রে মিথিলাতে মখাদেব (মহাদেব) নামে এক ধার্মিক ও ধর্মরক্ষক রাজা ছিলেন। চুরাশীহাজার বছর কুমারক্রীড়া ( আনন্দ যৌবন ), ঔপরাজ্য ( রাজপ্রতিনিধিত্ব ), এবং পরে মহারাজ্য ভোগ করে দীর্ঘদীন কাটিয়ে একদিন কল্পককে ( কেশমণ্ডণকারীকে ) আমন্ত্রণ করে বল্লেন,—হে সৌম্য কল্পক, আমার মাথায় যখনই পলিত কেশ দেখবে, তখনই আমাকে জানাবে ॥

**মূল পালি ঃ**

কপ্পকোপি দীগ্‌ঘং অদ্‌ধাণং খেপেত্ত একদিয়সং রঞ্‌ঞো অঞ্‌জণবণ্ণাণং কেসাণং অন্তরে একং এব ফলিতাং দিস্‌সাদেবো একং ফলিতং দিস্‌সোতিতি আরোচেসি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

অঞ্‌জণবণ্ণাণং=অঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণ ॥ দিস্‌সাদেবো=দৃষ্টা এব, দেখেই ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

কল্পকও দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করে একদিন রাজার অঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণ কেশের মধ্যে একটি মাত্র পলিত কেশ দেখেই—একটি পলিত কেশ দেখা যাচ্ছে—এই কথা রাজাকে বলল ॥

**মূল পালি ঃ**

তেণ হি মে সম্ম তং ফলিতং উদ্‌ধরিত্বা পাণিং হি থপেহীতী চ বুত্তো সুবণ্ণসণ্ডাসেণ উদ্‌ধরিত্বা রঞ্‌ঞো পাণিংহি পতিত্থাপেসি। তদা রঞ্‌ঞো চতুরাসিতি বস্‌স সহস্‌সাণি অবসিত্থ হোতি। এবং সণতে পি ফলিতং দিস্‌স ব মচ্চু রাজাণং আগন্তা সমীপে থিতং বিঅ অত্তাণং আদিত্তপণ্ণসালং পবিত্তং বিঅ চ মঞ্‌ঞোমাণো সংবেগং আপজ্জিত্বা বাল মখাদেব যাব ফলিতস্‌সুপ্পাদা ব ইমে কিলে সে জহিতুং ণাসক্‌খী তি চিন্তেসি॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

পাণিং হি=পাণিস্মিন্॥ থপেহি=স্থাপয়॥ সুবণ্ণসণ্ডাসেণ=সুবর্ণসণ্ডাসেন, সোনার সাঁড়াশী দিয়ে, (চলিত কথায়, সন্না দিয়ে)॥ বুত্তো=বৃত্তঃ॥ পতিত্থাপেসি=প্রতিষ্ঠাপয়তি॥ মচ্চু রাজাণং=মৃত্যু রাজানং॥ আদিত্তপণ্ণসালং =প্রদীপ্ত পর্ণশালায়॥ মঞ্‌ঞোমাণো—মন্যমানঃ, মনে করতে করতে॥ আপজ্জিত্বা=আপদ্যিত্ব ( আবেগ প্রাপ্ত হয়ে )॥ বিঅ=ইব॥ ফলিতস্‌সুপ্পাদা =ফলিতঃ উৎপাদাৎ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

"তবে হে সৌম্য, সেই পলিত কেশ উঠিয়ে আমার হাতে দাও।" এবং এইভাবে সে ( কল্পক ) সোনার সণ্ডাস দিয়ে সেই পাকা চুলটি তুলে রাজার হাতে স্থাপন করল। তখনও রাজার চুরাশীহাজার বছর আয়ু অবশিষ্ট ছিল। এই রকম হওয়া সত্ত্বেও সেই পলিত কেশ দেখে রাজা ভাবলেন, মৃত্যুরাজ এসে সমীপস্থ হয়েছেন। এবং তিনি স্বয়ং প্রদীপ্ত পর্ণশালাতে প্রবেশ করেছেন। এই রকম মনে করতে করতে আবেগপ্রাপ্ত হয়ে—'মূর্খ মহাদেব শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে পলিতকেশ হওয়া পর্যন্ত ( বৃদ্ধকাল পর্যন্ত ) ক্লেশ ত্যাগ করতে সমর্থ হল না'—এই কথা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন॥

**মূল পালি ঃ**

তস্‌সেবং ফলিত পাতুভাবং আবজ্জণতস্‌স অন্তদাহো উপ্‌পজ্জি। সরীরা সেদা মুচ্ছিংসু। সাতকা পীলেত্বা অপণেতব্বকারপ্‌পত্তা অহেসুং। সে অজ্জেব ময়া ণিক্‌খমত্বা পব্‌বজিতুং বট্টতি তি কপ্পকস্‌স সতসহস্‌সমুত্‌থাণং গামবরং দত্বা জেট্‌ঠপুত্তং পক্কসাপেত্ত ঃ তাত মন সীসে ফলিতং পাতুভূতং মহল্‌লকোম্হি জাতো। ভুত্বা খো পণ মে মাণুসকা কামা। ইদাণি দিব্‌বকামে পরিয়েসিস্‌সামি। ণেক্‌খম্মকালো মজ্‌ঝং।

তং ইমং রজ্জং পতিপজ্জ। অহং পণ পব্‌বজিত্তা মখাদেবম্ববণুজ্জাণে বসন্ত সমণধম্মং করিস্‌সামিতি আহ। তং এবং পব্‌বজিতুকামং অমচ্চা উপসংকমিত্তাঃ দেব, কিং তুম্হাকং পবজ্জাকারণংতি পুচ্ছিংসু। রাজা ফলিতং হত্থেণ গহেত্তা অমচ্চাণং ইমং গাথং আহ ঃ

উত্তমংগারুহা মজ্‌ঝং ইমে জাতা বয়োহরা।
পাতুভূতা দেবদূতা পব্‌বজাসময়ো মমাতি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

অন্তদাহো=অন্তর্দাহ ॥ নিকৃথমত্তা=নিষ্ক্রমত্বা ॥ ণেকৃথম্মকালো=নিষ্ক্রম-কাল ॥ পব্‌বজিতুং=প্রব্রজিতুং ॥ বট্টতি=বর্ততি ॥ সতসহস্‌সসুত্‌থাণং =শত সহস্র সুন্দর স্থান ॥ সীসে=শীর্ষে ॥ দিব্‌বকামে=দিব্যকার্যে। পরিয়েসিস্‌সামি=পরিপর্যস্যামি ॥ রজ্জং=রাজ্যং ॥ পতিপজ্জ=পালন কর ॥ পব্‌বজিত্তা=প্রব্রজ্যা নিয়ে ॥ মখাদেবম্বুবণজ্জাণে=মহাদেবের আম্রবনউদ্যানে ॥ সমণধম্মং=শ্রমণধর্মং ॥ পব্‌বজিতুকামং=প্রব্রজ্যাকামী। অমচ্চ=অমাত্যাঃ ॥ উপসংকমিত্তা=উপস্থিত হয়ে ॥ তুম্হাকং—তোমার ॥ পুচ্ছিংসু=জিজ্ঞাসা করছি ॥ হত্থেণ গহেত্তা=হস্তেন গৃহীত্বা ॥ অমচ্চাণং=অমাত্যদের ॥ গাথং=গান ॥ উত্তমংগারুহা=উত্তমংগ+আরুহা, শিরস্থিত ॥ বয়োহরা= বয়সহারী ॥ পাতুভূতা=আবির্ভূত ॥ মমাতি=মম+ইতি ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

এই রকম পলিত কেশের আবির্ভাব সম্পর্কে ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে রাজার অন্তর্দাহ উপস্থিত হল। শরীর থেকে স্বেদ নির্গত হল। বস্ত্রাদি ক্লিন্ন হয়ে অপনয়নযোগ্য হল। 'আজই নিষ্ক্রমণ করে আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত'—এই ভেবে কল্পককে শত সহস্র সুন্দর গ্রাম দান করে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়ে বললেন ঃ তাত, আমার শিরে পলিত কেশ আবির্ভূত হয়েছে। বৃদ্ধ হয়েছি, মানুষের কাম্যজীবন আমি ভোগ করেছি। এখন আমি দিব্যকার্যে আত্মনিয়োগ করব। আমার নিক্রমণকাল উপস্থিত। তুমি এই রাজ্য পালন কর। আমি প্রব্রজ্যা নিয়ে মহাদেবের আম্রবনউদ্যানে বাস করে শ্রমণধর্ম পালন করব।

অমাত্যরা এই প্রব্রজ্যাকামীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'দেব, আপনার প্রব্রজ্যার কারণ কি?' রাজা পলিত কেশ হাতে নিয়ে অমাত্যদের এই গাথা বললেন ঃ

আমার শিরোস্থিত এই বয়োহারী কেশ জন্মিয়েছে।
দেবদূতেরা আবির্ভূত—এই আমার প্রব্রজ্যাকাল ॥

**মূল পালি ঃ**

স এবং বত্তা তং দিবসং এব রজ্জং পহায় ইসিপব্বজ্জাণং পব্বজ্‌জিত্তা তস্‌সিংঞেব মখাদেবম্ববণে বিহরন্ত চতুরাসিতি বস্‌স সহস্‌সাণি চত্তারো ব্রহ্মবিহারে ভাবেত্তা অপরিহীণজ্‌ঝাণে থিতো কালং কত্তা ব্রহ্মালোকে ণিব্‌বত্তিত্তা পুণ তত চুত মিথিলায়ংয়েব নিমিনাম রাজা হুত্তা ওসক্‌কোমাণং অত্তণো বংসং ঘতেত্তা তত্‌থএব অম্ববণে পব্‌বজিত্তা ব্রহ্মবিহারে ভাবেত্তা পুণ ব্রহ্মালোকুপগ ব অহসি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

ইসিপব্বজ্জানং=ঋষি প্রব্রজ্যাং, ঋষির যোগ্য প্রব্রজ্যা। ভাবেত্তা=ভাবে স্থিত হয়ে ॥ অপরিহীণজ্‌ঝাণে=অপরিহীন ধ্যানে ॥ কালং কত্তা=কাল কাটিয়ে। নিব্‌বত্তিত্তা=নির্বাণ লাভ করে ॥ হুত্তা—ভূত্বা, হয়ে ॥ ওসক্‌কোমাণং=অবশক্ষ্যমানং, ক্ষীয়মাণ ॥ ঘতেত্তা—গ্রহণ করে ॥ ব্রহ্ম-লোকুপগ=ব্রহ্মলোকগামী ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

এই রকম বলে তিনি সেইদিনই রাজ্যত্যাগ করে ঋষির যোগ্য প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে সেই মহাদেবের আম্রবনে বিহার করতে করতে চুরাশি হাজার বছর ধরে চারটি ব্রহ্মবিহারে যাপন করে অপরিহীন ধ্যানস্থ হয়ে জীবনাবসানে ব্রহ্মলোকে নির্বাণ লাভ করেন। পরে আবার সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি মিথিলায় নিমি নামে রাজা হিসাবে ক্ষীয়মাণ নিজবংশে জন্মিয়ে আবার সেই আম্রবনে প্রব্রজিত হয়ে ব্রহ্মবিহারে ধ্যান করে আবার ব্রহ্মলোকগামী হলেন*॥

[ হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় পালি ভাষার চর্চা করতেন বেশি। তাঁদের উদ্যোগেই পালিভাষা সমগ্র দক্ষিণভারতে এবং সেখান থেকে সিংহলে চলে যায়। উত্তর ভারতের মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিজেদেরকে অভিজাত এবং কিছু পরিমাণে শিক্ষাভিমানী মনে করায় তাঁরা পালিভাষার চর্চা বেশি করতেন না, তাঁরা সংস্কৃত ভাষার কথ্যরূপ থেকে আগত সংস্কৃত এবং প্রাকৃত মেশানো একটা মিশ্রভাষার মাধ্যমে মনোভাব এবং বৌদ্ধ তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করতেন। এই মিশ্রভাষাকেই বলা হয় বৌদ্ধ-সংস্কৃত। শুধু যে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল, তাই নয়। কুষাণ সম্রাটেরা তাঁদের অনুশাসনেও এই বৌদ্ধ-সংস্কৃত ব্যবহার করতেন।

এই যে বুদ্ধ এবং তাঁর পিতার মধ্যে কথোপকথন, সেখানে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সন্ন্যাস-জীবন এবং বুদ্ধদেবের রাজপুত্র থাকাকালীন জীবনের দুটি চিত্র এখানে কবি রূপায়িত করেছেন। সন্ন্যাসজীবনের মহত্ত্বই কবি বুদ্ধদেবের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করাতে চেয়েছেন ॥ ]

তে দেববর্ণা উভয়ে সমাগতা
বুদ্ধ চ বুদ্ধস্‌স পিতা চ রাজা।
উপশোভতি শালবণে নিসগ্নো
চন্দ্র যথা অভ্রগণা প্রমুক্ত।

সেই দেববর্ণ দুজন একত্র হলেন। বুদ্ধ এবং তাঁর রাজ্যেশ্বর পিতা শালবনের মধ্যে মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত আসীন।

তথা প্রমেয়স্‌স পিতুর অভূসি
চিরস্‌স দৃষ্টবাণ প্রিয়ং মণাপং।
পুত্রং স্বকং প্রাণসমাং নিসণ্ণং
হিতাহিতং প্রচ্ছতি বেগজাত ॥

অনেকদিন পরে প্রিয় মনোজ্ঞ পুত্রকে দেখে পিতার মনে আনন্দ হল। উদ্বেগের সঙ্গে রাজা তাঁর প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে হিতাহিত প্রশ্ন করলেন ॥

পুরা তব কম্বল পাদুকা চ
সুচিত্রা সূক্ষ্মাস্তরসংস্থিতাসু।

অভুরুহিঅতাং চংক্রমসে চ বীর
শ্বেতস্মিং ছত্রস্মিং ধরীয়মাণে ॥

( বুদ্ধদেবের পিতা বললেন ) পূর্বে তোমার কম্বল পাদুকা ছিল। তুমি সুচিত্রিত সূক্ষ্ম আস্তরণের ওপর অবস্থান করতে। যখন তুমি পরিভ্রমণ করতে, হে বীর, তখন মাথায় শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হত ॥

সো দাণি তাম্রমৃদুজালিণীহি
সুচক্রণেমী সহস্রহেহি।
কুশকণ্টকশরকরং আক্রমন্ত
কচ্চিৎ তে পাদউ ণ রুজন্তি বীর ॥

( বুদ্ধদেবের পিতা বললেন ) হে বীর, সেই মৃদু তাম্রজালবর্ণ সুচক্রনেমীযুক্ত রথে পরিভ্রমণ করতে। এখন কি তোমার পদতল কুশকণ্টক শরের আক্রমণে একটুও বেদনার্ত হয় না ?

[ ভগবান আহ ]

সর্বাভিভূ সর্ববিদূ হংঅস্মি
সর্বেষু ধর্মেষু অনোপলিপ্ত।
সর্বং জহে তৃষ্ণক্ষয়া বিমুক্তো
ণ মাদৃশো সংপ্রজনতি বেদনা ॥

ভগবান বললেন, আমি সবকে দমন করেছি, আমি সর্বজ্ঞ। সমস্ত রকম ধর্মে আমি অনুপলিপ্ত। আমার সমস্ত বাসনা ক্ষয় হয়েছে বলে আমি মুক্ত। (তাই) আমার মত ব্যক্তি বেদনা অনুভব করে না ॥

[ রাজা আহ ]

পুরা তব লোহিত চন্দনেন
সসিস্স রক্তোপনিভেন কালে।
মনোজ্ঞ গন্ধেন সুশীতলেন
স্নাপকা বিলিমপেংসু তে স্নাপয়িত্বা ॥

রাজা বললেন, অতীতে তোমার দেহে মহাসুগন্ধ সুশীতল রক্তচন্দন অনুলেপন করে সশিষ্য তোমাকে স্নান করানো হত।

সো দানী গ্রীষ্মাসু খরাসু রাত্রিসু
বনাদ্ বনং ঈর্ষসী চংক্রমন্তো।

ওদাতশীতেন সুখেন বারীণা
কো দানি তে স্নাপয়তে কিলন্তং ॥

সেই তুমি যখন গ্রীষ্মকালের দুঃসহ রাত্রিতে বন থেকে বনান্তরে বিচরণ কর, তখন ক্লান্ত তোমাকে কে স্বচ্ছশীতল জলে স্নান করিয়ে দেয় ?

[ ভগবান আহ ]

শুদ্ধ নদী গৌতম শীলতীর্থা
অনাবিলা সদ্‌বিহ সদা প্রশস্তা ।
ইয়স্মিং হ্রদে দেবগণেহি স্নাতো
ওগাধাগাত্র প্রতরামি পারং ॥

ভগবান বললেন, শীলতীর্থে গৌতম নদী শুদ্ধ ( পবিত্র )। সর্বদা সেখানে অনাবিল স্বচ্ছবারি প্রবাহিত হয় বলে সকলে তার প্রশস্তি গায়। এই হ্রদে দেবগণের সঙ্গে স্নান করে গা ডুবিয়ে সাঁতার দিয়ে আমি অন্য পারে চলে যাই ॥

শুদ্ধ হ্রদ গৌতম শীলতীর্থ
অনাবিল সদ্‌বিহ সদা প্রশস্তা ।
ইয়স্মিং হ্রদে দেবগণেহি স্নাতো
পৃথ্বীং প্রবাহেতি স পুণ্যগন্ধাম্ ॥

শীলতীর্থে গৌতম হ্রদ শুদ্ধ। সর্বদা সেখানে অনাবিল স্বচ্ছ বারি প্রবাহিত হয় বলে সবাই তার প্রশস্তি গায়। এই হ্রদে দেবতাদের সঙ্গে আমি স্নান করি। (দেবতাদের ) গায়ের পুণ্যগন্ধ পৃথিবীতে প্রবাহিত হয় ॥

[ রাজা আহ ]

যদা তুবং কাশিকবস্ত্রধারী
পদমুৎপলচম্পকবাসিতানি ।
শুদ্ধানি বস্ত্রানি নিবাসয়িত্বা
সো শোভসি শাক্যিয়মণ্ডলস্মিং
শক্র বা সহস্রগতনা মধ্যে ॥

রাজা বললেন, অতীতে তুমি বারাণসীতে প্রস্তুত উৎপল-চম্পক-গন্ধ-সুবাসিত বস্ত্র পরিধান করে, শাক্যরাজপুত্রমণ্ডলী বা সহস্র পুণ্যবান স্বর্গপ্রাপ্তদের মধ্যে ইন্দ্রের মত শোভা পেতে ॥

সো দানী শাণানি চ পট্টকানি চ
রক্তানি বস্ত্রানি ক্রমত্বচানি।
ধারেসি তং চ অজুগুপ্সমানো
ইদং পি তে আশ্চর্যং ভদন্ত ॥

হে ভদ্র, সেই তুমি ভিক্ষুকদের ব্যবহার্য শণ পাট বল্কল ও কাষায়বস্ত্র অকুণ্ঠ চিত্তে ধারণ কর—এও তোমার আশ্চর্য ॥

[ ভগবান আহ ]

ন চীবরে শয়নে ভোজনে বা
অনুধ্যাপিতা ভোন্তি জিনা নরেন্দ্র।
লব্ধা মনাপং অথবা পি অপরিয়ং
উপেক্ষকা ভোন্তি জিনা প্রজানকা ॥

ভগব্যান বললেন, হে মহারাজ, যাঁরা ইন্দ্রিয় জয় করেছেন, প্রজ্ঞাবান সেই ব্যক্তিদের মন বস্ত্রে শয়নে বা ভোজনে বাসনাযুক্ত হয় না। তাঁরা প্রিয় বা অপ্রিয় যাই লব্ধ হন না কেন, তাকেই উপেক্ষা করেন ॥

[ রাজা আহ ]

পুরা তব আজ্ঞানীয়রথা বিচিত্রা
সুবর্ণ কাংসরুচিরা মহার্হা।
শ্বেতং চ ছত্রং চ মণিখংগচামরং
ধ্রুবং গ্রহেংসু তে দিশং প্রয়ায়ত ॥

রাজা বললেন, পূর্বে তোমার আজ্ঞাবহ সুবর্ণ এবং কাংস্যপ্রভাযুক্ত মূল্যবান বিচিত্র রথ ছিল। যখন তুমি কোথাও যেতে তখন শুভ্র ছত্র ও মাণিক্যখচিত চামর তোমার মাথায় ধরা হত ॥

পুরা বাতজব উদগ্র
হয়োত্তম কণ্টকো শীঘ্রবেগ।
আজানেয়ো কাঞ্চনজালাচ্ছন্ন
অভীষ্ট সো বহহি যেন কামং ॥

পূর্বে তোমার বায়ুবেগধারী শীঘ্রবেগ অশ্বশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণ 'কণ্টক'—যার জানু পর্যন্ত সোনার জাল বিলম্বিত ছিল—তোমাকে তোমার ইচ্ছামত বহন করতে প্রস্তুত থাকত ॥

যো যুগ্মযানেহি তুবং উপেতো
রথেহি অশ্বেহি চ কুঞ্জরেহি চ।
রাষ্ট্রেণ রাষ্ট্রং অনুচক্রমন্তো
কচ্চিন্ ন শ্রান্তোসি তদব্ধ ব্রুহি ॥

অতীতে তোমার অশ্ব ও হস্তী-বাহিত যুগ্মযান রথ ছিল। এখন এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় তুমি কি শ্রান্তি বোধ কর না ?—স্থির করে বল ॥

[ ভগবান আহ ]

রথ মে ঋদ্ধিপাদ স্বচিত্ত বাহন
ধৃতি চ প্রজ্ঞা চ স্মৃতি চ সারথী।
সাম্যকপ্রধানা চতুরো মে অশ্ব
সময় প্রয়াতো হংপদং সুসংস্কৃতং ॥

ভগবান বল্লেন, ঋদ্ধিপথই আমার রথ ; আমার চিত্তই আমার বাহন। ধৃতি, প্রজ্ঞা এবং স্মৃতি—এই তিনটি আমার সারথি। তারা সবাই সমান বলবান এবং সমান বেগবান। আমার পথও সুসংস্কৃত ॥

[ রাজা আহ ]

পুরা তুবং রৌপ্যভাসনেসু
সুবর্ণ পত্রেষু চ ভুঞ্জীয়াণ।
শুচিং প্রণীত রসকং চ ভোজনং
রাজাণুভাবেণ উপস্থিহেংসু ॥

রাজা বললেন, পূর্বে সুচারুরূপে তৈরী রসযুক্ত খাদ্য রৌপ্য ও সোনার পাত্রে আহারের জন্য রাজোচিতভাবে তোমার কাছে উপস্থিত করা হত ॥

সো দাণি লোণং অলোণংচ
লুখং অলুখং অরসং সরসং চ।
পরিভুঞ্জসি তং চ অজুগুপ্সমাণো
ইদং পি তে আশ্চর্যং ভদন্ত ॥

সেই তুমি এখন লবণযুক্ত বা লবণহীন, রুক্ষ বা অরুক্ষ (তৈলযুক্ত বা তৈলহীন), সরস বা রসহীন খাদ্য অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ কর ; হে বৎস, এও তোমার এক আশ্চর্য ॥

[ ভগবান আহ ]

ইয়ে চাপি বুদ্ধা পুরিমা অতীতা
অণাগতা যোপি চ হং অণেয় ।
লুখং অলুখং অরসং সরসং চ
দমার্থিক লোকহিতায় ভুঞ্জিথ ॥

যাঁরা অতীতে বুদ্ধত্ব পেয়েছেন বা ভবিষ্যতে পাবেন, তাঁরা আত্মদমন ও লোকের হিতের জন্য রুক্ষ অরুক্ষ সরস বা বিরস—সবরকম খাদ্য গ্রহণ করেন ॥

[ ভগবান বুদ্ধদেব এবং ধনিয় নামে একজন গো-পালকের মধ্যে বিদেহ রাষ্ট্রে এই কথোপকথন হয়েছিল বলে শোনা যায়। এই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেবের সন্ন্যাসজীবনের শান্তি ও আনন্দ এবং গৃহী সংসারী লোকের তথাকথিত সুখের জীবন—পাশাপাশি এই দুটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ]

**ধণিয় গোপ :**

পক্‌কোদণ দুদ্‌ধখীরো হং অস্মি
অণুতীরে মহিয়া সমাণবাসো।
ছন্না কুটি আহিতো গিণি
অথ চে পত্‌থয়সী পবস্‌স দেব ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

পক্‌কোদণ=পক্ক+ওদণ ॥ দুদ্‌ধ=দুগ্ধ ॥ অণুতীরে=তীরের কাছে ॥ মহিয়া=মহী নদী ॥ ছন্ন=আচ্ছাদিত ( √ছদ্ ) ॥ আহিতো-প্রজ্বলিত ॥ গিণি=সং. অগ্নি। অসদৃশ ব্যঞ্জনের সমীকরণ অগ্‌গি, কবিতায় বিশেষ করে স্বরভক্তি করে অগিণি, পূর্বস্বর লুপ্ত হয়ে গিণি ॥ পত্‌থয়সি=সং. প্রার্থয়সি ॥ পবস্‌স দেব=প্রাবৃষ ( বর্ষণ কর ), হে দেবতা ( বৃষ্টিদেবতা ) ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

ধনিয় গোপ বল্ল, আমার অন্ন (খাদ্য) রন্ধন করা হয়েছে, দুগ্ধ দোহন করা হয়েছে। মহী নদীর তীরের কাছে আমি আমার সমশ্রেণীর লোকের সঙ্গে বাস করি। আমার কুটির আচ্ছাদিত, অগ্নি প্রজ্বলিত। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, হে পর্জন্যদেব, ( তবে ) বর্ষণ করুন ॥

**ভগবা :**

অক্‌কোধণো বিগতখিলো হং অস্মি
অণুতীরে মহিয়'একরত্তিবাসো।
বিবতা কুটি ণিব্‌বুতো গিণি
অথ চে পত্‌থয়সি পবস্‌স দেব ॥

শব্দার্থ ও টীকা ঃ

অক্কোধণো=অক্রোধিনো ॥ খিল=কিল, বাধা ॥ মহিয়'একরত্তিবাসো= মহিয়া—একরত্তিবাসো, পাশাপাশি দুটো স্বরবর্ণ থাকায় সন্ধি হয়ে 'আ' লুপ্ত হয়েছে, মহী নদীর তীরে এক রাত্রি বাস ॥ বিবতা=বি+√বৃৎ, বর্তমান থাকা ॥ নিব্বুতো=নিবৃত (নিভানো) ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

ভগবান বুদ্ধ বল্লেন, আমি অক্রোধ, আমার সমস্ত বন্ধন (বা বাধা) বিগত (আমি মুক্ত)। আমি মহী নদীর তীরের কাছে এক রাত্রি বাস করি। আমার কুটির অনাচ্ছাদিত, অগ্নি নির্বাপিত। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে হে পর্জন্যদেব, বর্ষণ করুন ॥

ধণিয় গোপ ঃ

অন্ধকমকসা ণ বিজ্জরে
কচ্ছে রুল্‌হতিণে চরন্তি গাবো।
বুট্‌ঠিম্ পি সহেয্যুং আগতং
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব ॥

শব্দার্থ ও টীকা ঃ

অন্ধকমকসা=অন্ধ মশকেরা ॥ ণ বিজ্জরে=ন বিদ্যতে ॥ কচ্ছে=জলা জায়গাতে ॥ রুল্‌হতিণে=রুহত তৃণে ॥ বুট্‌ঠিম্=বৃষ্টি ॥ সহেয্যুং=সহেতুং, √সহ্ (সহ্য করা ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

ধনিয় গোপ বল্ল,—অন্ধ মশকেরা আর নেই। গরুর পাল জলা-জায়গায়-জাত তৃণে চরছে এবং তৃণের দ্বারা জীবনধারণ করছে। তারা আগত বৃষ্টিকে সহ্য করতে পারে। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে হে পর্জন্যদেব, বর্ষণ করুন ॥

ভগবা ঃ

বদ্ধা হি ভিসী সুসংখটা
তিণ্‌ণো পারগতো বিণেয্য ওঘং।
অত্থো ভিসিয়া ণো বিজ্জতি
অথ চে পতথয়সী পবস্‌স দেব ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

বদ্ধা=বদ্ধা ॥ হি=নিশ্চয় ॥ ভিসী=সং. বৃসী, ভেলা ॥ সুসংখটা=সুসংস্কৃত ।
তিণ্ণো=তীর্ণ ॥ বিণেয্য=বিমুক্ত ॥ ওঘং=বন্যা ॥ বিজ্জতি=বিদ্যতি ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

ভগবান বুদ্ধ বল্লেন, আমার ভেলা সুন্দরভাবে বাঁধা এবং তা সুসংস্কৃত। (বাসনার) বন্যা সরিয়ে ( অস্তিত্বের সমুদ্র ) পার হয়ে আমি অপরতীরে পৌঁছেছি। ( এখন আমার ) ভেলার আর প্রয়োজন নেই। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে হে পর্জন্যদেব, বর্ষণ করুন ॥

**ধনিয় গোপ :**

গোপী মম অস্সোবা অলোলা
দীঘরত্তং সম্বাসিয়া মণাপা।
তস্সা ণ সুণামি কিঞ্চি পাপং
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

অলোলা=অলোভা ॥ দীঘরত্তং=দীর্ঘকাল ধরে ॥ সম্বাসিয়া=সম্বাস্যা ( সম্যকরূপে বাস করছে ) ॥ কিঞ্চি পাপং=কোনো পাপ (দুর্নাম) ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

ধনিয় গোপ বল্ল, আমার স্ত্রী ( আমার ) বাধ্য। সে লোভহীনা এবং মনোরমা। সে দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে বাস করছে ; তার সম্বন্ধে কোনো দুর্নাম আমি শুনিনি। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে হে পর্জন্যদেব, বর্ষণ করুন ॥

**ভগবা :**

চিত্তং মম অস্সোবং বিমুত্তং
দীঘরত্তং পরিভাবিতং সুদন্তং।
পাপং পণ মে ণ বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

বিমুত্তং=বিমুক্তং ॥ পরিভাবিত=বিশেষরূপে যা ভাবা হয়েছে। সুদন্তং=সুদমিতং ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

ভগবান বুদ্ধ বল্লেন, আমার মন বাধ্য, মুক্ত, দীর্ঘকাল ধরে পরিভাবিত এবং সুদমিত। অপরপক্ষে আমার কোনো পাপ নেই। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে হে পর্জন্যদেব, বর্ষণ করুন ॥

**ধণিয় গোপ ঃ**

অত্তবেতণভত্তো'হং অস্মি
পুত্ত চ মে সমাণিয়া অরোগা।
তেসং ণ সুণামি কিঞ্চি পাপং
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

অত্তবেতণভত্তো=অত্ত+বেতণ+ভত্ত ( সংস্কৃত √ভৃ ধাতু, ভরণ করা ; ভত্ত যে ভরণ করে, এর থেকে বাংলায় ভাতার কথাটি এসেছে ॥ সমাণিয়া= সমাণ+ইয় ॥ অরোগ=রোগহীন ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

ধনিয় গোপ বল্ল, আমার নিজের ভরণ-পোষণ আমি নিজেই করি। আমার পুত্রেরাও আমার মত এবং রোগহীন। তাদের সম্বন্ধে কোনো পাপ আমি শুনিনি। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে হে পর্জন্যদেব, বর্ষণ করুন।

**ভগবা ঃ**

ণাহং ভতকো'অস্মি কস্সচি
ণিব্বিথেণ চরামি সব্বলোকে।
অথো ভতিয়া ণ বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

ভতক=ভৃতক ( ভাড়া করা চাকর ) ॥ কস্সচি=কস্যচিৎ ॥ ণিব্বিথেণ= নিবিষ্টেন ॥ ভতিয়া=ভৃতিয়া ( ভৃতয়া ) ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

ভগবান বুদ্ধ বল্লেন, আমি কারও ভাড়া-করা ভৃত্য নই ; আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি ( বা অর্জন করেছি ) তার সাহায্যেই আমি সর্বলোকে ভ্রমণ করি। আমার কোনো বেতনের প্রয়োজন নেই। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, হে পর্জন্যদেব, তবে বর্ষণ করুন ॥

**ধনিয় গোপ :**

অত্থি বসা অত্থি ধেণুপা
গোধরণিয়ো পবেণিয়োপি অত্থি।
উসভোপি গবম্‌পতীধ অত্থি
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

বসা=যে গরুর বৎস নেই, এবং গো-বৎসকে স্তন্যপান করায় না॥ ধেণুপা=দুগ্ধবতী গাভী॥ গোধরণিয়ো—সবৎসা গাভী॥ পবেণিয়ো=প্রোবেমি॥ উসভো=বৃষ॥ গবম্‌পতি=গরুর পালের অধিনায়ক॥

**বাংলা অনুবাদ :**

ধনিয় গোপ বল্ল, আমার এমন গাভী আছে যার বৎস নেই ও বৎসকে স্তন্যপান করায় না। দুগ্ধবতী গাভীও আমার আছে, সবৎসা গরুর পালও আমার আছে। গরুর পালের পতিস্বরূপ আমার একটি বৃষও আছে। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, হে পর্জন্যদেব, তবে বর্ষণ করুন॥

**ভগবা :**

ণত্থি বসা ণত্থি ধেণুপা
গোধরণিয়ো পবেণিয়োপি ণত্থি।
উসভোপি গবম্‌পতীধ ণত্থি
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

পতীধ—পতি+ইধ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

ভগবান বুদ্ধ বল্লেন, আমার বৎসহীনা বা বৎসকে স্তন্যপান করায় না এমন গাভী, দুগ্ধবতী গাভী এবং সবৎসা গাভীর পাল—কিছুই নেই। (এই পৃথিবীতে) গোরুর পালের পতিস্বরূপ কোনো বৃষও আমার নেই [ অর্থাৎ আমার কোনো ঐশ্বর্য নেই ]। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, হে পর্জন্যদেব, তবে বর্ষণ করুন॥

**ধনিয় গোপ :**

কীলা নিখাতা অসম্পবেধী
দামা মুঞ্জময়া ণবা সুসণ্ঠণা।

ণহি সক্খিস্তি ধেণুপাপি ছেত্তুং
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

কীলা = কীল, খুঁটি ; বহুবচনে কীলা ॥ ণিখাতা = ( ণি + √খং + অতীতে ক্ত ) সুপ্রতিষ্ঠ ॥ দামা — দামন্, দড়ি ; বহুবচনে দামা ॥ মুঞ্ঞমযা = মুঞ্জঘাসের দ্বারা নির্মিত ॥ অসম্পবেধী = অসম্প্রব্যাতিং ) যা কম্পিত বা উত্তেজিত হয় না ) ॥ সুসংঠণা = সুসংস্থিত ॥ ছেত্তুং = ছেদিতুং, ছিঁড়তে ॥ সক্খিস্তি = সক্ ধাতু ( সক্ষম হওয়া ) থেকে ; সং. শকিষ্যন্তি ॥ হি = নিশ্চিতার্থে ব্যবহৃত অব্যয় ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

ধনিয় গোপ বল্ল ঃ কীলগুলি বা খুঁটিগুলি এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠ যে, সেগুলি কম্পিত বা উত্তেজিত ( উৎপাটিত ) হয় না। মুঞ্জঘাসের দ্বারা নির্মিত দড়িগুলি নূতন এবং সুসংস্থিত। এমন কি দুগ্ধবতী গাভীরাও সেগুলি নিশ্চয় ছিঁড়তে পারে না।

**ভগবা ঃ**

উসভো-র-ইবো ছেত্তা বন্ধণাণি
ণাগো পদলয়িৎণা ব দালয়িত্তা।
ণাহং পুণ উপেস্সং গব্ভসেয্যং
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

পদলয়িৎণা = পদদলিত করে ॥ উপেস্সং = উপ + ইস্সং, ( √ই = যাওয়া ) ॥ গব্ভসেয্যং—গর্ভশয্যা ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

ভগবান বল্লেন, আমি ( পার্থিব ) বন্ধনছিন্নকারী, বা জীর্ণ ( বাসনার ) লতা পদদলিতকারী বৃষের মত আবার গর্ভ শয্যায় প্রবেশ করব না ( গর্ভ শয্যায় প্রবিষ্ট হব না )। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, হে পর্জন্যদেব, তবে বর্ষণ করুন ॥

ণিন্নঞ্চ থলঞ্চ পূরয়ন্ত
মহামেঘো পাবস্সী তাবদেব।
সুত্তা দেবস্স বস্সতো
ইমং অত্থং ধণিয় অভাসথ ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

নিন্নঞ্‌=নিম্নং ॥ থলঞ্‌=স্থলং ॥ পূরয়ন্ত=পরিপূর্ণ হল ॥ পাবস্‌সী=প্রাবৃষি ( বর্ষণ হতে থাকল ) ॥ বস্‌সতো=বর্ষতঃ ॥ অত্থং=অর্থং, বস্তু, কথা ॥ অভাসথ=অভাষত ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

তৎক্ষণাৎ সেই মহামেঘ বর্ষণ করল, নিম্ন এবং উচ্চস্থল পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাই শুনে, "দেবতারা বর্ষণ করছেন", এই কথা ধনিয় বল্ল ॥

লাভা বত ণ অণপ্‌পকা
য়ে ময়ং ভগবন্তং অদ্দস্‌সাম।
সরণং তং উপেম চক্‌খুং
সত্থ ণো হোহি তুবং মহামুণি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

লাভা=লাভ বহুবচনে। অণপ্‌পকা+ন অপ্‌পকা, কম নয় ॥ অদ্দস্‌সাম=অদর্শাম ॥ উপেম—উপ+√ই+ম ॥ হোহি=√হূ ধাতু লোট্‌ হি, হউন ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

ধনিয় বল্ল : আমাদের লাভগুলি নেহাৎ অল্প নয়, কারণ আমরা ভগবানকে দেখেছি। হে সর্বদর্শী, আপনার শরণে আমাদের যেতে দিন ( আপনার শরণ আমরা নেব ); হে মহামুনি, আপনি আমাদের গুরু হোন ॥

গোপী চ অহং চ অস্‌সবা
ব্রহ্মচরিয়ং সুগতে চরামসে।
জাতিমরণস্‌স পারগা
দুক্‌খস্‌স'অন্তকরা ভবামসে ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

ব্রহ্মচরিয়ং—ব্রহ্মচর্যং ॥ চরামসে—চরামহৈ ( বিচরণ করব ) ॥ সুগতে—অধিকরণে ৭মী, সুগতধর্মে ॥ দুক্‌খস্‌স'অন্তকরা—দুঃখের শেষ ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

আমার স্ত্রী গোপী এবং আমি ( ধনিয় ) যেন বশ্যতা স্বীকার করি ( বাধ্য হই ) ; সুগতধর্মে পবিত্র জীবনযাপন করি ; দুঃখের অন্ত করে আমরা যেন জন্ম এবং মৃত্যুর অতীতে যাই ॥

**মারো পাপিমা ঃ**

ণন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা
গোমিকো গোহি তথ'এব ণন্দতি।
উপধি হি ণরস্‌স ণন্দনা
ণহি সো ণন্দতি যো ণিরূপধি।

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

পুত্তেহি=হেতু অর্থে ৩য়া॥ পুত্তিমা=পুত্রমন্তাঃ॥ গোমিকো=সং. গোমিন্, গরুর পালের মালিক॥ ণন্দণা=আনন্দের বহুবচন॥ উপধি= ভিত্তি ; নিরূপধি=নিঃ উপধি, নাই ভিত্তি ( আসক্তি ) যার॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

পাপী মার বল্ল, যার সন্তান আছে, পুত্র হেতু তার আনন্দ সকল আছে ; যেমন গো-পাল যার আছে, গো-পালের প্রভু হিসাবে তার আনন্দ আছে। পৃথিবীর ( জিনিসসমূহে ) আসক্তিতেই মানুষের আনন্দ। যার কোনো আসক্তি নেই, সে নিশ্চিতই আনন্দিত হয় না ( আনন্দ করে না ) ॥

**ভগবা ঃ**

সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা
গোমিকো গোহি তথ'এব সোচতি।
উপধিহি ণরস্‌স সোচনা
ণ হি সোচতি যো ণিরূপধি॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

ভগবান বুদ্ধ বল্লেন, যেমন গো-পালের প্রভু গো-পাল হেতু শোক করে, তেমনি যার পুত্র আছে, সে পুত্রহেতু শোক করে। আসক্তিই নিশ্চিতভাবে নরের শোকের কারণ। যে আসক্তিহীন, সে নিশ্চিতই শোক করে না॥

উচ্চে কুলে অহং জাতা বহুবিত্তে মহাদ্ধনে
বণ্ণরূপেন সম্পন্না ধীতা মহ্যস্স অত্তজা ॥

পত্থিতা রাজপুত্তেহি সেট্‌ঠিপুত্তেহি গিজ্‌ঝিতা
পিতু মে পেসয়ি দূতং দেথ মহ্যং অনোপমং ॥

যত্তকং তুলিতা এসা তুহ্যং ধীতা অনোপমা
ততো অট্‌ঠগুণং দস্‌সং হিরঞ্‌ঞং রতনানি চ ॥

সাহং দিস্বান সম্বুদ্ধং লোকজেট্‌ঠং অনুত্তরং
তস্‌স পাদানি বন্দিত্বা একমন্তং উপাবিসিং ॥

সো মে ধম্মং অদেসেসি অনুকম্পায় গোতমো
নিসিন্না আসনে তস্মিং ফুসয়িং ততিয়ং ফলং ॥

ততো কেসানি ছেত্তান পব্বজিং অনগারিয়ং
সাজ্জ মে সত্তামী রত্তি যতো তণহা বিসোসিতা ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

বহুবিত্তে=বহুবিত্ত ॥ মহাদ্ধনে=মহাধনবান ॥ বণ্ণরূপেন=বর্ণে এবং রূপের দ্বারা ॥ ধীতা=সং. দুহিতা>হিতা>ধীতা ॥ পত্থিতা=সং. প্রার্থিতা ॥ গিজ্‌ঝিতা=সং. √গৃধ্‌+ক্ত্বাচ্‌>গৃধিত্বা>গিজ্‌ঝিতা—লুব্ধ হয়ে ॥ পেসয়ি =সং. প্র+ইষ+অতীত কাল>প্রেষয়ে, প্রেরণ করেছিল ॥ দেথ=সং. দদাতু>দেয়থ>দেথ। দান কর ॥ তুলিতা=তৌল করা হয়েছে এমন স্ত্রীলোক ॥ দস্‌সং=দান করব ॥ হিরঞ্‌ঞং=হিরণ্যং ॥ দিস্বান=বৈদিক দৃশ্বান>সং. দৃষ্ট্বা>দিস্বান ( দেখে ) ॥ সম্বুদ্ধং=সম্যক বুদ্ধ। লোকজেট্‌ঠং= লোকশ্রেষ্ঠ ॥ অনুত্তর=নিরুত্তর ॥ পাদানি=পদযুগল। দ্বিবচন বোঝাতে বহুবচনের প্রয়োগ, কারণ পালিতে দ্বিবচন নেই ॥ বন্দিত্বা=বন্দনা করে।

সং. বন্দ্+ক্তাচ্>বন্দিত্বা ॥ অদেসিসি=আদেশ করলেন ॥ নিসিন্না=উপবিষ্ট হয়ে ॥ ফুসয়িং=সং. স্পৃশয়েম্, স্পর্শ করলাম। ততিয়ং=তৃতীয়ং ॥ ছেত্তান=ছিন্ন করে ॥ অনগারিয়ং=অনগৃহম্, গৃহহীন ॥ তণ্হা=তৃষ্ণা ॥ বিসোসিতা=তিরোহিত ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

আমি বহুবিত্ত, জন্ম নিয়েছি মহাধনবান উচ্চবংশে। আমার আত্মজা কন্যাও সৌন্দর্যে ও রূপেগুণে যথেষ্ট সম্পন্না ॥

আমার কন্যা রাজপুত্রদের দ্বারা প্রার্থিতা হয়েছিল। শ্রেষ্ঠীপুত্ররাও লুব্ধ হয়ে আমার পিতার কাছে 'অনুপমাকে আমাকে দান কর' এই বলে দূত পাঠিয়েছিল ॥

তারা আরও বলেছিল, তোমার কন্যা অনুপমাকে ওজন করে যত হবে তার আটগুণ সোনা ও রত্ন আমরা দান করব ॥

সেই আমি লোকশ্রেষ্ঠ সম্যকবুদ্ধকে নীরব দেখে তাঁর পদযুগল বন্দনা করে একপাশে বসলাম ॥

অনুকম্পা করে সেই গোতম আমাকে ধর্মোপদেশ দান করলেন। আমি সেই আসনে বসে তৃতীয় ফল স্পর্শ করলাম ॥

তারপর কেশ কর্তন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে গৃহহীন হলাম ; আজ তার সপ্তম রাত্রি, আমার তৃষ্ণা তিরোহিত ॥

শকুন্তলার কাব্যাংশটির পদগুলি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত। সমস্ত রকম প্রাকৃতের মধ্যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত গানের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে পদমধ্যস্থিত অযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি প্রায় লোপ পাওয়ায় ভাষা অতি শ্রুতিসুখকর হয়েছে। শৌরসেনী এবং মহারাষ্ট্রীর রূপ প্রায় এক হলেও শৌরসেনীতে পদমধ্যস্থ ব্যঞ্জনবর্ণগুলি লোপ না পাওয়ায় তা একটু কর্কশ। উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের কথ্যভাষা হিসাবে সংস্কৃত নাটকে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ব্যবহার সাহিত্যদর্পণে অনুমোদিত।

খণ চুম্বিআই ভমরেহি উঅহ সুউমার-কেসর-সিহাইং।
অবঅমসঅন্তি সদঅং সিরীসকুসুমাঈ পমদাও॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

চুম্বিআই=চুম্বিতানি॥ সুউমার-কেসর-সিহাইং=সুকুমার-কেশর-শিখাণি॥
অবঅমসঅন্তি=অবতংসয়ন্তি॥ পমদাও=প্রমদাঃ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

দেখ, ভ্রমরগণের দ্বারা প্রতিক্ষণে চুম্বিত সুকুমার কেশরযুক্ত শিরীষ পুষ্পগুলিকে প্রমদাগণ অতি আদরের সঙ্গে কর্ণভূষণ হিসাবে ব্যবহার করছে।

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা-অ-রাত্তিং চ।
ণিক্কিব দাবই বলিয়ং তুঅ হুত্ত মণোরহাহী অংগায়িং॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

তুজ্ঝ=তুভ্যং॥ ণ আণে=ন জানে॥ উণ=পুনঃ॥ মঅণো=মদনঃ॥
ণিক্কিব=নিষ্কৃপ, যার কৃপা নেই॥ দাবই=তাপয়তি॥ হুত্ত=বৃৎ ধাতু ক্ত; বৃত্ত॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

হে নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয়ে কি হচ্ছে আমি জানি না। কিন্তু তোমাতে আমার সমস্ত ইচ্ছা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় মদনদেব আমার অঙ্গ সমূহকে অহর্নিশ সব সময়ে প্রবল-ভাবে তাপিত করছে॥

উল্ললই ( উল্ললিঅ ) দব্ভ-কবলা মঈ পরিচ্চত্ত ণচ্চণা মোরা।
ওসরিঅ-পণ্ডুবত্তা মুঅন্তি অংসুঈং ব লআও॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

উল্ললই=উল্লসিত ॥ দব্ভকবলা=দর্ভকবলা ॥ মঈ=মৃগী ॥ পরিচ্চত্ত=পরিত্যক্ত ॥ ণচ্চণা=নর্তনা ॥ মোরা=ময়ূরাঃ ॥ ওসরিঅ=অপসৃত ॥ পণ্ডুবত্তা=পাণ্ডুপত্রাঃ ॥ অংসূঈং=অশ্রুনীরং ॥ লআও=লতাঃ ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

মৃগীর মুখ থেকে কুশের গ্রাস খসে খসে পড়ছে। ময়ূররা তাদের নৃত্য পরিত্যাগ করেছে। লতাগুলি থেকে পাণ্ডুপত্র ( শুষ্কপত্র ) গুলি খসে পড়ে যাচ্ছে, যেন তারা অশ্রুপাত করছে ॥

পুদইণি বত্তন্তরিঅং বাহরিঅ ণাণুবাহরেই পিঅং।
মুহ-উব্বূঢ়-মুণাল তই দিট্‌ঠিং দেই চক্কাও ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

পুদইণি=পদ্মিনী ॥ বত্তন্তরিঅং=পত্রান্তরিতাং। বাহরিঅ=ব্যাহৃতঃ ॥ ণাণুবাহরেই=নানুব্যাহরতি ॥ মুহ-উব্বূঢ়-মুণাল=মুখ-উদ্যূঢ়-মৃণালঃ ॥ তই=তস্যাং ॥ দিট্‌ঠিং=দৃষ্টিং ॥ দেই=দদাতি ॥ চক্কাও=চক্রবাকঃ ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

পদ্মপত্রের দ্বারা আবৃতা প্রিয়া ( চক্রবাকী ) চিৎকার করলেও সে ( চক্রবাক ) প্রত্যুত্তর দেয় না। চক্রবাক মুখে একখণ্ড মৃণাল দিয়ে প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে ॥

অহিণব-মহু-লোহ-ভাবিঅ তহ পরিচুম্বিঅ চুঅ মঞ্জরীং।
কমল-বসঈ-মেত্ত-নিব্বুত্ত মহুর বীসরঅসি ণং কহং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

অহিণব=অভিনব ॥ মহু-লোহ-ভাবিঅ=মধুলোভভাবিতঃ ॥ তহ=তথা ॥ পরিচুম্বিয়=পরিচুম্বিত ॥ চুঅ মঞ্জরীং=চূতমঞ্জরীং ॥ কমল-বসঈ-মেত্ত-ণিব্বুত্ত=কমল বসতিমাত্র নির্বৃতঃ ॥ মহুর=মধুকর ॥ বীসরঅসি=বিস্মৃতোসি ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

রে মধুকর, তুমি নতুন মধুর লোভে আকৃষ্ট হয়েছ। তুমি আম্রমুকুলকে চুম্বন করে গিয়ে এখন কমলে বাস করে আনন্দিত হয়ে এই চূতমঞ্জরীকে ভুলে গেলে কিভাবে ?

আম্বহরিঅবেণ্টং উস্‌সিঅং বিঅ বসন্ত মাসস্‌স।
দিট্‌ঠং চূঅণকুরঅং ছণমঙ্গলং ণিঅচ্ছামি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

আম্বহরিঅবেণ্টং=আম্রহরিতবৃন্তং ॥ উস্‌সিঅং=উচ্ছ্বসিতং ॥ বিঅ=ইব ॥ চূঅণকুরঅং=চূতকোরকং ॥ ছণমঙ্গলং=ক্ষণমঙ্গলং ॥ ণিঅচ্ছামি=নিগচ্ছামি ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

কাঁচা আমের মত সবুজবর্ণ-বৃন্ত-বিশিষ্ট আম্রমুকুল, যা বসন্তকালের জীবনস্বরূপ, সেই আম্রমুকুল দেখা যাচ্ছে। একে আমরা এই বসন্তকালের শুভসূচক বলে মনে করছি ॥

অরিহসি মে চুঅংকুর দিণ্ণো কামস্‌স গহিঅ চাবস্‌স।
সত্তবিঅ জুঅই লক্‌খো পঞ্চব্‌ভহিঅ সরো হউং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

অরিহসি মে=অইসি মে ॥ দিণ্ণো=দত্ত ॥ চাবস্‌স=চাপস্য ॥ সত্তবিঅ জুঅই=সন্তপ্ত যুবতী ॥ পঞ্চব্‌ভহিঅ—পঞ্চাভ্যাধিকঃ, পাঁচের চেয়ে বেশি ॥ সরো=শরঃ ॥ হউং=ভবিতুম্ ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

হে আম্রমুকুল, তুমি গৃহীত-ধনু কামদেবের হাতে দত্ত ( অর্পিত ) হওয়ায় সন্তপ্ত যুবতীগণ তোমার লক্ষ্যস্থল হয়েছে। তাতে তুমি ( কামদেবের ) পাঁচটি বাণের জায়গায় ছটি বাণ থেকে সামর্থ্য লাভ করেছ ॥

সহঅরী-দুক্খালিদ্ধঅং
সরবরম্মি সিণিদ্ধং
অবিরল-বাহ-জলোল্লং
তম্মই হংসী-জুঅলঅং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

সহঅরী = সহচরী ॥ দুক্খালিদ্ধঅং = দুঃখবিক্ষিপ্ত হৃদয়ে ॥ সিণিদ্ধ = স্নিগ্ধ ( স্বরভক্তি ) ॥ বাহ = বাষ্প > বাষ্ফ > বাফ > বাহ ( অশ্রু ) ॥ জলোল্লং = জলার্দ্রং > জলড্ডং > জলোল্লং ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

পরস্পরের প্রতি ঃ সহচরীর বিরহ দুঃখে বিক্ষিপ্তহৃদয়ে এই হংসীযুগল অবিরল বাষ্পধারায় ( অশ্রুধারায় ) আর্দ্র হয়ে এই সরোবরে বিলাপ করছে ॥

চিন্তাদুম্মিঅ মাণসিআ
সঅহরী দংসণ লালসিআ
বিঅসিঅ-কমল-মণোহরেই
বিহরই হংসী সরোবরেই ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

চিন্তাদুম্মিঅ = চিন্তাপীড়িত ॥ দংসণ = দর্শন > দম্সন > দংশণ ॥ বিঅসিঅ-কমল-মনোহরেই = বিকশিত-কমল-মনোহর, বিকশিত কমলের দ্বারা (৩য়া তৎপুরুষ) যা মনোহর এমন (বহুব্রীহি) ॥ বিহরই = বিহরতি ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

চিন্তাপীড়িত মানসা হংসী সহচরী দর্শনে উল্লসিত হয়ে বিকশিত কমলের দ্বারা মনোহর সরোবরে বিহার করছে ॥

গহণং গঈন্দ ণাহো
পিঅ-বিরহুম্মাঅ-পঅলিঅ-বিআরো
বিসই তরু-কুসুম-কিসলঅ
ভূসিঅ ণিঅ দেহ পব্ভারো ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

গঈন্দ = গজেন্দ্র ॥ পিঅ-বিরহুম্মাঅ = প্রিয়-বিরহ উন্মত্ততায় ॥ পঅলিঅ = প্রকটিত ॥ বিসই = প্রবিশতি, প্রবেশ করছে ॥ ভূসিঅ = ভূষিত ॥ ণিঅ দেহ পব্ভারো = নিজের দেহের অগ্রভাগ ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

প্রিয়া বিরহজনিত উন্মত্ততায় মানসিক বিকার প্রকটিত করে গজেন্দ্রনাথ বৃক্ষের কুসুম এবং কিশলয়ের দ্বারা নিজের দেহের অগ্রভাগ ভূষিত করে গহন অরণ্যে প্রবেশ করছে ॥

দইআ-রহিও অহিঅং দুহিও
বিরহাণুগঅও পরিমণ্থরঅও
গিরিকাণণেই কুসুমজ্জলেই
গজ-যূহ-বঈ বহু ঝীণ-গঈ ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

দইআ-রহিও = দয়িতারহিত ॥ দুহিও = দুঃখিত ॥ বিরহাণুগঅও = বিরহানুগত ॥ গিরিকাণণেই = গিরিকাননৈঃ । কুসুমজ্জলেই = কুসুমোজ্জ্বলৈঃ ॥ গজ-যূহ = গজযূথ ॥ বঈ = পতি > বতি > বঈ ॥ ঝীণ = ক্ষীণ > ছিনো > ঝীণ ।

**বাংলা অনুবাদ :**

দয়িতারহিত হয়ে বিরহপীড়িত গজযূথপতি কুসুমোজ্জ্বল গিরিকাননে গমন করতে করতে ক্রমশ ক্ষীণগতি হয়ে পড়ছে ॥

মঈং জাণিঅ মিঅ-লোঅণি
ণিসঅরু কোই হরেই
যাব ণু ণভতলি সামল
ধারাহরু বরিসেই ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

মঈং ( মঞিং ) = ময়া > মই > মঈ [ ৩য়া একবচনে ময়েণ ] ॥ জাণিঅ = জ্ঞাত ॥ মিঅ-লোঅণি = মৃগলোচনী ॥ ণিসঅরু = নিশাচর ॥ কোই = কেহ ॥ হরেই = হরণ করেছে ॥ যাব ণু = যাবদ্ নু, কেননা ॥ নভতলি নভস্তলি ॥ সামল = শ্যামল ॥ ধারহরু = ধারাসার ॥ বরিসেই = বর্ষেই, বর্ষণ করছে ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

আমি জ্ঞাত ছিলাম ( বা আমার দ্বারা জ্ঞাত ছিল ), কোনো নিশাচর মৃগলোচনা আমার প্রিয়াকে হরণ করেছে, কেন না শ্যামল নভস্তল ধারাসার বর্ষণ করছে ॥

গন্ধুম্মাইঅ-মহুঅর-গীয়েহিং
বজ্জন্তেহিং পরহুঅ-তূরেহিং
পসরিঅ-পবণুব্বেলিঅ-পল্লব-ণিঅরু
সুঅলিঅ-বিবিহপআরং ণচ্চই কপ্পরু ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

গন্ধুম্মাইঅ = গন্ধোন্মত্ত ॥ মহুঅর = মধুকর ॥ গীয়েহিং = গীতেহিং ( বৈদিক, গীতেভিঃ ) ॥ বজ্জন্তেহিং = বাদ্যমানৈঃ ॥ পরহুঅ = পরভৃত ॥ তুরেহিং = তূর্যৈঃ ( তুরী + এহিং ) ॥ পসরিঅ = প্রবহমান। পবণুব্বেলিঅ = পবনোদ্বেলিত ॥ ণচ্চই = নৃত্যতি ॥ সুঅলিঅ = সুললিত ॥ ণিঅরু = নিকরঃ ॥ বিবিহপআরং = বিবিধপ্রকারং ॥ কপ্পরু = কল্পতরু ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

গন্ধোন্মত্ত মধুকরের গীতের দ্বারা মুখরিত, কোকিল ( রূপ ) তূর্যের দ্বারা শব্দায়মান ( বিদ্যমান ), প্রবহমান পবনের দ্বারা উদ্বেলিত পল্লবসমূহযুক্ত কল্পতরু সুললিত ( ভাবে ) বিবিধ প্রকারে ( নানা ছন্দে ) নৃত্য করছে ॥

পরহুঅ মহুর-পলাবিণি কন্তি
ণন্দণ-বণ-সচ্ছন্দ ভমন্তি
জই তুএঁ পিঅঅম সা মহু দিট্‌ঠী
তা আঅক্‌খহি মহু পরপুট্‌ঠী ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

মহুর-পলাবিণি = মধুর-প্রলাপিনী ॥ পিঅঅম = প্রিয়তম ॥ দিট্‌ঠী = দৃষ্টি ॥ আঅক্‌খহি = বল ॥ মহু = মহ্যং ॥ পরপুট্‌ঠী = পরপুটে ( সম্বোধনে ) ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

হে মধুর-প্রলাপিনি পরভৃত, তুই ত নন্দন বনে স্বচ্ছন্দে বিহার করিস ; যদি আমার প্রিয়তমাকে সেখানে দেখে থাকিস, তবে, হে পুরপুটে, আমাকে বল ॥

হউ পঈ পুচ্ছিমি অক্‌খহি গঅবরু
ললিঅ-পহারে নাসিঅ তরুবরু

দূর বিণিজ্জিঅ-সসহর-কন্তী
দিট্‌ঠী পিঅ পঈ সম্মুহ জন্তী ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

হউ = অহং > অহকং > হকং > হক > হঅ > হউ ॥ পঈ = পুনঃ ॥ গঅবরু = গজবর ( সম্বোধনে গঅবরু ) ॥ তরুবরু = তরুবর ( মিলের জন্য তরুবরু ) ॥ বিণিজ্জিঅ = বিনিন্দ্যং ॥ সসহরকন্তী = শশধরকান্তি ( বহুব্রীহি সমাস ) ॥ পিঅ পঈ = প্রিয়মপি ( স্বরসঙ্গতি প্রভাবে ) ॥ সম্মুহ = সম্মুখ ॥ জন্তী = যে যাচ্ছে এমন স্ত্রীলোক ( গমন্তী, বিশেষণ ) ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

হে গজবর, আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করছি, তুমি ললিত প্রহারে তরুবরসমূহকে বিনাশ কর, যে আমার প্রিয়া দূর থেকে শশধরকান্তিকে নিন্দা করে, সম্মুখ দিয়ে গমনরতা সেই প্রিয়াকে কি তুমি দেখেছ ?

* এই কবিতাংশটির অন্ত্যমিল লক্ষণীয় ॥

॥ ষষ্ঠঃ অঙ্কঃ ॥

[ ততঃ প্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ পশ্চাৎ বদ্ধ-পুরুষম্ আদায় রক্ষিণৌ চ ]

রক্ষিণৌ : [ পুরুষং তাড়য়িত্বা ] হণ্ডে কুম্ভীলআ, কধেহি কহিং তএ এশে মহালদণভাশুলে উক্কীণ্ণামক্খলে লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিদে ?

ধীবরকঃ : [ ভীতি-নাটিতকেন ] পশীদন্তু ভাবমিশ্শা ণ হগে ইদিশশ্শ অকয্যশ্শ কালকে।

একঃ : কিং ণু ক্খু শোহণে বম্হণে শি ত্তি কদুঅ লঞ্ঞা দে পলিগ্গহে দিন্নে ?

ধীবরক : : শুণধ দাব। হগে ক্খু শক্কাবদালবাশী ধীবলে।

দ্বিতীয়ঃ : হণ্ডে পাড়চ্চলা, কিং তুমং অম্মেহিং যাদিং বশদিং চ পুচ্ছিদে ?

নাগরকঃ : সুঅঅ, কধেদু সব্বং কমেণ। মা ণং পরিবন্ধেধ।

উভৌ : য়ং লাউত্তে আণভেদি। লভেহি লে লভেহি।

**শব্দার্থ ও টীকা :**

হণ্ডে = সং. হণ্ডে, বাংলায় হাঁরে॥ কধেহি < সং. কথয়॥ তএ = সং. ত্বয়া > তুএ > তএ, বাংলায় তুই॥ কহিং = কস্মিন > কস্সিং > কহিং, বাংলায় কই॥ লদণ = রত্ন > রতন > রদণ > লদণ॥ ভাশুলে = ভাস্বরং॥ উক্কীণ্ণামক্খলে = উৎকীর্ণনামাক্ষরং॥ লাঅকীএ = রাজকীয়ং॥ অঙ্গুলীঅএ = অঙ্গুরীয়কং॥ শমাশাদিদে = সমাসাদিতং॥ পশীদন্তু = প্রসীদন্তু॥ হগে = অহং > অহকং > হকং > হদম্ > হগে॥ অকযাশ্শ—অকার্যস্য॥ কালকে = কারকঃ॥ ক্খু = খলু > ক্খু॥ শি = অসি। ত্তি = ইতি॥ কদুঅ = কৃত্বা॥ লঞ্ঞা = রাজ্ঞা॥ পলিগ্গহে = প্রতিগ্রহ > পড়িগ্গহ > পলিগ্গহ॥ দিন্নে = দত্ত॥ দাব = তাবৎ॥ শক্কাবদালবাশী = শক্রাবতার-বাসী॥ পাড়চ্চলা = পাটচ্চর॥ পুচ্ছিদে = √পৃচ্ছ্ > পুচ্ছ্ + ক্ত (ত) > পুচ্ছিদো > পুশ্চিদো > পুচ্ছিদে॥ পরিবন্ধেধ = প্রতিবধান, প্রতি + √বন্ধ্ + লোট্ ত > পরিবন্ধেত > পরিবন্ধেদ॥ লাউত্ত = রাজপুত্র > লাঅউত্ত > লাউত্ত॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

[ শহর-কোতোয়াল রাজার শ্যালক এবং একজন হাতকড়ি দেওয়া লোককে নিয়ে দুজন নগররক্ষকের প্রবেশ ]

রক্ষিদ্বয় : হাঁরে সিঁধেল চোর, বল্ কোথায় তুই এই মহারত্নসমুজ্জ্বল নামাক্ষর-ক্ষোদিত রাজার আঙটি পেয়েছিস ?

ধীবর : ( সভয়ে ) হুজুররা প্রসন্ন হোন। আমি এই রকম অকার্যের কারক নই।

রক্ষীদের মধ্যে একজন : তাহলে কি তুমি কুলীন ( শোভন ) বামুন, এই কথা ভেবে রাজা তোমাকে দান দিয়েছেন ?

ধীবর : আপনারা তবে শুনুন। আমি শক্রাবতারবাসী ধীবর।

দ্বিতীয় জন : হাঁরে চোর, আমরা কি তোর নিবাস এবং জাতির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি ?

শহর-কোতোয়াল : সূচক, একে যথাক্রমে সমস্ত কিছু বলতে দাও। একে বাধা দিওনা।

দুজনে : রাজপুত্র যা আজ্ঞা করেন। বল হে বল ।

ধীবরঃ : শে হগে যালবড়িশাপ্পহুদিহিং মশ্চবন্ধনোবাএহিং কুড়ুম্বভলণং কলেমি।

নাগরকঃ : ( প্রহস্য ) বিসুদ্ধো দাণিং দে আজীবো।

ধীবরঃ : ভস্টকে মা এবং ভণ

শহযে কিল যে বিণিন্দিদে ণ হু শে কম্ম বিবয্যণীয়কে।
পশুমালী কলেদি দালুণং অণুকম্পামিদুলে ভি শোণিকে ॥

নাগরকঃ : তদো তদো।

ধীবরঃ : অধ একোদিয়শং মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডাশো কপ্পিদে। যাবতশ্শ উদলব্ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেস্কামি। পশ্চা ইধ বিকৃকঅস্তং ণং দংশঅন্তে য্যেব গহিদে ভাবমিশ্শেহিং। এত্তিকে দাব এদশ্শ আগমে। অধুণা মালেধ কুস্টেধ বা॥

নাগরকঃ : ( অঙ্গুরীয়কং আঘ্রায্য ) জাণুঅ মচ্ছোদরসংথিদং তি ণত্থি সংদেহ। তধা অঅং সে বিস্সগন্ধ। আগমো দাণিং এদস্স বিমরিসিদব্বো। তা এধ। রাঅউলং জেব গচ্ছমহ।

রক্ষিণৌ : ( ধীবরং প্রতি ) গশ্চ লে গণ্থিশ্চেদআ গশ্চ।

[ ইতি পরিক্রামন্তি ]

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

যালবড়িশাপ্পহুদিহিং = সং. জালবড়িশাপ্রভৃতিভিঃ ॥ মশ্চবন্ধনোবাএহিং = মৎস্যবন্ধনোপায়ৈঃ ॥ কুড়ুম্বভলনং = কুটুম্বভরণং ॥ বিসুদ্ধোদানিং = বিশুদ্ধঃ ইদানীম্ ॥ ভস্টকে = ভর্তক > ভস্টক, সম্বোধনে ভস্টকে ॥ বিবয্যনীয়কে = বিবর্জনীয়কম্ ; পরিত্যাজ্য ॥ পশুমালী = পশুমারী, পশুহত্যাকারক ॥ অণুকম্পামিদুলে—অনুকম্পামৃদুরপি ॥ শোণিকে = সৌনিকঃ, কশাই। সূনা অর্থ পশুচ্ছেদনের কাঠ। তার থেকে সৌনিক ॥ এক্কোদিয়শং = একদিবসম্ ॥ লোহিদমশ্চকে = রোহিতমৎস্যঃ ॥ খণ্ডাশো কপ্পিদে = খণ্ডশঃ কল্পিতঃ, টুকরো টুকরো করে ॥ উদলব্ভন্তলে—উদরাভ্যন্তরে, পেটের মধ্যে ॥ পেস্কামি = প্রেক্ষামি। অক্ষরের স্থান পরিবর্তনের নিয়ম ( metathesis) অনুযায়ী পেস্কামি ॥ পশ্চা = সং. পশ্চাৎ > পচ্ছা > পশ্চা ॥ বিকৃকঅন্তং = সং. বিক্রয়ার্থং > বিক্কঅথং > বিক্কঅন্তং ॥ ণং > এনং। দ্বিতীয় অক্ষরের ওপর স্বরাঘাতের ফলে নং > ণং ॥ যেব > এব ॥ এত্তিকে—এতাবৎ + ক > এতাবৎক > এতাঅক্ক > এতিঅক্ক > এত্তিক, এইটুকু ॥ বিমরিসিদব্বো বি + √মৃশ্ + তব্য > বিম্রষ্টব্য > বিমারীসিদব্বো, স্বরভক্তির প্রভাবে ॥ গন্থিশ্চেদআ = গ্রন্থিশ্ছেদক। গ্রন্থি > গন্থি > গণ্ঠি > বাংলায় গাঁঠ ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

ধীবর ঃ আমি জাল বঁড়শী ইত্যাদি মাছধরার সরঞ্জামের সাহায্যে আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ করি।

নাগরিক ঃ ( সহাস্যে ) তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমার জীবিকা অতি বিশুদ্ধ।

ধীবর ঃ হুজুর, আপনি এমন বলবেন না।। সহজাত কর্ম নিন্দনীয় হলেও তা পরিত্যাজ্য নয়। কশাই পশুহত্যা করে নিষ্ঠুর কাজ করে। কিন্তু তবুও অনুকম্পায় তার হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

নাগরিক ঃ তারপর, তারপর।

ধীবর ঃ তারপর একদিন আমি একটা রুইমাছ যখন টুকরো টুকরো করে কাটছিলাম তখন তার পেটের মধ্যে এই মহারত্নসমুজ্জ্বল আংটিটি দেখলাম। পরে এই জায়গায় বিক্রীর জন্যে এই মাছটাকে যখন দেখালাম, তখন হুজুররা আমায় গ্রেপ্তার করেছেন। এই পর্যন্তই এর প্রাপ্তির বৃত্তান্ত। এখন আমাকে আপনারা মারুন বা কুটে ফেলুন।

নাগরিক ঃ জানুক, মাছের পেটের মধ্যে এই আংটিটা যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ

নেই। কারণ সেই রকম এতে আমিষ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাই এর প্রাপ্তিবৃত্তান্ত এখন চিন্তার বিষয়। সুতরাং, এস রাজপ্রাসাদেই যাই।

সূচক : চলরে গাঁঠকাটা, চল। [ সকলের পরিক্রমণ ]

নাগরকঃ : সূঅঅ, ইধ গোৌরদুয়ারে অপ্পমত্তা পড়িভালেধ মং জাব রাঅউলং পবিসিঅ নিক্কমামি।

উভৌ : পবিশদু লাউত্তে শামিপ্পশাদস্তং।

নাগরকঃ : তধা। [ ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ]

সূচকঃ : যান্নুঅ চিলাঅদি লাউত্তে।

জান্নুক : ণং অবশলোবশপ্পাণীআ খু লাআণো হোস্তি।

সূচক : : যান্নুঅ স্ফুলন্তি মে অগ্‌গহস্তা ( ধীবরম্ নির্দিশ্য ) ইমং গস্থিশ্চেদঅং বাবাদেদুং।

ধীবরঃ : ণালিহদি ভাবে অকালণমালকে ভাবিদুং।

জান্নুকঃ : ( বিলোক্য ) এশে অম্মাণং ঈশলে পত্তে গেণ্‌হিঅ লাঅশাসণং ( ধীবরং প্রতি ) তা শৌলাণং মুহং পেস্কশি অধ বা গিদ্ধসিআলাণং বলী ভাবিশ্‌শি।

নাগরক : : ( প্রবিশ্য ) সিগ্‌ঘং সিগ্‌ঘং এবং ( ইতি অর্ধোক্তে )

ধীবরঃ : : হা হদেস্মি। [ ইতি বিষাদং নাটয়তি ]

নাগরকঃ : মুঞ্চেধ রে মুঞ্চেধ জালোবজীবিণং। উব্বণ্ণো সে কিল অঙ্গুলিঅস্স আগমো। অংহ-সামিণা জেব মে কধিদং।

সূচক : : যধা আণবেদি লাউত্তে যমবশদিং গদুঅ পড়িনিয়ুত্তে ক্‌খু এশে।

[ ইতি ধীবরং বন্ধনান মোচয়তি ]

**শব্দার্থ ও টীকা :**

গোৌরদুয়ারে = গোপুরদ্বারে (Watch Tower-যুক্ত দরজায়) ॥ পরিভালেধ = প্রতিপালয়ত ॥ রাঅউলং = রাজকুলং ॥ শামিপ্পশাদস্তং = স্বামীপ্রসাদার্থং ॥ চিলাঅদি = চিরায়তে ॥ অবশলোবশপ্পাণীআ = অবসরোপসর্পণীয়াঃ ॥ লাআণো = রাজানঃ ॥ হোস্তি = √ভূ + অস্তি > ভবস্তি > ভোস্তি > হোস্তি ॥ স্ফুলস্তি = স্ফুরতঃ > ফুরস্তি > স্ফুলস্তি, সুর্‌সুর্ করছে ॥ বাবাদেদুং = সং. ব্যাপাদয়িতুং > ব্বাবাদেদুং > বাবাদেদুং, বধ করবার জন্যে ॥ ণালিহদি

=সং. না ইতি। ইতি>অইতি>অরিহরি (স্বরভক্তির প্রভাবে) >অলিহদি>+ন=নালিহদি ॥ ঈশলে=ঈশ্বর>ইস্সর>ঈসর>ঈশল +প্রথমায় 'এ' > ঈশলে ॥ হদেম্মি=হতোস্মি ॥ মুঞ্চেধ=মুঞ্চত ॥ জালোবজীবিণং<জালোপজীবিনং। যমবশদিং=যমবসতিং, যমের বাড়ী ॥ গদুঅ=সং. গত্বা >গতুঅ (ব-ফলা পরিণত উ+অ)>গদুঅ, গিয়ে ॥ শৌলাণং=শূলানাং ॥ গিদ্ধশিআলাণং=গৃধ্রশৃগালানাং, শকুন শেয়ালের।

**বাংলা অনুবাদঃ**

নাগরিকঃ সূচক, এই গোপুরদ্বারে বা তোরণদুয়ারে খুব সতর্কতার সঙ্গে আমার জন্যে অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আমি রাজপ্রাসাদে গিয়ে ফিরে আসি।

দুজনেঃ রাজার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আপনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করুন।

নাগরিকঃ তাই হোক। (প্রস্থান)।

সূচকঃ জানুক, রাজপুত্র দেরী করছেন।

জানুকঃ রাজার কাছে অবসর মত গিয়ে উপস্থিত হতে হয়।

সূচকঃ জানুক, আমার হাত নিশ্‌পিশ্‌ করছে (ধীবরকে দেখিয়ে) এই গাঁঠকাটাটাকে বধ করবার জন্যে।

ধীবরঃ হুজুর, আমাকে অকারণে বধ করা আপনার উচিত নয়।

জানুকঃ (দৃষ্টিপাত করে) এই যে আমাদের প্রভু পত্রে রাজার আদেশ নিয়ে, (ধীবরের প্রতি) এবার তুই শূলের মুখ দেখবি কিংবা তোকে শকুন শেয়ালের ভক্ষ্য হতে হবে।

নাগরিকঃ (প্রবেশ করে) শীঘ্র শীঘ্র একে (অর্ধোক্তি)।

ধীবরঃ হায়, এবার আমি গেছি! [বিষাদ]।

নাগরিকঃ ছেড়ে দে রে, এই জেলেকে ছেড়ে দে। এর সেই আংটিপ্রাপ্তির বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। আমার প্রভুই (রাজাই) আমাকে বলেছেন।

সূচকঃ হুজুর যা আদেশ করেন। এই লোকটা যমের বাড়ী গিয়ে আবার ফিরে এল।
[ধীবরের বন্ধন মোচন]

ধীবরকঃ ঃ [নাগরকং প্রণম্য] ভস্টকে তব কালকে মম জীবিদে।
[ইতি পাদয়োঃ পততি]

নাগরকঃ ঃ উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি। এসো ভট্টিনা অঙ্গুলীঅমুল্লসম্মিদো পারিদোসিয়ো দে পসাদীকিদো। তা গেহ্ণ এদং। [ইতি ধীবরায় কটকং প্রযচ্ছতি]

ধীবরকঃ ঃ [ সহর্ষং প্রতিগৃহ্য ] অনুগ্‌গহিদে ম্হি।

জানুকঃ ঃ [ এশে ক্‌খু লঞ্‌ঞা তধা ণাম অনুগ্‌গহিদে ইয়ং শূলাদো ওদালিঅ হস্তিস্কন্ধং শমালোভিদে।

সূচকঃ ঃ লাউত্তে পালিদোষিয়ে কধেদি মহালিহলদণেণ তেণ অঙ্গুলীঅএণ সামিণো বহুমদেণ হোদব্বং তি।

নাগরকঃ ঃ ণং তস্‌সিং ভট্টিনো মহারিহরদণং তি ণ পরিদোসো। এত্তিকং উণ।

উভৌ ঃ কিং উণ।

নাগরকঃ ঃ তক্কেমি তস্‌স দংসণেণ কো ভি হিঅঅত্থিদো জানো ভট্টিনা সুমরীদোত্তি যদো তং পেক্‌খিঅ মুহুত্তঅং পইদিগম্ভীরো বি পয্‌যুস্‌সুঅমনো আসি।

সূচকঃ ঃ তোষিদে দানি ভস্টা লাউত্তেণ।

জানুকঃ ঃ ণং ভণামি ইমশ্‌শ মশ্চলীশত্তুনো কিদে ত্তি। [ ইতি ধীবরম্‌ অসূয়য়া পশ্যতি ]।

ধীবরকঃ ঃ ভস্টকা ইদো অদ্ধং তুম্মাণং পি শুলামূল্লং ভোদু।

জানুকঃ ঃ ধীবল মহত্তলে শম্পদং মে পিঅবঅশ্‌শকে সম্‌ভুত্তেশি। কাদম্বলী-শক্খিকে ক্‌খু পধমং অস্মাণং শোহিদে ইশ্চিয়দি। তা শুণ্ডিকাগালং এব গশ্চম্ম। [ ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ]॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

তব কালকে = সং. তব কৃতে। আপনার জন্যে॥ উট্‌ঠেহি = সং. উৎ+স্থা +লোট্‌ হি > উত্তিষ্ঠ > উত্থাহি > উট্‌ঠাহি > উট্‌ঠেহি॥ ভট্টিনা >সং. ভর্ত্রা॥ অঙ্গুলীঅমুল্লস্‌সম্মিদো = সং. অঙ্গুরীয়কমূল্যসম্মিতঃ, আংটির দামের সমান॥ পারিদোষিয়ো = সং. পারিতোষিকঃ॥ পসাদীকিদো = সং. প্রসাদীকৃতঃ॥ গেহ্ন = সং. গৃহাণ। লঞ্‌ঞা = রাজ্ঞা॥ শূলাদো = সং. শূলাৎ, শূল হইতে॥ ওদালিঅ = সং. অবতার্য > স্বরভক্তির প্রভাবে অবদারিঅ > অওদারিঅ > মা. প্রা. ওদালিঅ॥ শমালোভিদে = সং. সমারোপিতঃ॥ মহালিহলদণেণ = সং. মহার্হরত্নেন॥ হোদব্বং = সং. ভূ+তব্য > ভবিতব্য। ভবিতবং > হোদব্বং॥ ভট্টিনো < ভর্ত্তুঃ॥ মহারিহরদণং = মহার্হরত্নং॥ তক্কেমি

=সং. তর্কয়ামি, আমি মনে করি ॥ দংসণেণ=সং. দর্শনেন>দস্‌সণেণ >দংসণেণ ॥ হিঅঅখিদো=হৃদয়স্থিত ॥ সুমরীদো<স্মৃতঃ ॥ মুহূত্তঅং <মুহূর্তং ॥ পইদিগম্ভীরো=প্রকৃতিগম্ভীরঃ ॥ দানী=ইদানীং ॥ ভস্‌টা=ভত্তা >ভট্টা > ভস্‌টা ॥ মশ্চলীশত্তুনো=মৎস্যশত্রোঃ ॥ পয়্যুস্‌সুঅমনো= পর্যুৎসুকমনাঃ ॥ শুলামুল্লং=সুরামূল্যং ॥ ভোদু=ভবতু>ভোতু>ভোদু ॥ মহত্তলে<মহত্তরঃ ॥ কাদম্বলী শক্খিকে=কাদম্বরীসখ্রকঃ, কাদম্বরী অর্থ মদের বোতল। মদের বোতলকে সাক্ষী রেখে ॥ শোহিদে=সৌহৃদং ॥ পিঅব-অশ্‌শকে=প্রিয়বয়স্যকঃ ॥ শুণ্ডিকাগালং=শৌণ্ডিকাগারং, শুঁড়ীর বাড়ী ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

ধীবর ঃ [ নাগরককে প্রণাম করে ] প্রভু, আপনার জন্যেই আমার জীবন রক্ষা হল। [ এই বলে পায়ে পড়ল ] ॥

নাগরক ঃ ওঠ, ওঠ, এই আমাদের প্রভু আংটির সমান পারিতোষিক তোমাকে অনুগ্রহ করে দিয়েছেন। তা তুমি গ্রহণ কর। [ এই বলে ধীবরকে অর্থ প্রদান ]

ধীবর ঃ [ সহর্ষে গ্রহণ করে ] আমি অনুগৃহীত ॥

জানুক ঃ এই লোকটাকে রাজা এই রকম ভাবে অনুগৃহীত করলেন, যেন তাকে শূল থেকে নামিয়ে হাতির পিঠে বসানো হল ॥

সূচক ঃ হুজুর, পারিতোষিক দেওয়া থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহামূল্য রত্নবিশিষ্ট সেই আংটি রাজার খুব মনোনীত হয়ে থাকবে ॥

নাগরক ঃ সেই আংটিতে মহামূল্য রত্ন আছে বলেই যে রাজার পরিতোষ হয়েছে, এটা আমার মনে হয় না, তবে কিন্তু এইমাত্র—

দুজনে ঃ কি রকম? কি রকম?

নাগরক ঃ আমার মনে হয়, সেই আংটি দেখে রাজা কোনো প্রিয়জনকে স্মরণ করেছেন, কারণ সেই আংটি দেখে তিনি স্বভাবত গম্ভীর হলেও, মুহূর্তকাল অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হয়েছিলেন ॥

সূচক ঃ হুজুর, তাহলে আপনি রাজাকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করেছেন ॥

জানুক ঃ আমি বলব, মাছের শত্রু এই জেলের জন্যেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। [ ধীবরের দিকে দৃষ্টিপাত ] ॥

ধীবর ঃ হুজুরেরা, এই পারিতোষিকের অর্ধেক আপনাদের মদের খরচ হোক ॥

জানুক ঃ ধীবর, সম্প্রতি তুমি আমার প্রিয় বয়স্য হবে। আমাদের এই প্রথম বন্ধুত্ব মদের বোতলকে সাক্ষী রেখে হোক, এই আমার ইচ্ছা। সুতরাং, এসো আমরা শুঁড়ীর বাড়ী যাই ॥ [ সকলের প্রস্থান। ] ॥

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

সম্বাহকঃ—হীমাণহে কট্ঠে এশে জুদিঅলভাবে।

ণব বন্ধন মুক্কাএ বিঅ গড্ডহীএ
হা তাড়িদোংহি গড্ডহীএ
অঙ্গলাঅ মুক্কাএ বিঅ শত্তীএ
ঘড়ুক্কো বিঅ ঘাদিদোংহি শত্তীএ ॥
লেখঅবাবড়হিঅঅং শহিঅং দশ্খুণা ঝত্তি পব্ভশ্থে
এণহিং মগ্গণিপড়িদে কং ণু কৃখু শলণং পপজ্জে ॥
তা জাব এদে সহিঅজুদিঅলা অণ্ণদো মং
অণ্ণেশন্তি তাব হক্কে বিপ্পদীবেহিং পাদেহিং এদং
শূন্নদেউলং পবিশিঅ দেবীভবিশ্শং ॥

[ ততঃ প্রবিশতি মাথুর দ্যূতকরশ্চ ]

মাথুরঃ—অলে ভত্তা দশ সুবণ্ণাহ লুদ্ধু জুদকরু পপলিণু পপলিণু। তা গেহ্ন গেহ্ন। চিশ্থ চিশ্থ। দূরা পদিশ্থোসি ॥

দ্যূতকরঃ—জই বজ্জসি পাদালং ইন্দং শলণং চ সম্পদং জাসি।

সহিঅং বজ্জিঅ এক্কং রুদ্দো বি ণ রক্খিতুং তরই ॥

মাথুরঃ—কহিং কহিং সুসহিঅ-বিপ্পলম্ভা

পলাসি লে ভঅ-পলিবেবিদণগআ
পদে পদে সমবিসমং খলন্তআ
কুলং জসং অদিকসণং কলেন্তআ ॥

দ্যূতকরঃ—( পদং বীক্ষ্য ) এসো বজ্জদি। ইঅং পণশ্থা পদবী।

মাথুরঃ—( আলোক্য সবিতর্কং ) অলে বিপ্পদীবু পাহু। পদিমাসুন্ন দেউল। ( বিচিন্ত্য ) ধুত্তু জুদকরু বিপ্পদীবেহিং পাদেহিং দেউলং পবিশ্থো ॥

দ্যূতকরঃ—তা অণুসরেংহ।

মাথুরঃ—এবং ভোত্থু।

দ্যূতকরঃ—কধং কট্‌ঠময়ী পদিমা।

মাথুরঃ—অলে ণহু ণহু শৈলপদিমা। ( ইতি শিরশ্চালয়তি সংজ্ঞাপ্য চ ) এবং ভোত্থু। এহি জুদং কিলেংহ।

[ ইতি বহুবিধং দ্যূতং ক্রীড়তি ]

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

হীমাণহে=হে মানব। মাগধী প্রকৃতে সম্বোধনে 'এ' যুক্ত হয় ॥ জুদিঅল-ভাবে=দ্যূতকরভাবঃ ॥ গড্ডহীএ=গর্দভ্যা ॥ শত্তীএ=শক্ত্যা ॥ বিঅ=ইব ॥ ঘডুক্কো=সং. ঘটোৎকচ>ঘটুক্ক>ঘোডুক্ক ॥ অঙ্গলাঅমু ক্কাএ=অঙ্গরাজমুক্তয়া, অঙ্গরাজকর্তৃক মুক্ত বা নিক্ষিপ্ত ॥ ঘাদিদোংহি=ঘাতিতোঽস্মি, নিহত ॥ লেখঅবাবড়হিঅঅং=লেখকোব্যাপৃতহৃদয়ং, লিখনকার্যে ব্যাপৃত-হৃদয় ॥ শহিঅং=সভিকং ॥ দখ্‌ণা=দৃষ্ট্বা, দেখে ॥ ঝত্তি=ঝটিতি ॥ পব্‌ভস্তে=প্রভ্রষ্টঃ ॥ এণহিং=ইদানিং ॥ মগ্‌গণিপড়িদে=মার্গনিপতিতঃ ॥ কৃখু=সং. খলু>খ্‌খু>কৃখু ॥ শলিণং—শরণং ॥ পপজ্জে—প্রপদ্যে ॥ সহিঅ জুদিঅলা=সভিকদ্যূতকরৌ ॥ অণ্ণদো=অন্যতঃ ॥ হক্কে=অহং ॥ অহং>হকং>হক্কে ॥ বিপ্পদীবেহিং=বিপ্রতীপাভ্যাং ॥ পাদেহিং=পাদাভ্যাং ॥ পবিশিঅ=প্রবিশ্য, স্বরভক্তির প্রভাবে ॥ দেবীভবিশ্‌শং—দেবীভবিষ্যামি, দেবী হব বা দেবীর ভান করব ॥ ভত্তা=ভট্টারকঃ, ভদ্রমহোদয়গণ ॥ দশস্থবণ্ণাহ=দশসুবর্ণস্য ॥ লুদ্ধ্=লুব্ধ্ বা রুদ্ধ ॥ জুদকল=দ্যূতকরঃ ॥ পপলিণু=প্রপলায়িতঃ ॥ গেহ্ন=গৃহাণ, ধরুন ॥ চিথ=তিষ্ঠ ॥ পদিখোসি=প্রদৃষ্টোঽসি, দেখতে পাচ্ছি ॥ বজ্জসি=ব্রজসি ॥ রকৃখিতুং=রক্ষিতুং, রক্ষা করতে ॥ এসো বজ্জদি—এষং ব্রজতি ॥ অলে বিপ্পদীবু পাদু=অহো বিপ্রতীপাভ্যাং পাদৌ, দেখ বিপরীত পায়ের চিহ্ন ॥ পদিমাশুণ্ণ=প্রতিমাশূন্য ॥ অণুসলেংহ=অনুসরামঃ, অনুসরণ করি ॥ এবং ভোত্থু=এবং ভবতু ॥ কট্‌ঠময়ী=কাষ্ঠময়ী ॥ কিলেংহ=ক্রীড়ামঃ, খেলব ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

সম্বাহক—হে মানব। জুয়ারীর কাজ বড়ই কষ্টকর।

নতুন বাঁধন-ছেঁড়া গাধার মত আমি অক্ষের দ্বারা তাড়িত হয়েছি ( অর্থাৎ বাঁধন-ছেঁড়া গাধা যেমন ছাড়া পেয়ে দৌড়ে পালায় সেইরকম আমি দৌড়ে

পালাচ্ছি )। অঙ্গরাজ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শক্তির দ্বারা ঘটোৎকচ যেমন নিহত হয়েছিল, আমাকেও দেখছি তেমনি করে নিহত করবে।

দ্যূতকরকে লেখার কাজে ব্যাপৃত দেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলাম। এখন আমি রাস্তায় এসেছি। এখন কার কাছে আশ্রয় নেব। যতক্ষণ দ্যূতকর এবং সভিক আমাকে অন্য জায়গায় খুঁজবে ততক্ষণ আমি উল্টো পায়ে হেঁটে এই শূন্য মন্দিরে ঢুকে দেবী সেজে থাকব।

[ দ্যূতকর এবং মাথুরের প্রবেশ )

মাথুর—ওগো ভদ্রমহোদয়গণ, দশটি স্বর্ণমুদ্রার জন্য আবদ্ধ ঐ জুয়ারী পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। তাকে ধরুন। দাঁড়াও, দাঁড়াও। দূর থেকে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

দ্যূতকর—যদি তুই পাতালেও যাস, যদি ইন্দ্রেরও আশ্রয় গ্রহণ করিস, তবুও সভিককে এড়িয়ে স্বয়ং রুদ্রও তোকে রক্ষা করতে পারবেন না।

মাথুর—সমস্ত শরীর কাঁপছে, পদে পদে স্খলিতচরণ হচ্ছি। আমাদেরকে প্রতারণা করে তুই কোথায় পালাবি ?

দ্যূতকর—( পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে ) সে এইখানেই গিয়েছে, এই পায়ের ছাপ।

মাথুর—( পায়ের ছাপ দেখে বিশেষ চিন্তা করে ) ওরে, উল্টো পায়ের চিহ্ন। প্রতিমা-শূন্য দেবমন্দির। ( বিশেষভাবে চিন্তা করে ) ধূর্ত জুয়ারী উল্টো পা ফেলে ফেলে দেউলের মধ্যে ঢুকেছে।

দ্যূতকর—আসুন তাকে অনুসরণ করি।

মাথুর—তাই হোক।

দ্যূতকর—কি কাষ্ঠময়ী প্রতিমা!

মাথুর—ওরে না, না। পাথরের তৈরী প্রতিমা। ( এই ব'লে নানাভাবে মাথা নেড়ে পরস্পরের দিকে সংকেত ) তাই হোক। এখানেই আমরা জুয়া খেলব। ( এই ব'লে নানাভাবে জুয়া খেলা আরম্ভ )॥

সম্বাহকঃ—[ দ্যূতেচ্ছাবিকারসংবরণং বহুবিধং কৃত্বা স্বগতম্ ] অলে কত্তাশদ্দে ণিণ্ণঅশ্শ হলই হড়কং মণুশ্শশ্শ। ঢক্কাশদ্দে ব্ব ণলাধিবশ্শ পব্ভথলজ্জশ্শ। জানামি ণ কিলিশ্শং শুমেলুশিহলপড়ণশণ্ণিহং জুঅং তহ বি হু কোঅিলমহুলে কত্তাশদ্দে মণং হলদি।

দ্যূতকরঃ—মম পাঠে মম পাঠে।

মাথুরঃ—ণ হু। মম পাঠে মম পাঠে।

সম্বাহক ঃ—[ অন্যতঃ সহসোপসৃত্য ] ণং মম পাঠে।

দ্যূতকরঃ—লদ্ধে গোহে!

মাথুরঃ—( গৃহীত্বা ) অলে পেদণ্ডআ গহীদো সি। পঅচ্ছ তং দশসুবন্নং।

সম্বাহকঃ—অজ্জ দইশ্শং।

মাথুরঃ—অহণা পঅচ্ছ।

সম্বাহকঃ—দইশ্শং। পশাদং কলেহি।

মাথুরঃ—অলে ণং সম্পদং পঅচ্ছ।

সম্বাহকঃ—শিলু পদদি [ ইতি ভূমৌ পততি। উভৌ বহুবিধং তাড়য়তঃ ]

মাথুরঃ—এস্ তুমং হু জুদিঅরমন্দলীএ বদ্ধোসি।

সম্বাহকঃ—[ উত্থায় সবিষাদং ] কধং জুদিঅলমন্দলীয়ে বদ্ধোংহি। হী এসে অংহাণং জুদিঅলাণং অলংঘণীএ শমাএ। তা কুদো দইশ্শং।

মাথুরঃ—অলে গণ্ডে কুলু কুলু।

সম্বাহকঃ—এব্বং কলেমি। [ দ্যূতকরং উপস্পৃশ্য ] অদ্ধং তে দেমি অদ্ধং মে মুঞ্চহু।

দ্যূতকরঃ—এব্বং ভোদু।

সম্বাহকঃ—( সভিকং উপগম্য ) অদ্ধশ্শ গণ্ডে কলেমি। অদ্ধং পি মে অজ্জো মুঞ্চহু।

মাথুরঃ—কো দোস্। এব্বং ভোদু।

সম্বাহকঃ—( প্রকাশম্ ) অজ্জ অদ্ধে তুয়ে মুক্কে।

মাথুরঃ—মুক্কে।

সম্বাহকঃ—( দ্যূতকরং প্রতি ) অদ্ধে তুএ বি মুক্কে।

দ্যূতকরঃ—মুক্কে।

সম্বাহকঃ—শম্পদং গমিশ্শং।

মাথুরঃ—পঅচ্ছ তং দশসুবন্নং। কহিং গচ্ছসি।

সম্বাহকঃ—পেক্খধ পেক্খধ ভট্টালআ। হা শম্পদং জ্জেব এক্কাহ অদ্ধে গণ্ডে কডে অবলাহ অদ্ধে মুক্কে তহবি মং অবলং শম্পদং জ্জেব মগ্গদি।

মাথুরঃ—( গৃহীত্বা ) ধুত্তু মাথুরু অহং নিউণু। এত্থ তুএ ণ অহং ধুত্তিজ্জামি। তা পঅচ্ছ তং পেদণ্ডআ সব্বং সুবন্নং সম্পদং।

সম্বাহকঃ—কুদো দইশ্শং।

মাথুরঃ—পিদরু বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

সম্বাহকঃ—কুদো মে পিদা।

মাথুরঃ—মাদরু বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

সম্বাহকঃ—কুদো মে মাদা।

মাথুরঃ—অপ্পানং বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

সম্বাহকঃ—কলেধ পশাদং। ণেধ মং লাজমগ্গং।

মাথুরঃ—পসরু।

সম্বাহকঃ—এব্বং ভোদু। [ পরিক্রমতি ] অজ্জা ক্কিণীধ মং ইমশ্শ সহিঅশ্শ হত্থাদো দশেহিং সুবণ্ণকেহিং। [ দৃষ্ট্বা আকাশে ] কিং ভণধ, কিং কলইশ্শসি ত্তি। গেহে দে কম্মকলে হুবিশশং। কধং। অদইঅ পড়িবঅণং গদে। ভোদু। এব্বং ইমং অণ্ণং ভণইশ্শং। [ পুণঃ তদেব পঠতি ] কধং এশে বি মং অবধীলিঅ গদে। তা অজ্জ-চালুদত্তশ্শ বিহরে বিহদিদি এশে বদ্ধামি মন্দভাএ।

মাথুরঃ—ণং নেহি।

সম্বাহকঃ—কুদো দইশ্শং!

[ ইতি পততি, মাথুবঃ কর্ষতি ]

সম্বাহকঃ—অজ্জ পলিত্তাঅধ, পলিত্তাঅধ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

কত্তাশদ্দে=কত্বাশব্দ, অক্ষের শব্দ॥ নিণ্ণঅশ্শ=নির্ণাকস্য॥ হলই=হরতি, হরণ করে। র স্থানে ল॥ ণলাধিবশ্শ=নরাধিপস্য, রাজার॥ হড়কং< সং. হৃদয়ং, ঋ=অ ; দ=ড॥ শুমেলুশিহলপণশন্নিহং=সুমেরুশিখরপতন-সন্নিভং, সুমেরু শিখর থেকে পতনের মত॥ হলদি=হরতি॥ লদ্ধে গোহে=লব্ধঃ গোহঃ। গোহঃ=নিন্দনীয় লোক। বদ্ লোকটিকে ধরা গেল॥ পেদণ্ডআ=সং. অপেতদণ্ডক > পেতদণ্ডক > পেদণ্ডঅ > সম্বোধনে পেদণ্ডআ॥ গৃহীদোসি=গৃহীতোঽসি॥ পঅচ্ছ=প্রযচ্ছ। দাও॥ অজ্জ=অদ্য॥ পশাদং কহেহি=প্রসাদং কুরু॥ সম্পদং=সাম্প্রতং, এক্ষুনি॥ কলেহি—কুরু > করোহি > কলেহি॥ শিলু=শিরঃ॥ জুদিঅরঅমন্দ-

লীএ = দ্যূতকরমণ্ডল্যা, জুয়ারীমণ্ডলী দ্বারা ॥ জুদিঅলাণং = দ্যূতকরাণাং ॥ গণ্ডে = গণ্ডং, জামিন ॥ মুঞ্চদু = মুঞ্চতু, মুক্তি দিন ॥ মুক্ক = সং. √মুঞ্চ্ + ক্ত = মুক্ত > মুক্ক > মাগধী প্রাকৃতে মুক্কে ॥ অবলাহ্ < অপরং ॥ পেক্‌খধ = সং. প্রেক্ষস্ব, দেখুন ॥ ণিউণ = নিপুণঃ ॥ বিক্কিনিজ্জ = বিক্রীয়, বিক্রয় কর ॥ ধুত্তিজ্জামি = ধুর্তয়ামি ॥ পিদা = পিতা, তেমনি মাদা = মাতা ॥ লাজমগ্গং = রাজমার্গম্, রাজপথ ॥ হত্থাদো = হস্তাৎ, হাত থেকে ॥ কম্ম-কলে = কর্মকার ॥ হুবিশ্শং = ভবিষ্যামি ॥ পড়িবঅণং = প্রতিবচনং ॥ চালু-দত্তশ্শং = চারুদত্তস্য ॥ বিহবে = বিভবে, ধনসম্পদ ॥ অদইঅ = সং. ন + ন + দা + ক্ত্বাচ্ = অদত্ত্বা > অদইঅ ॥ পলিত্তাঅধ = পরিত্রয়াধ্বম্, পরিত্রাণ করুন ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

সম্বাহক : [ জুয়া খেলবার ইচ্ছাকে নানাভাবে দমন করে স্বগতোক্তি ] পাশা ফেলার শব্দ ধনহীন মানুষের চিত্তকে হরণ করে, যেমন হৃতরাজ্য রাজা ঢাকের শব্দে চঞ্চল হন। জুয়াখেলাটা সুমেরু শিখর থেকে নীচে পতনের মত জেনেই আমি জুয়া খেলব না স্থির করেছি। তবুও পাশা ফেলার শব্দ কোকিলের কূজনের মত আমার মন হরণ করছে।

দ্যূতকর : আমার দান, আমার দান।

মাথুর : না, না। আমার দান, আমার দান।

সম্বাহক : [ অন্যদিক থেকে হঠাৎ এসে ] না, এটা আমার দান।

দ্যূতকর : বদ লোকটাকে ধরা গেল।

মাথুর : ওরে চুক্তিভঙ্গকারী! এবার তোকে ধরেছি। আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দশটি দাও।

সম্বাহক : আমি আজই দেব।

মাথুর : এক্ষুনি দাও।

সম্বাহক : দেব, দয়া করুন।

মাথুর : আরে না না, আমাকে এখনই দাও।

সম্বাহক : আমার মাথা ঘুরছে [ মাটিতে পতন। দুজনের যথেচ্ছ প্রহার ]

মাথুর : তুমি জুয়ারীদের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে বাঁধা!

সম্বাহক : [ উঠে বিষাদের সঙ্গে ] কি, আমি জুয়ারীদের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে বাঁধা! এই কি আমাদের জুয়ারীদের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম? কোথা থেকে টাকা দেব?

মাথুর : আমাকে তবে জামিন দাও।

সম্বাহক : তাই করব। [ দ্যূতকরের কাছে গিয়ে ] আমি অর্ধেক দেব, বাকি অর্ধেক আপনি মার্জনা করুন।

দ্যূতকর :   বেশ তাই হোক।

সম্বাহক :   [ মাথুরের কাছে গিয়ে ] আমি আপনাকে অর্ধেকের জন্য জামিন দেব, বাকি অর্ধেক আপনি মার্জনা করুন।

মাথুর :   দোষ কি, তাই হোক।

সম্বাহক :   [ উচ্চৈঃস্বরে ] মশাই, তাহলে আমাকে অর্ধেক মার্জনা করছেন!

মাথুর :   মুক্ত।

সম্বাহক :   এখন তবে আসি?

মাথুর :   আমাকে সুবর্ণমুদ্রা দাও। কোথায় যাচ্ছ?

সম্বাহক :   ভদ্রমহোদয়গণ, দেখুন, দেখুন, এঁদের একজনকে অর্ধেক জামিন দেওয়া হয়েছিল, আর অন্যজন আমাকে অর্ধেক মার্জনা করেছেন, তবুও আমি যেহেতু বলহীন, তাই আমার কাছ থেকে এখনও টাকা চাচ্ছেন।

মাথুর :   [ ধরে ] ধূর্ত! আমার নাম মাথুর আর আমি নিপুণ! আমার সঙ্গে তোমার চালাকি চলবে না তঞ্চক দেনদার, এক্ষুনি আমার সব সুবর্ণমুদ্রা শোধ কর।

সম্বাহক :   কোথা থেকে দেব?

মাথুর :   তোমার পিতাকে বিক্রয় করে দাও।

সম্বাহক :   আমার পিতা কোথায়?

মাথুর :   মাতাকে বিক্রয় করে দাও।

সম্বাহক :   আমার মাতা কোথায়?

মাথুর :   নিজেকে বিক্রী করে দাও।

সম্বাহক :   দয়া করুন, আমাকে রাজপথে নিয়ে চলুন।

মাথুর :   চল, চল।

সম্বাহক :   তাই হোক। [ চারদিক ঘুরে ] আর্যা, দশটি সুবর্ণমুদ্রার বদলে আমাকে এই সভিকের হাত থেকে কিনে নিন। [ আকাশের দিকে তাকিয়ে ] কি বলছেন? কি করব? আপনার বাড়ীতে চাকরের কাজ করব। কি? কোনো কথা না বলেই চলে গেল! অন্যকেও এইরকম বলি। [ পূর্বের মত বলে ] কি, এও যে আমাকে অবজ্ঞা করে চলে গেল! হায় আর্য চারুদত্তের ধনসম্পদ সব নষ্ট হওয়ায় দুর্ভাগ্য আরও হীন হয়েছে।

মাথুর :   না, না, দাও।

সম্বাহক :   কেমন করে দেব? [ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মাথুর টানতে লাগল। ] ভদ্রমহোদয়গণ আমাকে বাঁচান, বাঁচান!

[ ধম্মপদ থেকে সংকলিত ]

অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহু জাগরে
অবলস্‌সম্ ব সিঘ অস্‌স, হিত্বা যাতি সুমেধস ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

সুমেধস = সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ॥ যাতি = √যা + বর্তমান কাল + প্রথম পুরুষ একবচন ॥ সিঘ অস্‌স = সিঘ + অস্‌স ; দ্রুতগামী অশ্ব ॥ ব = ইব ॥ অবলস্‌সম্ = দুর্বল অশ্বকে, অবল + অস্‌স ॥
অপ্পমত্তো-পমত্ত = অপ্রমত্ত, প্রমত্ত ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

দুর্বল ঘোড়াকে দ্রুতগামী ঘোড়া যেমন অতিক্রম করে যায়, তেমনি সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রমত্তদের অপ্রমত্ত, সুপ্তদের মধ্যে অধিকতর জাগ্রত থেকে সকলকে অতিক্রম বা পরিত্যাগ করে যান।

দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুন জত্ত কামনিপাতিনো
চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তম দান্তং সুখাবহং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

দুন্নিগ্‌গহস্‌স = দুর্নিগ্রহস্য ॥ লহুন > সং. লঘুন। মহাপ্রাণ 'থ' = হ। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রভাবে এই বিশেষত্ব ॥ জত্ত = যত্র ; assimilation-এর উদাহরণ ॥ নিপাতিন = পতনশীল ॥ দমথ = দমন কর ॥ দান্তং = দমিত ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

দুর্নিগ্রহ, লঘু এবং যত্র ইচ্ছা পতনশীল বা বিচরণশীল চিত্তের দমন সাধু বা উত্তম। কারণ, চিত্ত দমিত হলেই তা সুখাবহ।

ন পরেসং বিলোমাণি, ন পরেসং কতাকতং
অত্তানোব অবেক্‌খেয়, কতানি অকতানি চ ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

বিলোমানি = বি + লোমানি, অন্যায়গুলিকে ॥ কতাকতং = সং. কৃত + অকৃতং ॥ অত্তানোব = অত্তন (আত্মন্) + ব (ইব) ॥ অবেক্‌খেয় = অব + √ইক ; ঔচিত্যার্থে, প্রথম পুরুষ, একবচন। তাকানো উচিত ॥
কত্তানি-অকতানি = কৃতানি অকৃতানি ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

অপরের অন্যায়গুলি নয়, অপরের কৃত ও অকৃত কাজগুলি নয় ; নিজেরই কৃত ও অকৃত কাজগুলিই কেবল দেখা উচিত।

যথাপি পুপ্ফরাসিংহা কইরা মালাগুণবহুং
এবং জুতিনা মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

পুপ্ফরাশিংহা = অপাদানে ৫মী, পুষ্পরাশি থেকে ॥ মালাগুণ = বহুমালা ॥ কইরা = সং. কুর্যাৎ > কুর্য > কুরিয়া > করিয় > কইরা ॥ মচ্চেন = মৃতেন, ৩য়া একবচন ; মরণশীল ॥ বহুং = অনেক ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

যেমন পুষ্পরাশি থেকে অনেক মূল্যবান মালা রচনা করা যেতে পারে, সেইরকম মরণশীল জীবেরও জন্মগ্রহণ করে বহু কুশল বা মঙ্গলজনক কাজ করা উচিত।

পুত্ত মে অত্থি ধণং মে অত্থি ইতি বাল বিহঞ্ঞতি
অত্তা হি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্ত কুতো ধণং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

বিহঞ্ঞতি = বি + হন্ + লট্ + তি ॥ নত্থি = ন অস্তি ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

'আমার ছেলে, আমার ধন'—এই ভেবে মূর্খ বিনষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেই নিজের নয়। কিসের জন্য পুত্র, কিসের জন্য ধন নিজের হবে ॥

সেল যথা একঘন বাতেন ন সমীরতি
এবং নিন্দা প্রসংসেসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

সেল = শৈল ॥ একঘন = ঘনীভূত ॥ পণ্ডিতা = পণ্ডিতের বহুবচন ॥ সমিঞ্জন্তি = সম্ + √ইঙ্গ্ + লট্ + তি ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

যেমন ঘনীভূত শৈল বাতাসের দ্বারা নড়ে না ; পণ্ডিতেরাও সেই রকম নিন্দাপ্রশংসার দ্বারা বিচলিত হন না ॥

যো সহস্সং সহস্সেন সংগামে মানুষে জিনে
একং চে জেয়মত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

সহস্‌সং=সহস্রং ॥ জিনে= √জি+বিধিলিঙ্‌+প্রথম পু.+একবচন ॥

সঙ্গামজুত্তমো=সংগামজিৎ+উত্তমো ( সং. সংগ্রামজিৎ+উত্তম ) ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

যে সংগ্রামে সহস্রগুণিত সহস্র মানুষকে জয় করে সে যদি নিজেকে জয় করে, সেই সকলের চেয়ে সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ ॥

সব্বে তসন্তি দণ্‌ডস্‌স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো
অত্তানং উপমং কত্তা ন হন্যে ন ঘাতয়ে ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

মচ্চুনো=মৃত্যু ॥ সব্বে=সর্বে ॥ ঘাতয়ে= √হন্‌+ণিচ্‌=ঘাতি+ বিধিলিঙ্‌>ঘাতয়েৎ>ঘাতয়ে ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

সকলে দণ্ডে ত্রাসিত হয় ও মৃত্যুকে ভয় করে। নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে হত্যা করানো উচিত নয় বা হত্যা করাও উচিত নয় ॥

সব্বে তসন্তি দণ্‌ডস্‌স সব্বেসং জীবতং পিয়ং
অত্তানং উপমং কত্তা ন হন্যেয় ন ঘাতয়ে ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

পিয়ং>প্রিয়ম্‌।

**বাংলা অনুবাদ :**

সকলেই দণ্ডে ত্রাসিত হয়, জীবন সকলের প্রিয়। নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে হত্যা করাবে না বা হত্যা করানো উচিত নয়।

পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্‌সিতং
আতুরং বহুসংকপ্পং যস্‌স নত্থি ধুবম্‌থিতি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

সমুস্‌সিতং=সম+উৎ+শ্রী+নিষ্ঠা ত' ॥ ধুবং<ধ্রুবং ॥ ॥ থিতি=স্থিতি ॥

অরুকায়ং=ক্ষতযুক্ত দেহ ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

চিত্রিত, ক্ষতযুক্ত, সমুত্তোলিত, রোগগ্রস্ত এবং বহু সংকল্পযুক্ত এই অবয়ব বা মূর্তিটি দেখ—যার নিশ্চিত স্থিতি বা স্থায়িত্ব নেই ॥

অপ্পস্সুতা'ইয়ম্ পুরিস বলিবদ্দ ব জীবতি
মাংসানি তস্‌স বদ্ধন্তি পঞ্‌ঞা তস্‌স ন বদ্ধতি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

অপ্‌পস্সুতা'ইয়ম্=অপপ্‌স্সুত+ইয়ম্ ( অল্পশ্রুত+ইয়ম্ ) ॥ পুরিস=পুরুষ ॥ পঞ্‌ঞা=প্রজ্ঞা ॥ বদ্ধতি=বর্ততে>বর্ততি>বদ্ধতি ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

এই মূর্খ লোকটি বলীবর্দের মত বেঁচে আছে। তার কেবল মাংসই বাড়ছে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা বাড়ছে না ॥

অচরিত্তা ব্রহ্মচরিয়ম্ অলদ্ধা যোব্বনে ধম্মং
জীঞ্‌ঞকোঞ্‌চাব ঝায়ন্তি খীণমচ্চেব পল্ললে ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

ব্রহ্মচরিয়ম্="ব্রহ্মচর্যম্" থেকে স্বরভক্তি ॥ অচরিত্তা=ন+√চর্+ত্বা ॥ অলদ্ধা=ন+লদ্ধা ; অ+√লভ্+ত্বা ॥ ঝায়ন্তি=ধ্যায়ন্তি ; বসে বসে ভাবছে ॥ খীণমচ্চেব=ক্ষীণ মৎস্য ইব ॥ জীঞ্‌ঞকোঞ্‌চাব=জীর্ণ ক্রৌঞ্চ ইব ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

মৎস্যবিহীন ক্ষুদ্র জলাশয়ের বা পল্বলের তীরে জীর্ণ ক্রৌঞ্চেরা যেমন বসে বসে ভাবতে থাকে, সেই রকম যারা যৌবনে ব্রহ্মচর্য পালন করে না, ধন উপার্জন করে না —তারাও বসে বসে চিন্তা করতে থাকে ॥

অত্তাহি অত্তনে নাথ কো হি নাথ পর সিয়া
অত্তনাব সুদন্তেন নাথং দুল্‌লভং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

অত্তা=আত্মন্, প্রথমা ১ বচন ; হি=নিশ্চয়ার্থ অব্যয় ॥ সিয়া= √অস্ +নিষ্ঠা+১মা একবচন>সিয়া ( 'হতে পারে'—এই অর্থে। ) ॥ অত্তনাব = অত্তনা+এব, নিজের দ্বারাই ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

যিনি নিজেই নিজেকে সুন্দররূপে দমন করেছেন, তিনি নিজের মধ্যে দুর্লভ নাথকে লাভ করেন। নিজেই প্রকৃতপক্ষে নিজের নাথ বা প্রভু, অপরজন কি নাথ বা প্রভু হতে পারে ?

উত্তিথে নপ্পমজ্জেয় ধম্মং সুচরিতং চরে
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরমহি চ ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

উত্তিথে = উদ্ + √থা + বিধিলিঙ + প্রথম পুরুষ + ১ বচন ॥ নপ্পমজ্জেয় = ন + পমজ্জেয় ; প + √মদ্ + বিধিলিঙ + প্র. পু. ১ বচন শব্দের আদিতে একক ব্যঞ্জন হয়, তাই প্রথমে একটি প ; কিন্তু 'ন'-র 'অ' যোগ হওয়ায় প > প্প ॥ চরে = √চর্ + বিধিলিঙ + প্র. পু. ১ বচন ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

উঠ, অলস হয়ো না ; ধর্ম আচরণ করা উচিত। ধর্মাচারী ইহলোকে ও পরলোকে সুখে থাকেন ॥

ন কহাপণ-বস্সেণ তিত্তি কামেসু বিজ্জতি
অপ্পসাদা দুঃখা কামা ইতি বিঞ্ঞায় পণ্ডিতো ॥

[ এই শ্লোকটি অসম্পূর্ণ ]

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

তিত্তি = তৃপ্তি ॥ কামেসু = 'কাম' শব্দের ৭মী ১ বচন ; কাম্য বস্তুসমূহ ॥ কহাপণ = কার্ষাপণ > কহাপণ > বাং. কাহন ( মুদ্রা ) ॥ বস্সেন—বর্ষেণ, বর্ষণের দ্বারা ॥ বিঞ্ঞায় = বি + √ঞায় + ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ (gerund) য় ॥ অপ্পসাদা = অল্প + আস্বাদা ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

কার্ষাপণ বস্তুর বর্ষণের দ্বারাও কাম্যবস্তুর তৃপ্তি নেই। "কাম্যবস্তুসমূহ আস্বাদ-বিহীন ও দুঃখজনক"—এটা পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষভাবে জেনে ( বিত্তাসুখও কামনা করেন না ) ॥

জায়ম্ বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিত
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

পসবতি = প্রসবতি ॥ বেরম = বৈরং ॥ উপসন্তো = উপশান্ত ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

জয় বৈরিতার সৃষ্টি করে ( কেন না পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে থাকে )। যিনি উপশান্ত, তিনি জয়পরাজয়কে অতিক্রম করে সুখে থাকেন।

আরোগ্গ পরমালাভা সন্তুট্ঠি পরমং ধনং
বিস্সাস পরমা ঞাতি নির্ব্বাণং পরমং সুখং ॥

ঞাতি = ঞ্জাতি ॥ সন্তুট্‌ঠি = সন্তুষ্টি ॥

**বাংলা ও অনুবাদ ঃ**

আরোগ্য বা স্বাস্থ্য পরম লাভ ; সন্তুষ্টি পরম ধন ; বিশ্বাস পরমজ্ঞাতি ; নির্বাণ পরম সুখ ॥

মা পিয়েহি সমাগঞ্‌ছি অপ্পিয়েহি কুদাচনং
পিয়াণং অদস্‌সনং দুখং অপ্পিয়নঞ্চ দস্‌সনং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

সমাগঞ্‌ছি=সম্‌+আ+গম্‌+লুঙ্‌+মধ্যম পুরুষ, ১ বচন ॥ পিয়েহি=প্রিয়দের সঙ্গে ॥ কুদাচনং=কদাচনং ; অ>উ ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

প্রিয় বা অপ্রিয়দের সঙ্গে কখনও এক হয়ো না ; কেন না প্রিয়দের অদর্শন এবং অপ্রিয়দের দর্শন—উভয়ই দুঃখজনক ॥

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদীনং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

জিনে=√জি+বিধিলিঙ+ প্রথম পুরুষ, ১বচন>জিনেয্য>জিনে ॥
কদরিয়ং—কদর্যম্‌ ( স্বরভক্তি ) ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা, কৃপণতাকে দানের দ্বারা, এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা জয় করবে ॥

ন তেন পণ্ডিত হোতি যাবতা বহুভাসতি
খেমে অবেরি অভয় পণ্‌ডিতোতি পবুচ্চতি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

পবুচ্চতি=প্রবুচ্যতে। তেন=তদ্‌+৩য়া+১বচন ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

যেহেতু বহু ভাষণের দ্বারা পণ্ডিত বলা যায় না, যিনি নিরাপদ, অবৈরী এবং নির্ভয় তাঁকেই প্রকৃত পণ্ডিত বলা হয় ॥

দূরে সন্ত পকাসেন্তি হিমবন্তাব পব্বত
অসন্তেট্‌ঠ ন দিস্‌সন্তে রত্তি খিত্তা যথা সরা ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

সন্ত=শান্ত। সৎ, ১মা, বহুবচন ॥ হিমবন্ত=হিমালয় ॥
দিস্‌সন্তে=দৃশ্যন্তে ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

সৎ ব্যক্তিরা হিমালয় পর্বতের ন্যায় বহুদূরে প্রকাশিত হন। অসৎ ব্যক্তিরা রাত্রিতে নিক্ষিপ্ত শরের নায় ইহজগতে দৃষ্টিগোচর হয় না ॥

সুখা মত্তেয়তা লোকে অথ পেত্তেয়তা সুখা
সুখা সমাঞ্‌ঞতা লোকে অথ ব্রহ্মঞ্‌ঞতা সুখা ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

মত্তেয়তা=মাতৃয়তা>মত্তেয়ত্তা ; মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ॥ পেত্তেয়তা =পিতৃ>পৈত্রেয়>পেত্তেয়+তা ॥ ব্রহ্মঞ্‌ঞতা==ব্রাহ্মণ্যতা ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

মাতার প্রতি সম্মান সুখজনক, পিতার প্রতি সম্মান সুখজনক, শ্রমণের প্রতি সম্মান সুখকর, ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান সুখজনক ॥

চক্‌খুণা সম্বর সাধু সাধু সোতেন সম্বর
ঘাণেন সম্বর সাধু সাধু জিব্‌ভায় সম্বর
কায়েন সম্বর সাধু সাধু বাচায় সম্বর
মনসা সম্বর সাধু সব্বত্থ সম্বর ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

চক্‌খুণা=চক্ষুণা ॥ সোতেন=শ্রবণ শক্তির দ্বারা ॥ ঘাণেন=ঘ্রাণেন ॥ জিব্‌ভায়>জিহ্বায় ; পালিতে জিহ্বা=জিব্‌ভা, অথবা জিহা ॥ বাচায়= বাক্যের দ্বারা ॥ সব্বত্থ=সর্বত্র ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

চক্ষুর দ্বারা আত্মসংযম সাধু বা উত্তম। শ্রবণ শক্তির দ্বারা আত্মসংযম সাধু বা উত্তম ; ঘ্রাণের দ্বারা সংযম সাধু ; জিহ্বার দ্বারা সংযম সাধু ; দেহ, বাক্য, মন সর্ববিষয়ে সংযম সাধু বা উত্তম ॥

যস্‌স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং
সংবতং তিহি থানেহি তম্ অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

দুক্কতং = দুষ্কৃতং ॥ নথি = নাস্তি ॥ তিহি = ত্রীভিঃ ॥ সংবতং = সংবৃতং ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

যার কায় বাক্য এবং মনের দ্বারা কোনো দুষ্কৃত বা অন্যায় করা নেই, যিনি এই ত্রিবিধ স্থানে সংযত বা সংবৃত্ত—তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ॥

ন জটাহি ন গোট্‌ঠেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণ

যংহি সচ্চম্ চ ধম্মং চ সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণ ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

জটাহি = জটাভিঃ, জটার দ্বারা ॥ জচ্চা = জাত্যা ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

জটার দ্বারা, জন্ম ও গোত্রের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যার মধ্যে সত্য এবং ধর্ম আছে, তিনিই শুচি বা পবিত্র এবং তিনিই সত্যিকার ব্রাহ্মণ ॥

ধম্মং চরে সুচরিতং

ন তং দুচ্চরিতং চরে

ধম্মচারিং সুখং সেতি

অস্মিং লোকে পরমহি চ ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

সুচরিতং = সুন্দরভাবে ॥ চরে √চর্ + বিধিলিঙ + ১ম পু, ১বচন ॥

সেতি = সং. শেতে ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

ধর্মকে সুন্দরভাবে আচরণ করবে। অন্যায়ভাবে আচরণ করা উচিত নয়। ধর্মাচারী ইহলোকে এবং পরলোকে সুখে থাকেন ॥

যথা বুব্‌বুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং

এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চুরাজ ন পস্‌সতি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

পস্‌সে = √দৃশ্ + বিধিলিঙ + ১পু. ১বচন ॥ মরীচিকং = ২য়া একবচন ॥ অবেক্‌খন্তং = অব + √ইক্ষ্ + অন্ত (Present Participle) ॥ মচ্চরাজ = মৃত্যুরাজ ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

যেমন বুদবুদকে দেখে, মরীচিকাকে লোকে দেখে ( অর্থাৎ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ব

সম্বন্ধে যিনি সচেতন ) সে রকমভাবে যিনি পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করেন, তাঁকে মৃত্যুরাজ দেখতে পান না ( তিনি যমরাজার অগোচরে চলে যান ) ॥

এথ পস্‌সথিমং লোকং চিত্ত রাজরথূপমং
যথা বালা বিসিদন্তি নথি সঙ্গ বিজানতং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

পস্‌সথিমং = পস্‌সতি + ইমং ; √দিস্ ধাতু imperative ॥ যথা = যত্র, assimilation ॥ বিসিদন্তি = বি + সিদ্ + লট্ + তন্তি ॥ বালা = মূর্খেরা ॥ বিজানতং = বি + √জ্ঞা + নিষ্ঠা, + accusitive, এক বচন ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

তোমরা এস, এই বিচিত্র রাজরথসদৃশ পৃথিবীকে দেখ—যেখানে মূর্খেরা কষ্ট পায়, অথচ যিনি এর স্বরূপ জানেন, তাঁর কোনো বন্ধন নেই ॥

যস্‌স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীয়তি
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভামুত্ত'ব চন্দিমা ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

কুসলেন = কুশলের দ্বারা ॥ পিথীয়তি = হওয়া উচিত পিথীয়তে > সং. প্রথীয্যতে ॥ অব্‌ভামুত্ত'ব = অভ্র + মুক্ত + ইব । অভ্রাৎ > অব্‌ভা, ৫মী ১বচন ; মুক্ত > মুত্ত, আত্তীকরণ ( assimilation ) ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

যার কৃত পাপ কাজ কুশল কর্মের দ্বারা ঢাকা পড়ে সেই ব্যক্তি নিজগুণে এই পৃথিবীকে আলোকিত করেন, যেমন মেঘমুক্ত চন্দ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে ॥

অন্ধভূতো অয়ম লোক তনুকেত্থ বিপস্‌সতি
সকুন্ত জালমুত্ত'ব অপ্প সগ্‌গায় গচ্ছতি ॥

**শব্দার্থ ও টীকা :**

তনুকেত্থ = তনুকো + ইত্থ ॥ সকুন্ত = পাখি ॥ সগ্‌গায় = সগ্‌গ শব্দের চতুর্থীর ১বচন ; স্বর্গের দিকে ॥

**বাংলা অনুবাদ :**

এই পৃথিবীর লোক অন্ধ, কেন না তারা বিশেষভাবে দেখতে পায় না। পাখি যখন জালমুক্ত, তখন সে স্বর্গের দিকে যায় ॥

একং ধম্মং অতিতস্‌স মুসাবাদিস্‌স জন্তুনো
বিতিণ্ণ পরলোকস্‌স নাত্থ পাপং অকারিয়ং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

জন্তুনো = জন্তু, ষষ্ঠী ১বচন ॥ মুসাবাদিস্‌স — মুসাবাদীন্‌ শব্দ, মিথ্যাবাদী ॥ অকারিয়ং = অকার্যং, স্বরভক্তি ॥ বিতিণ্ণ = বি + তৃ + ক্ত > বিতীর্ণ > বিতিণ্ণ ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

সত্যধর্ম ত্যাগ করে যে মিথ্যাবাদী হয়েছে এবং যে পরলোকের ভয়কে অতিক্রম করেছে, তার পক্ষে কোনো অন্যায়ই অকার্য নয় ॥

ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি বালা হবে
নপ্পসমসন্তি দানং
ধীর চ দানং অনুমোদমান তেনেব সো হোতি সুখী পরত্থ ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

ন = অব্যয় ॥ কদরিয়া = কদর্য, বহুবচনে কদর্যা, তার বিপ্রকর্ষ ॥ বজন্তি = ব্রজন্তি, ভ্রমণ করে ॥ অনুমোদমান = অনুমোদন + Present Participle. ॥ তেনেব = তেন + এব, তাহার দ্বারা ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

কদর্যেরা নিশ্চয় দেবলোকে গমন করে না, মূর্খেরা নিশ্চয়ই দানকে প্রশংসা করেনা। পণ্ডিত ব্যক্তি দানকে অনুমোদন করে তার দ্বারাই পরলোকে সুখী হন ॥

পথব্যা একরজ্জেন সগ্‌গস্‌স গমনেন বা
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তিফলং বরং ॥

**শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

পথব্যা = পথবি, সপ্তমী ১বচন ॥ একরজ্জেন = এক রাজার দ্বারা ॥ আধিপচ্চেন = আধিপত্যেন ॥ সোতাপত্তিফলং = স্রোতপ্রাপ্তিফলং—তুলনার্থে ৩য়া স্রোতপ্রাপ্তি = ধ্যানের প্রথম স্তর ॥

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

পৃথিবীর অপর এক রাজত্বের চেয়ে অথবা স্বর্গগমনের চেয়ে অথবা স্বর্গলোকে আধিপত্যের চেয়েও 'স্রোতপ্রাপ্তি' ফল বরং ভাল ॥

সরহ লিখিত দোহাগুলি অপভ্রংশে রচিত। এগুলির রচনার সময় আনুমানিক অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী। অপভ্রংশ তখন অনেকটা সরল ও সহজ হয়ে এসেছে। চর্যাপদের বাংলার ঠিক আগের স্তরের বাংলাভাষার নমুনা হিসাবে একে নেওয়া যেতে পারে ॥

সহজ ছড্ডি জো ণিব্বাণ ভাবিউ
ণউ পরমত্ত এক্ক তেং সাহিউ।
জো জাসু জেণ হোই সণ্তুট্‌ঠো
মোক্‌খ কি লব্‌ভই ঝাণ-পবিট্‌ঠো ॥

সহজকে ছেড়ে যে নির্বাণ ভাবে, তার দ্বারা কোনো এক পরমার্থ সাধিত হয় না। যে, যাতে, যেভাবে সন্তুষ্ট হয়, সে সেইভাবে নির্বাণ লাভ করতে পারে। ধ্যানমার্গে প্রবিষ্ট লোক কি নির্বাণ লাভ করতে পারে!

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ ণিবেজ্জং
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেব্‌বং।
কিন্তহ তীথ্থ তপোবণ জাই
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণি হ্নাই ॥

তার প্রদীপে কি প্রয়োজন, নৈবেদ্যতেই বা প্রয়োজন কি? মন্ত্র উপাসনা করে তার কী-ই বা হয়! তার তীর্থেই বা প্রয়োজন কি? তপোবনে গিয়েই বা কি হবে! জলে স্নান করলেই কি মোক্ষলাভ হয়!

ছধ্‌ধঅহু রে আলিকা বন্ধা
সো মুঞ্চউ জে অচ্ছহু ধণ্‌ধা।
তসু পরিআণে অণ্ণ ণ কোই
অবরেং ঞাণ্‌ণেং সব্ব বি সোই ॥

অলীক বন্ধন পরিত্যাগ কর। যার (সহজানন্দ সম্বন্ধে) সন্দেহ আছে সে মুক্তি লাভ করুক। তাঁর (সহজানন্দ) সম্বন্ধে পরিজ্ঞান হলে অন্য কিছুই আর থাকে না। অখণ্ড জ্ঞানরূপীই (সেই সহজানন্দই) সব কিছু ॥

সো ভি পঠিজ্জই সো ভি গুণিজ্জই
সট্‌ঠ পুরাণেং ভক্‌খাণিজ্জই।
ণাহি সো দিট্‌ঠি জো তাউ ণ লক্‌খেই
এক্কেং বর-গুরু-পাঅ পেক্‌খই॥

শাস্ত্রের মধ্যে তাঁকেই ( সহজানন্দকেই ) পাঠ করা হয়। তাঁরই প্রশংসা করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়। এমন কোনো দর্শন ( শাস্ত্র ) নেই, যার মধ্যে তাঁকে লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র শ্রেষ্ঠ গুরুর পদসেবা দ্বারা তাঁকে দেখা যায়॥

জই গুরু-বুত্তৌ হিঅই পইসই
ণিচ্চই হত্থে ঠবিউ দীসই।
সরহ ভণই জগ বাহিঅ আলেং
ণিঅ-সহাভ ণউ লক্‌খিউ বালেং॥

যদি গুরু-বৃত্তি (গুরুর চরিত্র) হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহলে নিশ্চয় সেই সহজানন্দ হাতে স্থাপিত দেখতে পাবে। সরহ বলেছেন, এই জগৎ-রূপী নৌকা বেয়ে এলাম। যে বালক সে নিজ স্বভাব লক্ষ্য করে না॥

ঝাণহীণ পব্‌বজ্জেং রহিঅউ
ঘরহি বসন্তেং ভজ্জেং সহিঅউ।
জই ভিড়ি বিসঅ রমন্ত ণ মুচ্চই
সরহ ভণই পড়িআণ কি মুচ্চই॥

যারা ধ্যানহীন ( আত্মসমাধিশূন্য ) তারা প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করে বাধা পায়। ( সেই ধ্যানহীন লোকটি ) যদি ঘরে থাকে তাহলে ভার্যার দ্বারা সেবিত হয়। যদি বিষয়ের মধ্যে থেকে বিষয় ভেদ করে মুক্তি লাভ না করতে পারে, তাহলে পরিজ্ঞান বা সর্বতোমুখী জ্ঞানের দ্বারা ( শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা ) তার কি কখনও মুক্তি হয়! ( এই কথা সরহ বলছেন )।

জই পচ্ছক্‌খ কি ঝাণেং কীঅঅ
জই পরোক্‌খ অন্ধারং ম ধীঅঅ।
সরহেং ণিত্তং কড্‌ডিউ রাব
সহজ সহাব ণ ভাবাভাব॥

যদি ( সহজানন্দ ) প্রত্যক্ষ হয়, তবে ধ্যান করে প্রয়োজন কি! আর যদি পরোক্ষ হয় তবে ত সমস্তই অন্ধকার। অন্ধকারকে ধ্যান কোর না। সরহ নিত্য চিৎকার করে বলেছেন যে, সহজানন্দ ভাবাভাব ( বা অনির্বচনীয় ) নন॥

অক্খরবণ্ণ পরমগুণ-রহিঅ
ভণই ণ জাণই এমই কহিঅ।
সো পরমেসরু কাসু কহিজ্জই
সুরঅ কুমারী জিম পড়ি অজ্জই ॥

ধ্বনি এবং বর্ণ ঈশ্বরের গুণবিহীন ( এদের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন না )। শাস্ত্রকারেরা জানে না ঈশ্বরের স্বরূপ, তারা এমনিই বলে থাকে ( অর্থাৎ তিনি অবর্ণনীয়, তিনি অনুভবগম্য )। যে রকম কুমারীর সুরত-আনন্দ বাক্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়, অনুভূতিগম্য ॥

ভাবাভাবে জো পরহিণো
তহিম্ জগ সঅলসেস ভিলিণো।
জব্বেং তহিং মণ ণিচ্চল থক্কই
তব্বেং ভবসংসারহ মুক্কই ॥

যারা ভাবাভাবে ( অনির্বচনীয়তে ) পরাধীন হয়, তাদেরই মধ্যে সমস্ত জগৎ ( প্রপঞ্চ ) সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই ( সেই জগতের মধ্যে থেকেও ) মনকে সে নিশ্চল করতে পারে, তখনই সে ভব সংসার থেকে ( জন্ম থেকে ) মুক্ত হয় ॥

জাব ণ অপ্পহিং পর পরিআণসি
তাব কি দেহাণুত্তর পাবসি।
এমই কহিজে ভান্তি ণ কব্বা
অপ্পহি অপ্পা বুজ্ঝসি তব্বা ॥

নিজের মধ্যে যতক্ষণ না সে পরমকে সম্যকরূপে জানতে পারছ, ততক্ষণ কি ( তুমি ) দেহ থেকে সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু পেতে পারবে? ( যদি কেউ বলে, হ্যাঁ, পেতে পারি ) তারা এমনিই ( না জেনে ) বলে থাকে। ( সেরকম কখনও হতে পারে না )। সুতরাং ভুল কোর না। আত্মার মধ্যে নিজেকে বুঝবার চেষ্টা কর সেই সময়ে ( যখন তার প্রকাশ হয় ) ॥

ণউ অণু ণউ পরমাণু বিচিন্ত
অণবর ভাবহি ফুরই সুরত্ত।
ভণই সরহ ভন্তি এত বিমত্ত
অরে ণিক্কোলী বুজ্ঝহ পরমত্ত ॥

অণু কিংবা পরমাণুর চিন্তা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। সুরত ( সহজানন্দ ) সেই

অলৌকিক ভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। সরহ বলছেন, এ বিষয়ে নানরকম মতভেদ আছে। তার (সেই মতভেদের) মধ্যে প্রবেশ না করে, রে নিকুলীন, পরমবস্তুকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা কর ॥

ঘরেং অচ্ছই বাহিরে পেচ্ছই
পই দেক্খই পড়িবেসিণং পুচ্ছই।
সরহ ভণই বঢ় জাণউ অপ্পা
ণউ সো ধেয় ধারণা জপ্পা ॥

তিনি (অর্থাৎ সেই সহজানন্দ) ঘরের মধ্যেই (দেহের মধ্যেই) আছেন, কিন্তু লোকে তাকে বাইরে খুঁজে বেড়ায়। সামনেই দেখছে, অথচ প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করছে (সে কোথায়?)। তাই সরহ বলছেন, দৃঢ়ভাবে নিজেকে জানবার চেষ্টা কর। তা না হলে ধ্যানধারণা জপের দ্বারা কিছুই হবে না ॥

জই গুরু কহই কি সব্ব ভি জাণি
মোক্খ কি লব্ভই সঅল বিণু।
দেস ভমই হব্বাসেং লইজ্জে
সহজ ণ বুজ্ঝই পাপেং গহিজ্জে ॥

যদি গুরু বলেন, তুমি কি সবকিছুই জেনেছ? (তার উত্তর এই যে) সকল না জেনে কি মোক্ষলাভ করা যায়? কিন্তু লোকে অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে দেশে দেশে (তীর্থে তীর্থে) ভ্রমণ করে। (নিজের মধ্যে) সহজানন্দকে বুঝতে না পেরে পাপগ্রস্ত হয় ॥

বিসঅ রমন্ত ণ বিসঅং বিলিপ্পই
উঅর-হরই ণ পাণি পিপ্পই।
এমই জোই মূল সরন্ত
বিসহি ণ বাহই বিসঅ রমন্ত ॥

বিষয় ভোগ করেও বিষয় দ্বারা লিপ্ত হয় না। পূর বা জলস্রোতের মধ্যে হল চালনা করেও কিন্তু জল স্পর্শ করে না। এই ভাবেই যোগী সহজানন্দ বা মূলকে অনুসরণ করলে, বিষয় উপভোগ করেও বিষয়ের দ্বারা বাধিত হ'তে হয় না ॥

দেব পিচ্ছই লক্খ বি দিসই
অপ্পণু মারীই স কি করিঅই।
তোবি ণ তুট্টই এহু সংসার
বিণু আআসেং ণাহি জিসার ॥

দেবতাকে ( সহজানন্দকে ) দেখছে, লক্ষ্যও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তবুও সে নিজেকে মারছে। সেই লোক আর কী করবে! তবুও এই সংসারের মায়া টুটছে না। তাই বিনা চেষ্টায় মোক্ষ বা নিস্তার নেই॥

অণিমিসলোঅণ চিত্ত ণিরোহেং
পবণ ণিরুহই সিরিগুরু বোহেং।
পবণ বহই সো ণিচ্চলু যব্বেং
জোই কালু করই কিঁ রে তব্বেং॥

চোখের নিমেষ না ফেলে গুরুদত্ত জ্ঞানের দ্বারা চিত্তনিরোধের ফলে বায়ু নিরুদ্ধ হয়ে যায় ( সমাধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় )। যখন বায়ু নিশ্চল হয়ে যায় ( অর্থাৎ অতি ধীরে প্রবাহিত হয় ) তখন, হে যোগী, কাল ( যম ) তোমার কি করবে?

জাউ ণ ইন্দিঅ বিসঅ-গাম
তাব ণ বিফুরই অকাম।
অইসেং বিসম সন্ধিকো পইসই
জো জাহি অথি ণউ জাব ন দীসই॥

যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয় এবং তার বিষয়সমূহ থাকে না সেই পর্যন্তই বাসনাও থাকে না। এই রকম ইন্দ্রিয় বিষয়সন্ধিস্থলে কে প্রবেশ করবে? সুতরাং যিনি যেখানে আছেন, তিনি সেখানে থাকুন, যতক্ষণ না তিনি ( অর্থাৎ সহজানন্দ ) দৃষ্ট হন॥

পণ্ডিঅ সঅল সথ বক্‌খাণই
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই।
অবণাগবণ ণ তেণ বিখণ্ডিঅ
তোবি ণিলজ্জ ভণই হঁউ পণ্ডিঅ॥

পণ্ডিত সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে। ( কিন্তু ) দেহের মধ্যেই যে বুদ্ধ আছেন ( শাস্ত্রে নেই ), তাই সে জানে না। সংসারে আসা-যাওয়া সে খণ্ডন করতে পারে না। তবুও সেই নির্লজ্জ বলে আমি পণ্ডিত॥*

* দোহাগুলির অন্ত্যমিল লক্ষণীয়।

অরেরে বাহই কাহ্ণ ণাব ছোড়ি
ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
তই ইত্থি ণঈহি সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি ॥

ডগমগ>দীর্ঘমার্গ ॥ ইত্থি>স্ত্রী ॥ ণঈহি>নদীতে ॥ চাহসি>সং. যাচসি ॥

হে কৃষ্ণ, আমাকে ছেড়ে নৌকা বেয়ে যাও। পথ দীর্ঘ, আমাকে কুগতির দিকে নিয়ে যেও না। তোমার সঙ্গে স্ত্রীলোক সাঁতার দিচ্ছে। যা তুমি চাও, তাই নাও।

জস্‌স সিসই গংগা গোরি অধংগা
গিম পহিরই ফণিহারা
কণ্‌ঠটিঠ্‌অ বিসা পিন্ধণ দিসা
সংতারই সংসারা ॥
কিরণাবলী-কন্দা বন্দিঅ চন্দা
ণয়ণহি অণল ফুরন্তা।
সো মংগল দিজ্জই বহু সুহ কিজ্জই
তুম্‌হ ভবাণী কন্তা ॥

অধংগা=অর্ধাঙ্গ ॥ গিম=গ্রীবা ॥ কণ্‌ঠটিঠ্‌অ=কণ্ঠস্থিত ॥

যাঁর শীর্ষে গঙ্গা, গৌরী যাঁর অর্ধাঙ্গ, গ্রীবায় যাঁর ফণী-হার পরিধৃত, যাঁর কণ্ঠে বিষ (স্থিত), দিক্‌সমূহ যাঁর পরিধেয় বস্ত্র—তিনি সংসারে সাঁতার দিচ্ছেন। (চন্দ্রের) কিরণাবলী যাঁর পক্ষে আনন্দদায়ক, চন্দ্র যাঁকে বন্দনা করছে, যাঁর নয়ন থেকে অনল স্ফুরিত হচ্ছে—সেই ভবানীকান্ত (শিব) তোমাকে মঙ্গল দিন, তোমার বহুসুখ করুন ॥

জে গঞ্জিঅ গোলাহিবই রাই।
উদ্দণ্ড ওদ্দ জস ভয়ে পলাই ॥
গুরু-বিক্কম বিক্কম জিণই তুজ্‌ঝ।
তা কন্ন-পরাক্কম ইহ বুজ্‌ঝ।

গঞ্জিঅ=গঞ্জিত ॥ গোলাহিবই=গৌড়াধিপতি ॥ রাই=রাজা ॥ কন্ন-পরাক্কম=কর্ণের মত পরাক্রমশালী ॥

যিনি গৌড়াধিপতিকে গঞ্জনা দিয়েছেন ( পরাস্ত করেছেন ), উগ্র ঔড্ররাজ যাঁর ভয়ে পলায়িত, গুরুবিক্রমশালী বিক্রমকে যিনি জয় করেছেন—তিনি যে কর্ণের মত পরাক্রমশালী তা বোঝ ( অবধান কর ) ॥

সের এক্ক জই পাবহি ঘিত্তা ।
মণ্ডা বিসা পক্কাইল ণিত্তা ॥
টংক এক্কু জই সিন্ধব পাআ ।
সো হউ রংক সো ইহ রাআ ॥

মণ্ডা=মন্দ ব্যক্তির বহুবচন ॥ পক্কাইল=প্রক্ষেপিত>পক্খেবি+ইল্ল>পক্কেইল্ল>পক্কাইল ॥ সিন্ধব=সিন্ধুদেশবাসী বণিক ॥ রংক=অনুরক্ত ॥ রাআ=রাজা ॥

এক সের ঘি যদি পাওয়া যায়, মন্দ লোকেরা তাতে বিষ নিক্ষেপ করে। সিন্ধুদেশ-বাসী বণিক যদি একটি টাকা পায়, তাহলে সে তাতে ( বিশেষভাবে ) অনুরক্ত হয়ে নিজেকে রাজা বলে মনে করে ॥

ঢোল্লা মারিঅ ঢিল্লি মহ মুচ্ছিঅ মেচ্ছ শরীর ।
পুর জজ্জল মল্লবর চলিঅ বীর হম্বীর ॥
চলিঅ বীর হম্বীর পঅভর মেইণি কম্পই ।
দীঘ মগ ণহ অন্ধার ধূলি সূরহ-রহ ঝম্পই ॥
দীঘ মগ ণহ অন্ধার আণু খুরসাণক ওল্লা ।
দরবলি দমসু বিপক্খ মারু ঢিল্লি মহ ঢোল্লা ॥

ঢোল্লা=ঢোল॥ মুচ্ছিঅ=মূঞ্চন করে॥ জজ্জল=উজ্জ্বল (?) জাজ্বল্যমান (?) সূরহ-রহ=সূর্যের রথ ॥ আণু=অন্নপ্ত>অনত্ত>আনত্ত>আনউ>আণু ॥ দমসু>দমন করা ।

ঢোল বাজিয়ে দিল্লীতে ম্লেচ্ছদেরকে মুছে ফেলে মল্লশ্রেষ্ঠ বীর হাম্বীর জনসমাজে চলেছেন। তাঁর পদভরে মেদিনী কাঁপছে; সুদীর্ঘ পথ ও আকাশকে আচ্ছন্ন করে ধূলি সূর্যের রথকেও আবৃত করেছে। সুদীর্ঘ পথ ও নভস্তল অন্ধকারাচ্ছন্ন করে খোরাসানের মুসলমান সেনাপতিকে হুকুম দেওয়া হল—সমস্ত অত্যাচার দমন কর। 'বিপক্ষকে হত্যা কর'—এই বলে দিল্লীতে ঢোল দেওয়া হল ॥

সহস মদমত্ত গঅ লাখ লাখ পক্খরিঅ
সাহি দুই সাজি খেলন্ত গিন্দু ।

কোপ্পি পিঅ জাহি তহি থপ্প্ জসু বিমল মহি
জিণই ণহি কোই তুঅ তুলক হিন্দু ॥

পক্‌খরিঅ=পক্ষীরাজ॥ সাহি=অশ্বারোহী॥ গিন্দু=গেণ্ডুয়া ( Polo )॥
কোপ্পি=কুপিত। তুলক=তুর্ক্॥

সহস্র সহস্র মদমত্ত হস্তী, লক্ষ লক্ষ পক্ষীরাজ অশ্ব। দুজন সজ্জিত অশ্বারোহী গেন্দুয়া খেলছে। কোথাও প্রিয়জনকে কুপিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত ক্রীড়ারত সৈনিকগণ যেন পৃথিবী জয় করেছে, কিন্তু এই তুর্কী ও হিন্দু খেলোয়াড় কেউ কাউকে জয় করতে পারছে না।

রাআ লুদ্ধ সমাঅ খল বহু কলহারিণি সেবক ধুত্তউ।
জীবণ চাহসি সুক্‌খ জই পরিহরু ঘর জই বহুগুণ জুত্তউ ॥

রাআ=রাজা॥ বহু কলহারিণি=বউ কলহপরায়ণা॥ ধুত্তউ=ধূর্ত>ধুত্তো>ধুত্তউ॥ বহুগুণ জুত্তউ=বহুগুণযুক্ত॥

রাজা লোভী, সমাজের লোক খল, স্ত্রী কলহপরায়ণা, সেবক ধূর্ত। ( সুতরাং এই অবস্থায় ) যদি সুখের জীবন চাও, তবে তুমি বহুগুণযুক্ত হলেও গৃহ পরিত্যাগ কর॥

উচ্চ উট্‌ঠাণ বিমল ঘরা
তরুণি ঘরিণি বিণঅপরা।
বিত্তক পুরল মুদ্‌ধহরা
বরিসা সমআ সুক্‌কথরা ॥

উট্‌ঠান=উৎ+স্থান>উত্থান>উট্‌ঠান>উঠান॥ বিণঅপরা=বিনয়পরা, বিনয়সম্পন্না॥ পুরল=পুর+ইল্ল>পুরিল>পূরল ( পূরিত )॥

উচ্চ উঠান, পরিষ্কার ঘর, বিনয়সম্পন্না তরুণী গৃহিণী, ( ঘর ) বিত্তে পরিপূর্ণ এবং মনের মত সময়ে যেখানে বৃষ্টি হয়—সেই জায়গাই সুখকর॥

জাআ মাআ পুত্তা ধুত্তা।
ইণ্ণে জাণী কিজ্জা জুত্তা॥

স্ত্রী মায়াবিনী, পুত্র ধূর্ত। এদের দ্বারা কি কার্য সম্ভবপর তা আমি জানি!

জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুট্‌ঠি অরিট্‌ঠি বিণাস করু
গিরি তোলি ধরু।

জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্জিঅ
কালিয়কুল সংহার করু
জসে ভুঅণ ভরু ॥
চাণূর বিহণ্ডিঅ ণিঅকুল মণ্ডিঅ
রাহা-মুখ-মাহ পান করে
জণি ভমর-ভরে।
সোই তুহ্ম ণরায়ণ বিপ্পপরায়ণ
চিত্তহি চিন্তিঅ দেউ বরা
ভয়-ভীই-হরা ॥

যিনি কংশ বিনাশ করে কীর্তি প্রকাশিত করে, মুষ্টি এবং রিষ্টি বিনাশ করে গিরি (গোবর্ধন) তুলে ধরেছেন; যমলার্জুনকে ভঙ্গ করে, পদভরে কালীয়কুলকে সংহার করে যশে ত্রিভুবন পূর্ণ করেছেন; যিনি চান্দরকে (?) বিখণ্ডিত করে নিজ বংশকে উজ্জ্বল করে রাধার মুখমধু ভ্রমরের মত পান করেছেন—সেই বিপ্রভক্ত নারায়ণকে তুমি চিত্তে চিন্তা কর—তিনি তোমাকে ভবভীতিহারক বর প্রদান করুন ॥

সো মঝু কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ ॥*

পাউস = প্রাবৃষ, বর্ষা ॥

সেই আমার কান্তা গিয়েছে দূর দিগন্তে। বর্ষা আসছে, সে বস্ত্রাঞ্চল দোদুল্যমান করে হয়ত চলেছে ॥

পণ্ডব বংসহি জম্ম ধরিজ্জে।
সম্পঅ অজ্জিঅ ধম্মক দিজ্জে ॥
সোই জুহিথির সংকট পাআ।
দেবহা লিকৃখিঅ কেণ মেটাআ ॥

ধরিজ্জে = √ধৃ + ইজ্জ ॥ ধম্মক = ধর্মকৃত > ধম্মকঅ > ধম্মক ॥ পাআ = প্রাপ্ত >

---

* চেলু দুলাএ—এই পঙ্‌ক্তিটির অর্থ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় করেছেন—'চিত্ত চঞ্চলিত'। দ্রষ্টব্য: "বাঙালীর ইতিহাস": প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৩৩ ॥

পত্ত>পাত্ত>পাত্তা ॥ মেটাত্তা=মর্তয়তি>মট্টঅই>মট্টই>মিট্টই>
মেটাত্তা ॥

পাণ্ডব বংশে জন্মগ্রহণ করে যিনি সম্পদ অর্জন করে ধর্মের জন্য দান করেছিলেন, সেই যুধিষ্ঠিরকে সংকটে পড়তে হয়েছিল। দৈবের লিখন কে মিটাতে পারে!

বাল কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী
উবাঅহীণা মুই এক ণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারি
গই ভবিত্তি কিল কা হমারী ॥

উবাঅহীণা—উপায়হীনা ॥ অহংণিসং>অহর্নিশং ॥ গই>গতি ॥ হমারী =অহম্+কৃত>অহংকর>অহংঅর>হংঅর>হমার স্ত্রীলিঙ্গে হমারী ॥

(পার্বতী বলছেন) ছয়মুণ্ডধারী আমার বালকপুত্র। আমি এক উপায়হীনা নারী। আমার ভিখারী স্বামী অহর্নিশ কেবল বিষ খায়। কি গতি হবে আমার!

তরল-কমলদল-সরি-জুঅ-ণঅণা।
সরঅ-সমঅ-সসি-সুসরিস-বঅণা ॥
মঅগল-করিবর-সুঅলস-গমণী।
কমণা সুকিঅ-ফল বিহি গডু রমণি ॥

চঞ্চল কমলদল সদৃশ যুগলনয়না, শরৎকালীন শশীসদৃশ বদনা, মদকল করিবরের ন্যায় সুঅলসগামিনী এই রমণীকে বিধাতা কোন্ সুকৃতির ফলে গড়েছেন ॥

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

পালি প্রাকৃত অপভ্রংশ—এককথায় মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা যাঁরা গভীরভাবে অনুধাবন করতে চান, তাঁদের জন্য নিম্নলিখিত বইগুলির বিশদ পাঠ ও চর্চা অত্যাবশ্যক। প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে এই সমস্ত গ্রন্থ থেকেই আমি আমার এই বইটির উপাদান সংগ্রহ করেছি। যে সমস্ত বইগুলি অপরিহার্য এবং যেগুলি থেকে আমি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি সেগুলির পাশে একটি তারকা চিহ্ন দিলাম। বস্তুত এই বইগুলির সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এই পুস্তক রচনা করা কিছুতেই সম্ভব হত না॥

এ ছাড়াও নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো এই বিষয়ের ওপর রচিত বহু প্রবন্ধও আমাকে এই গ্রন্থ রচনা করতে সাহায্য করেছে। বাহুল্যভয়ে সেগুলির উল্লেখ করলাম না॥


* The Origin and Development of the Bengali Language—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
* The History and Culture of Indian People : The Vedic Age : Edited by Dr. R. C. Majumder—Chapter XX (Written by Dr. B. K. Ghose), 2nd Edition, 1952.
* Vedic Grammar—Macdonell.
* Panini and the Vedas—Paul Thieme.
* Prolegomena—Oldenburg.
* A Simplified Pali Grammar—E. Muller.
* A Short History of the Pali Language and Literature—E. Muller.
* Introduction to Prakrit—Woolner.
* Pali Grammar—R. P. Mitra.
* বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত।
* Dohakosha—(in the journal of the Dept. of letters, XXVIII Calcutta University)—by P. C. Bagchi.

"Sakya"—Mrs. Rhys Davids.

History of Buddhism—Translated by E. Obermiller,

* History of Sanskrit Literature—Dr. S. K. De. and S. N. Dasgupta.

* History of Sanskrit Literature—A. B. Keith.

* বাঙালীর ইতিহাস ( ১৩শ অধ্যায় )—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

Language of the Kharosthi Docement from Chinese Turkestan —T. Burrow.

Maharasthri and Marathi—S. Konow.

* Vararuci's "Prakrita Prakash"—Ed. by E. B. Cowell.

* History of Sanskrit Literature—Winternitz.

বৌদ্ধ গান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

Kavindrabachan Samucchaya—Ed. by F. W. Thomas

"সদুক্তি কর্ণামৃত" ( বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকা, শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৫০)—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়॥

ভাষাতত্ত্ব<br>চর্যাপদ } —অতীন্দ্র মজুমদার